পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৭১)

[Socio-Economic Life in East Bengal and The War of Liberation (1947-1971]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মো. আবদুর রহিম

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১২৭/২০১৮-২০১৯ (পুন:)

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো. আখতারুজ্জামান

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর ২০১৯

ঘোষণাপত্র

আমি মো. আবদুর রহিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৭১)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ অভিসন্দর্ভ বা অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে পিএইচ ডি ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করিনি। আমার জানা মতে, এই শিরোনামে ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, কোনো ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল, জাতি-গোষ্ঠী বা দেশকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করিনি।

২৬।১১।১৯

তারিখঃ

(মো. আবদুর রহিম)

রেজিস্ট্রেশন নংঃ ১২৭/২০১৮-২০১৯ (পুনঃ)
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৬১৯০০/৬৩৩০

Department of Islamic History & Culture
University of Dhaka
Dhaka-1000
Phone : 9661900/6330
E-mail : ihc@du.ac.bd

নং :.....

তারিখ : .....

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. আবদুর রহিম কর্তৃক পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৭১)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন করা হয়েছে। আমি অভিসন্দর্ভটি পাঠ করেছি। আমি মনে করি, এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এতে ব্যবহৃত উৎসসমূহ নির্ভরযোগ্য। আমার জানা মতে, এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করেননি।

পিএইচ ডি ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা প্রদানের জন্য গবেষক জনাব মো. আবদুর রহিমকে অনুমতি প্রদান করা হলো।

তারিখ:

(ড. মো. আখতারুজ্জামান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৭১) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনার জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, দিক-নির্দেশনা ও মন্তব্য প্রদান এবং বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে আমাকে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। এখানে সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তথাপি সকলের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

উপর্যুক্ত শিরোনামে গবেষণাটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক এবং খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ ড. মো. আখতারুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জমান বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া আমার গবেষণা শুরু করার পর প্রথমে তিনি কলা অনুষদের ডিন নির্বাচিত হন এবং ডিনের মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের প্রো-উপাচার্য হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। তিনি তাঁর কর্মজীবনের সবচেয়ে ব্যস্ততম সময়ে আমার পিএইচ ডি গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমাকে সময় দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আমি আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনকালে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও পরামর্শের কোনো অভাববোধ করিনি। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়নকালে তিনি বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে আমার চিন্তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছেন। এছাড়া সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমার লেখার কাজকে অনেকখানি সহজ করে দিয়েছে। অতীতের তথ্য ও উপাত্তসমূহকে ইতিহাসের সাহিত্যে রূপান্তরে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ব্যস্ততম পদে থেকেও তিনি আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদন ও অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। পিএইচ ডি গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তাঁর নিরন্তর সহযোগিতা ছাড়াও আমি আমার জীবনদর্শনের অনেক ক্ষেত্রেই অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জমানের কাছে ঋণী। এই সুযোগে আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং পিএইচ ডি তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি গবেষণার নীতিমালা অনুযায়ী আমি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একাডেমিক কমিটির সভায় দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছি। উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করেছেন আমার বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী ও সহকর্মীবৃন্দ। এ প্রসঙ্গে আমি আমার বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অনারারি অধ্যাপক ড. আয়শা বেগম, সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহফুজুল ইসলাম, বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আতাউর রহমান মিয়াজী, অধ্যাপক ড. আতাউর রহমান বিশ্বাস, অধ্যাপক ড. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান. সহযোগী অধ্যাপক ড. নুসরাত ফাতেমা, সহযোগী অধ্যাপক ড. এ কে এম

খাদেমুল হক, সহযোগী অধ্যাপক মিসেস সুরাইয়া আক্তার, ড. এস এম মফিজুর রহমানসহ বিভাগের সকল শিক্ষক ও সহকর্মীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। একই সাথে বিভাগের প্রিয় শিক্ষক এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানীকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই। তাঁর সদয় সহযোগিতা এবং নিরন্তর অনুপ্রেরণা আমার গবেষণাকে সহজ করে দিয়েছে।

আমার অভিসন্দর্ভ রচনা শেষে এর বানান রীতি ও ভাষাশৈলী বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জমানের কাছ থেকে আমি নিরলস সহযোগিতা পেয়েছি। তিনি একাধিকবার অভিসন্দর্ভটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া আমার অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছেন আমার বন্ধু এবং সহকর্মী ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির। আমি এই দু'জন সুহৃদের সহযোগিতাকে আন্তরিক ও কৃতজ্ঞতাচিত্তে এখানে স্মরণ করতে চাই।

আমার পিএইচ ডি গবেষণা যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য অনুপ্রেরণা ও তাগিদ দিয়ে আমার দায়িত্ববোধকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ। আলোচ্য গবেষণার বিষয় ও সময়কাল সম্পর্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকায় আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পারমর্শ পেয়েছি। আমাদের আলোচ্য সময়কালের অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং অংশগ্রহণকারী জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম ফজলুল হক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কে এ এম সা'দ উদ্দিন-এর কাছ থেকে তৎকালীন পূর্ববাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে সম্যক দর্শন আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিক *National Atlas of Bangladesh* গ্রন্থের প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এই গ্রন্থের কয়েকটি মানচিত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে এবং একই সাথে মানচিত্রের 'সফট্ কপি' সরবরাহ করে আমার কাজকে সহজ করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মাহফুজা খানম এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. সাব্বীর আহমেদসহ সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অনেকের অনুপ্রেরণা এই গবেষণাকর্মের প্রতি আমাকে আরও বেশী নিবেদিত করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলি রুবাইয়াতুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মশিউর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. তৌহিদ হোসেন চৌধুরী, ভারতের জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ'-এর অধ্যাপক ড. সঞ্জয় কে ভরদোয়াজ প্রমুখদের অনুপ্রেরণার জন্য তাঁদেরকে জানাই নিরন্তর শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমার অনেক বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীর উৎসাহ, ভালবাসা ও সহযোগিতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিশেষ করে, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন (ঢা,বি), ড. করম বীর সিংহ (জয়পুর বিশ্ববিদ্যায়, রাজস্থান) পুষ্পা গৌতম, (পিএইচ ডি গবেষক, জে.এন.উ, দিল্লী) ড. আশিষ কুমার দাস

(আর.বি.উ, কলকাতা), ড. দেবরাজ চক্রবর্তী, ড. বিমান সমাদ্দার, ড. সাজেদ বিশ্বাসকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবর্তিত বঙ্গবন্ধু পিএইচ ডি ছাত্র বৃত্তির জন্য আমাকে মনোনীত করায় আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি সারা জীবন বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নে সংগ্রাম করেছেন এবং এ অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন, সেই মহান ব্যক্তির নামে প্রবর্তিত বৃত্তির অধীনে তাঁরই রাজনৈতিক জীবন-সংগ্রামের সময়কালকে উপজীব্য করে গবেষণা করতে পারায় পরম আত্মতৃপ্তি উপলব্ধি করছি। মুক্তিযুদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টের অনুরোধে এই বৃত্তির জন্য মনোনয়নের কাজটি করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আমি এই সুযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই।

আমি গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়েছি। বিশেষ করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় মহাফেজখানা, জাতীয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পুরাতন জেলাসমূহের রেকর্ড রুম, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ গ্রন্থাগার, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, দিল্লী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তথ্য সংগ্রহের জন্য আমার দু'জন ছাত্র নুরুন্নবী ও আজিম আমাকে সহযোগিতা করেছে। এছাড়া ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মকর্তা মো. ছরোয়ার হোসেন, জুনিয়র গ্রন্থাগারিক মিসেস সাজেদা সুলতানা, অফিস সহায়ক জনাব আমিনুল ইসলাম, আবু তাহের এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির আইটি কর্মকর্তা জনাব মো. মুকবিল হোসেন আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার নিরন্তর শুভেচ্ছা।

আমি আমার প্রয়াত বাবা-মা'র পূণ্য আত্মার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁরা আজ বেঁচে থাকলে সবচেয়ে বেশী খুশী হতেন। একই সঙ্গে আমি আমার পরিবারের সকল সদস্যের কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

পরিশেষে যাঁদের কথা না বললেই নয়, আমার প্রিয়তমা সহধর্মিনী গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মিসেস রোকেয়া সুলতানা, আমার সন্তান মুহতাসিম নুওয়াইসির সৌম্য এবং জেসিনিয়া জাইন সেমন্তী, তাঁদের ত্যাগের সীমা নেই। আমার পেশাগত দায়িত্ব পালন এবং গবেষণাকর্ম সম্পাদনের কারণে প্রাপ্য অধিকার থেকে তাঁরা প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও এঁরা আমাকে নিরন্তর হাসি মুখে উৎসাহ যুগিয়েছেন, মন খারাপের সময়গুলিতে আনন্দ দিয়েছেন। এঁদের প্রতি আমার স্নেহ ও ভালবাসা অপরিমেয়।

(মো. আবদুর রহিম)
রেজিস্ট্রেশন নং: ১২৭/২০১৮-২০১৯ (পুন:)
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ:

মুখবন্ধ

রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। যে কোনো অঞ্চলের রাজনৈতিক গতিধারা তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। দীর্ঘদিনের চর্চিত রীতিনীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান এবং ঐতিহ্য জাতীয় মূল্যবোধ গঠনে ভূমিকা রাখে। এভাবে গড়ে ওঠে একটি জাতির আত্মিক পরিচয়। এ থেকে নির্মিত হয় জাতীয় ইতিহাস। সাংস্কৃতিক উপাদান জাতীয়তাবোধ তৈরির প্রাথমিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ বিগত দিনের বাস্তবতা বা ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, ভাষা, কিছু বিষয়ে সার্বজনীন আগ্রহ, সাধারণ অনুভূতি, অংশীদারিত্বমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জাতীয়তার উপাদান। ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের ধারণা বাস্তবতা বিবর্জিত। বিশেষ করে, বহু ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত ভারতবর্ষে এধরনের জাতীয় চেতনা বিকাশ ঐতিহ্যের পরিপন্থী। তথাপি ১৯৪৭ সালের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ইতিহাসে নতুন নয়। ইতিহাসের দীর্ঘকাল ব্যাপি সংঘটিত ক্রুসেড যুদ্ধের কারণও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার। এর মাধ্যমে সাময়িক উদ্দেশ্য সফল হলেও দীর্ঘমেয়াদে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার কোন জাতি বা রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না। নৃতাত্ত্বিকভাবে অমিল থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় অভিন্নতার কথা বলে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশী বানালেও এই ধর্মীয় ঐক্য দুই অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে অর্থনৈতিক সমতার ঐক্য গঠনে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। বরং নৃতাত্ত্বিক ভিন্নতার কারণে পাকিস্তানীদের দ্বারা বাঙালিরা প্রতিনিয়ত শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। বাঙালিরা অবশ্য আঞ্চলিক বৈষম্যের ধারণা তৈরী হওয়ার আগেই ভাষাকে কেন্দ্র করে মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির কিছুদিনের মাথায় দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরোধের কারণ সাংস্কৃতিক। অর্থাৎ দেশভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি যদি ধর্মীয়-রাজনৈতিক কারণে হয়, পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধের প্রাথমিক কারণ সাংস্কৃতিক। আর এ সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনার ভিত্তিতেই পূর্ববাংলার অধিবাসীরা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়। এসময়ে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর গণ-অভিগমন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাষার রাজনীতি, শাসন ব্যবস্থায় সামরিক-বেসামরিক কূ, মৌলিক গণতন্ত্রের ন্যায় নতুন রাজনৈতিক তত্ত্বের আবিস্কার, স্বাধীন রাষ্ট্রের(?) একটি অংশে ঔপনিবেসিক শাসন চাপিয়ে দেওয়া, জনগণের ভোটের রায় মেনে না নেওয়াসহ বহুবিধ অভিনব নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণের জাগরণ

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশেষ করে, পূর্ববাংলায় বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রচেষ্টা, ভাষার সাম্প্রদায়িকীকরণ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, বাঙালি সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, ৬-দফা আন্দোলন, আগরতলা মামলা বিরোধী গণজাগরণ, গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ ও ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে ভোট বিপ্লব ইত্যাদি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী এই ২৩ বছর ৭ মাসের ইতিহাস। দুনিয়ার আর কোনো জাতি এত কম সময়ে এত সব ঘটনার সাক্ষী হতে পেরেছে কিনা সন্দেহ আছে।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে এই সময়কাল অভিনবত্বের দাবিদার। একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারাটা নিঃসন্দেহে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অর্জন। প্রশ্ন হলো, এত বড় অর্জনের ক্ষেত্রে বাঙালির শক্তির উৎসই বা কী? কোন প্রেরণায় বাঙালি অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হলো তা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিষয়। ঐতিহাসিক পথপরিক্রমায় যে রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে তা তো খুবই দৃশ্যমান। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনার পেছনে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছে কোন শক্তি? এর একটি সরল জবাব হতে পারে আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রতিকারের জন্য জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো অন্যান্য আঞ্চলিক বৈষম্যের ধারণা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করার আগেই পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির মাত্র সাত মাসের ব্যবধানে ভাষা প্রশ্নে বাঙালিরা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে ফেলে। পরবর্তীকালে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের এই অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ভাষা প্রশ্নে গৃহীত অবস্থানই তাঁদের পরবর্তী রাজনৈতিক অভিমুখ নির্ধারণ করে দেয়। কাজেই এই গবেষণার একটি অনুসিদ্ধান্ত হতে পারে যে, পূর্ববাংলার প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনাক্রম তার সামাজিক সাংস্কৃতিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ঘোষণাপত্র	*ii*
প্রত্যয়নপত্র	*iii*
কৃতজ্ঞতাস্বীকার	*iv-vii*
মুখবন্ধ	*viii-ix*
প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা	১-২২
দ্বিতীয় অধ্যায় : পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ভূগোল ও জাতি গঠন	২৩-৪৪
তৃতীয় অধ্যায় : পূর্ববাংলায় পেশাভিত্তিক সমাজ কাঠামো	৪৫-৭২
চতুর্থ অধ্যায় : ধর্ম সমাজ ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক	৭৩-১০৪
পঞ্চম অধ্যায় : পূর্ববাংলার রাজনীতি ও রাজনৈতিক ঘটনা: পরিপ্রেক্ষিত পাকিস্তান রাষ্ট্র	১০৫-১৪৮
ষষ্ঠ অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক চর্চা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ	১৪৯-১৮৮
সপ্তম অধ্যায় : পূর্ববাংলার অর্থনীতি ও সমাজ	১৮৯-২৩৪
অষ্টম অধ্যায় : উপসংহার	২৩৫-২৪৬
: পরিশিষ্ট	২৪৭-২৫৪
: গ্রন্থপঞ্জি	২৫৫-২৭১

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ন ঘটে। এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্রে যুক্ত হয় একটি নতুন জাতি রাষ্ট্রের। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম আর মহান আত্ম-ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। এদেশের মুক্তিযুদ্ধ আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ইতিহাসকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিকভাবে যেমন ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারিত হয়েছে যুগপৎভাবে নব উত্থিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি একে-অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল। এই সময়কে সঠিকভাবে বুঝতে হলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এসময়ের ইতিহাসকে বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সে কারণে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার সমাজ জীবনের গতি-প্রকৃতি, এবং কালের ধারায় বিকশিত হওয়া সমাজ দর্শন, যা রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে প্রভাবিত করেছিল সেসব বিষয় বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি **পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৭১)** শিরোনামে সম্পাদিত হয়েছে।

১. গবেষণার যৌক্তিকতা

কোন অঞ্চলের জনজীবনের পূর্ণাঙ্গ ইহিহাস নির্মাণ করতে হলে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি এর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করা জরুরী। কেননা সমাজ ইতিহাসে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি একে অপরের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সে কারণে "পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৭১)" শীর্ষক গবেষণাকর্মটি পরিচালনার যথেষ্ট যৌক্তিকতা বিদ্যমান রয়েছে। এ সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১.১ গবেষণাধীন এলাকা 'পূর্ববাংলা'

বর্তমান গবেষণাধীন ভৌগোলিক অঞ্চলটি পূর্ববাংলা (অধূনা বাংলাদেশ) নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটি ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে পূর্ব-পাকিস্তান হিসেবে নামকরণ হয়। তখন থেকে পাকিস্তানের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত দাপ্তরিকভাবে এই নামটি চালু ছিল বৈকি, তবে এর অধিবাসীদের কাছে পাকিস্তান শব্দটি আত্মিকভাবে গৃহিত হয়নি। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোলের গঠন প্রক্রিয়া দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সম্পন্ন হয়েছে। তবে নিকট অতীতে ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার আসামকে যুক্ত করে 'ইস্টবেঙ্গল ও আসাম প্রদেশ' নামে একটি প্রদেশ গঠন করেছিল যা আবার রাজনৈতিক কারণে ১৯১১ সালে রহিত হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করতে সম্মত হলে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। একই সাথে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ ও বাংলার পূর্বাংশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের ক্ষেত্রে কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা অনুসরণ করা হয়নি। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মনোনীত দুজন করে চারজন সদস্য এবং স্যার সিরিল রেডক্লিফকে (Cyril Radcliffe 1899-1977) চেয়ারম্যান করে গঠিত পাঁচ সদস্যের সীমানা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রসাদ, মি. লিয়াকত আলী খান ও সরদার আবদুর রব নিশতার।[১] ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রণীত 'The Indian Independence Act 1947' এ বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা 'পূর্ববাংলা' প্রদেশ নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়।[২] আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার অধিবাসীরা পূর্ববাংলার সাথে যোগ দেবে কিনা সে প্রশ্নে ১৯৪৭ সালের ৬-৭ জুলাই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ভোটের ফলাফল অনুযায়ী সিলেট জেলার অধিকাংশ অধিবাসী পূর্ববাংলার সাথে যুক্ত হওয়ার পক্ষে মত প্রদান করেন।[৩] ফলে অবিভক্ত বাংলার ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পূর্ববাংলার অংশে ৪৯,২৫৯ বর্গমাইল এবং সিলেট ও আসামের ৪,৮৮২ বর্গমাইল এলাকা সহ পূর্ববাংলার মোট আয়তন দাঁড়ায় ৫৪,১৪১ বর্গমাইল। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাকে বিভক্ত করার কথা বলা হলেও সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্তের ফলে ৪৯টা অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ শহর এবং ৫৪টি অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা পূর্ববাংলার অংশে পড়ে।[৪] এভাবে ভারতবর্ষ ভেঙ্গে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পূর্ববাংলা কার্যত নতুন করে পরাধীনতার শৃংঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

আলোচ্য অঞ্চলটি দেশভাগের সময় ব্রিটিশ নথিতে পূর্ববাংলা নামে উল্লেখিত হয়।[৫] এছাড়া ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর 'পূর্ববাংলা ও আসাম' (East Bengal and Assam) প্রদেশ নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছিল।[৬] প্রাচীন কাল থেকে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মুখের ভাষা বাংলা'র সাথে মিল রেখে জাতিগত পরিচয় 'বাঙালি' এবং ভৌগোলিক পরিচয় 'বাংলা' হিসেবেই পরিচিতি পেতে থাকে। বঙ্গ বা বাংলার রয়েছে সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক

পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদেও অনেক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে আইন পরিষদে পূর্ববাংলার প্রতিনিধিগণ এর বিরোধিতা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী'-র বিতর্কে অংশ নিয়ে বলেন, "Sir (Honorable Speaker), You will see that they want to place the word *East Pakistan* instead of *East Bengal*. We have demanded so many times that you should make it *Bengal*. The word Bengali has a history, has a tradition of its own".[৭] বাংলা নামটি বিকাশের হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে। বাংলা শব্দটি এদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থার সাথে মিশে রয়েছে। বাংলার কবি-সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষায় উন্নতমানের কবিতা সাহিত্য রচনা করে এদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। কাজেই একটি আইন পাশের মাধ্যমে একটি নাম প্রবর্তন করলেই চলবে না সেটি অধিবাসীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। আইন পরিষদের বিতর্কে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন,

> It is stated that if there is a West Pakistan, there must be an East Pakistan or Eastern Pakistan. I do not think, sir that, that follows necessarily. It is not consequential, one can have East Bengal or Bengal or as has also been suggested the state of East Pakistan or Bengal (P) or Pak Bangla. All these various names have been suggested and in course of time the people of East Bengal might fix upon on any of these. If and when they settle upon a name, that should be accepted by this house rather than persons sitting here or the majority party should impose a certain name upon the people of Bengal... Now sir, this West and East Pakistan are not merely geographical expression.[৮]

কোন ধরনের যুক্তি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জনমত কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে এটিকে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণ করা হয় এবং একই সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিকে এক ইউনিট করা হয়। পরবর্তী কালে পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর পূর্ব পাকিস্তানের সর্বমহলে এই প্রদেশের নাম 'বাংলা' অথবা পূর্ববাংলা রাখার দাবী জোরদার হয়।[৯] এ দাবীর পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ছিল কেননা, এক ইউনিট বাতিলের পর পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলির ন্যায় পূর্ববাংলাও তার আগের মর্যাদা ফিরে পাওয়া উচিত। কিন্তু পাকিস্তান সরকার বাস্তবতা না মেনে বাঙালিকে ধর্মীয় ভাবাবেগের দ্বারা রাজনৈতিকভাবে প্রতারিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু পূর্ববাংলার অধিবাসীগণ বাংলা ভাষা, বাংলা দেশ, বাঙালিত্বের চেতনা, বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধর্মীয় ভাবাবেগের উর্ধ্বে রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে সত্য ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তো তিনি ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু বার্ষিকীর আলোচনায় ঘোষণা করেন,

> এক সময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি-আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তানে'র পরিবর্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশ[১০] [হবে]।

বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণাটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ছিল। নিশ্চয় এই নামের প্রতি জনগণের গভীর আবেগ ও অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল বলেই তিনি এরূপ ঘোষণা দিতে পেরেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, হাজার বছরে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি আইন পাশের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যেতে পারে কিন্তু মানুষের কাছে তা গ্রহণ যোগ্য না হলে সে আইনের কোন উপযোগিতা থাকে না। দীর্ঘ দিনের লালিত কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি আঘাত বাঙালিরা মেনে নেয়নি। বঙ্গবন্ধুর উক্ত ঘোষণার মাত্র দু'বছরের মধ্যে এই অঞ্চলটি ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করে যার নাম হয় বাংলাদেশ। সে কারণে নামকরণের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোলের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে অত্র গবেষণায় অধিবাসীদের দ্বারা দীর্ঘ চর্চিত পূর্ববাংলা নামটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার সময়কাল

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি রচনার জন্য ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সময়কালটি বেছে নেওয়ার কারণ হলো, এই সময়ে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মানচিত্রে নানা ভাঙ্গা-গড়া এবং উত্থান-পতনের ঘটনা ঘটেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অন্তিম সময়ের কিছু সিদ্ধান্ত ও ঘটনা, যার ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রে আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র চেতনার বীজ বপিত হয়েছিল, সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটেছিল তা উপমহাদেশের পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ওপর গভীর প্রভাব রেখেছিল। এ সময়ে আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, শিল্প বিপ্লব, পুঁজিবাদের বিকাশ, কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের উত্থান, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রাজভক্ত অভিজাত শ্রেণী এবং জমিদার-জোতদার শ্রেণির সৃষ্টি এ অঞ্চলের ঐতিহ্যিক সমাজ দর্শনকে পাল্টে দেয়। আবার পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরুতেই ভাষা ও সংস্কৃতির বিরোধকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিষয়টি সামনে চলে আসে। এর সাথে ধীরে ধীরে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যের খতিয়ান বৃদ্ধি পেতে থাকে। একই সাথে এ সময়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হতে থাকে যা পাকিস্তানের রাজনীতিকে স্বার্থান্বেষী মহলের স্বত্বভোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। এসকল রাজনৈতিক-সামাজিক শক্তির সাথে পাকিস্তানী উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের উত্থান ঘটে। এই শক্তিগুলোই মূলত রাজনীতির মঞ্চে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এসকল

শক্তিগুলোর মধ্যে একটি অসাধু ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনাবসানের ফলে মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছিল যে, সমতার ভিত্তিতে শোষণহীন এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন একটি সমাজ বিনির্মাণ করা নম্ভব হবে। তা না হয়ে সমাজ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ চলে যায় উপরোক্ত স্বার্থান্বেষী মহলের হাতে। এর প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববাংলায় দ্রুতই একটি শুভ সামাজিক শক্তির উত্থান শুরু হয়। জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক শক্তির বিপরীতে জন-সম্পৃক্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠানের বিকাশ লাভ করে, যার শেকড় ছিল সমাজের গভীরে প্রোথিত। এভাবে পূর্ববাংলায় রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি হাত ধরাধরি করে চলেছিল যেগুলি ছিল একে অপরের পরিপূরক।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ববাংলার মানুষ দ্রুতই বুঝে যায় যে, তারা নতুন করে পরাধীনতার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এর মাধ্যমে শুধু শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন হলেও শাসনব্যবস্থার গুণগত কোন পরিবর্তন হয়নি। পূর্ববাংলার জন্য ছিল এ এক বেদনাদায়ক ঘটনা, কেননা অবিভক্ত বাংলা ছিল অবধারিতভাবে একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক সত্তা। বাংলাকে ভাগ এবং ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন একটি রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে পূর্ববাংলাকে সংযুক্ত করা ছিল এক ঐতিহাসিক ভুল। এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পূর্ববাংলার অধিবাসীরা কখনোই একাত্মবোধ বোধ করেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির ২১১ দিনের মাথায় রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পূর্ববাংলায় ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা, সাধারণ ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে যে আন্দোলনের সূচনা করে তার মাধ্যমে বাঙালি যে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা তার একটি বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। ভাষাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন সংঘটিত হয় তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৯৭১ সালে।

এসময়কালে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘটেছিল কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর মধ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী-মুসলিম লীগের জন্ম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলন এবং একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলেও তা অচিরেই গণবিরোধী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে গণবিচ্ছিন্ন দলে পরিণত হয় এবং ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে এর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত চলে সরকার ভাঙ্গা-গড়ার খেলা। ১৯৫৮ সালে জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা কর্তৃক সামরিক শাসন জারি পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যত গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল এবং মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে নতুন অভিজাত শ্রেণি সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং পুনরায় সামরিক শাসন জারি অতঃপর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী-লীগের বিপুল বিজয়ের পর সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচন করে। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে নিজ রাষ্ট্রের একটি অংশের জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণ হত্যায়

মেতে ওঠে তারা। পরিণতিতে পূর্ববাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করে, যা ছিল বাঙালির অভীষ্ট লক্ষ্য।

ভৌগোলিক সত্তা হিসেবে পূর্ববাংলার বিকাশের ইতিহাস বহুপ্রাচীন। এর রয়েছে হাজার বছরের রাজনৈতিক উত্থান-পতন আর ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস। কিন্তু ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সময়কাল বাঙালি জাতির ইতিহাসের সব চেয়ে গৌরবময় কাল। এসয়ের মধ্যে বাঙালি ধাপে ধাপে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিনির্মাণ, ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে আত্ম-প্রকাশ এবং পরিশেষে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি করে পৃথিবীর মানচিত্রে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। যে কোন জাতির জন্য এর চেয়ে বড় অর্জন আর কিছু হতে পারে না। সে কারণে অত্যন্ত যৌক্তিক কারণেই গবেষণার জন্য এই ঘটনাবহুল সময়কালকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এসময়কালে সংঘটিত ঘটনাবলির রাজনৈতিক কারণ নিয়ে কিছু গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হলেও রাজনৈতিক ঘটনার অন্তরালে নিহিত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি উপেক্ষিত রয়ে গেছে, বর্তমান অধ্যয়নের মাধ্যমে সেই অভাবটি পূরণ করার প্রচেষ্টা থাকবে

১.৩ গবেষণার বিষয়বস্তু 'আর্থ-সামাজিক জীবন'

প্রাচীনকালে ইতিহাস লিখতে গিয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো। সাধারণ মানুষের ইতিহাস সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। ভারতবর্ষে মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও জনজীবনের ইতিহাস খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। আধুনিক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে এ ধারার খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে তা খুব জোর দিয়ে বলা যায় না। অথচ একটি জাতির রাজনৈতিক গতিধারার সম্যক চিত্র পেতে হলে সেদেশের সাধারণ মানুষের জীবনমান, ধর্মীয়, সামাজিক ও জাতিগত সম্পর্ক, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, মানবিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নানা দিক সম্পর্কে জানা অত্যাবশ্যক।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সাথে সাথে বাংলাকেও ভাগ করে এর পূর্বাংশকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাকিস্তান আন্দোলনে দৃশ্যত পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠী সমর্থন দিয়েছিল। এই সমর্থনের পেছনে ধর্মীয় ঐক্যগতচেতনাই কি একমাত্র অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল? যদি তাই হয়, তাহলে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির মাত্র ২১১ দিনের মাথায় কী কারণে এই ধর্মীয় ঐক্যগত চেতনার বিপরীতে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হলো?

মানুষের জন্মগত অধিকার হলো মাতৃভাষায় কথা বলা। ভাষা মানুষের মধ্যে আত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কৌম চেতনার বিকাশ ঘটায়। ফলে ইহা একটি সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ অর্থনৈতিক মিথস্ক্রিয়ার সাধারণ ভিত্তিও বটে। তাহলে কি কারণে পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর উপর ভিন্ন একটি ভাষা

চাপিয়ে দিতে চাইল? এছাড়াও পূর্ববাংলার রাজনৈতিক জাগরণের পেছনে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক কোন্ কোন্ বিষয়াবলি অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল সেসব প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন। পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার প্রতি যেসব বৈষম্য সাধারণ মানুষকে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর বিপরীতে মুক্তি সংগ্রামে প্রবৃত্ত করেছিল সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হবে।

এছাড়াও আলোচ্য সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাবলি পূর্ববাংলার বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-দর্শন দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তা নিরীক্ষা করাও এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমান প্রকাশনাসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পূর্ববাংলার জনজীবনের এসব চিত্র পূর্ণাঙ্গভাবে উঠে আসেনি। আরও পরিস্কারভাবে বলা যায় পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক দিক নিয়ে পিএইচডি পর্যায়ে অথবা অন্যকোন পর্যায়ে নিবিড়ভাবে গবেষণা খুব কমই হয়েছে। অল্পবিস্তর যা গবেষণা হয়েছে তাও অনেকটা বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। একটি সমাজকে পূর্ণাঙ্গভাবে চিত্রায়িত করার জন্য যে সকল দিকের প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন সে দিকগুলো উপেক্ষিত থেকেছে অথবা গবেষকগণের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে এসকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পাশাপাশি অচর্চিত বিষয়াবলী গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করা হয়েছে।

২. প্রকাশনা পর্যালোচনা

পূর্ববাংলার গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোবদ্ধ বিবরণ সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হলো এ. কে. নাজমুল করিমের *Changing society in India, Pakistan and Bangladesh* শীর্ষক গ্রন্থটি। এই অভিসন্দর্ভটি তিনি ১৯৫৩ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী লাভের জন্য রচনা করেন। এই গ্রন্থটিতে তিনি ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের (পূর্ববাংলা) সামাজিক পরিবর্তনের সূচক ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় পূর্ববাংলার দিকটি বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ববাংলার একটি গ্রামের তথ্য লেখক সূচারুরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। যে গ্রামটিকে তিনি তথ্য সংগ্রহের জন্য বেছে নিয়েছেন সেখানে হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। তবে সেটি ছিল একটি মুসলিম প্রধান গ্রাম অর্থাৎ গ্রামটির ৯৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীই ছিল মুসলমান। পেশা ও মর্যাদার ভিত্তিতে গ্রামের জনগোষ্ঠীর একটি স্তরবিন্যাস প্রদান করা হয়েছে। এ. কে নাজমুল করিম দেখাতে চেয়েছেন যে, কিভাবে গ্রামীণ সংগঠন ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলো নিজস্ব রীতিনীতি ও আইনের মাধ্যমে সমাজকে চলমান রাখতো। গ্রামীণ সংগঠনগুলো ছিল সুদৃঢ় কাঠামোবদ্ধ এবং সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। অধ্যাপক নাজমুল করিম লক্ষ করেন, ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন সূচনা করে। তিনি বলেন,

> ...the new education and new state administrative machinery introduced by British rule undermined the foundations of the time honoured rural institutions. The

families which traditionally produced village leaders greatly declined in economic position, while those families which did not produce leaders in a position to enter into petty government or factory jobs and were able to receive a smattering of modern education[১১].

অর্থাৎ ব্রিটিশদের গৃহিত সংস্কারেরর ফলে সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পূর্ববাংলায় নতুন সমাজ কাঠামোর বিকাশ লাভ করে, যেখানে চিরাচরিত নেতৃত্বেরও পরিবর্তন সূচিত হয়। অধ্যাপক করিমের এই গবেষণাটি তাত্ত্বিক কাঠামো বিচারে অত্যন্ত উঁচু মানের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু গবেষণার পরিধি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে পূর্ববাংলার সমাজ ব্যবস্থাকে জানার জন্য এটি কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারেনি। অর্থাৎ পূর্ববাংলার সমগ্র ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিচেনায় আনা হয়নি। তিনি নিজেই বলেছেন, "In this book we shall take up the discussion of the development of political conciousness among the Muslim in Bengal".[১২] তথাপি পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবন ও গ্রামীণ সংগঠন এবং তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক বোঝার জন্য এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই গবেষণাকে ভিত্তি করে গ্রামীণ ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কৃতি কিভাবে রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব তৈরিতে ভূমিকা রাখে তা বের করা সহজ হবে।

পূর্ববাংলা ছিল মূলত গ্রামভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। অধিকাংশ মানুষের বসবাস গ্রামে। পূর্ববাংলার মানুষকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে গ্রামকে জানতে হবে। সেদিক থেকে নাজমুল করিমের গ্রন্থের সাথে সাথে আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরীর *বাংলাদেশের একটি গ্রাম: সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি সমীক্ষা* শীর্ষক গ্রন্থটি প্রাসঙ্গিক বটে। ১৯৭৫ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছিলেন। ঢাকা শহর থেকে ২৫ মাইল দূরে মেহেরপুর নামক একটি গ্রামে জরিপকাজ পরিচালনা করে তিনি গ্রামীণ জীবনের শ্রেণি-চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। এটি তিনি সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গিতে রচনা করেছেন। তবে তাঁর এ সমীক্ষায় স্বাধীন জাতিসত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে বাঙালির মনস্তাত্ত্বিক গতিবিধি বিশ্লেষণের একটা প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তিনি ভূমিকায় বলেছেন, "আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রেণী, মর্যাদা এবং ক্ষমতা বিষয়ক সম্বন্ধাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে মেহেরপুর গ্রামের বর্তমান সামাজিক স্তরবিন্যাসটি প্রদর্শন করা। অবশ্য ভারত বিভক্তি ও মুসলিম রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানের (পূর্ববাংলা যার অংশে পরিণত হয়) উৎপত্তি, ভূমি সংস্কার, স্বায়ত্বশাসন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পরিশেষে স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রভৃতি ঘটনাবলি গ্রামের শ্রেণী, মর্যাদা, ও ক্ষমতার সম্বন্ধাবলিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে সেটা দেখাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।"[১৩] পূর্ববাংলার মানুষের সামাজিক জীবন সম্পর্কে গবেষণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে সেদিক থেকে এই গবেষণা খানিকটা ঘাটতি পূরণ করে বটে, কিন্তু সামগ্রিক চিত্র পাওয়ার জন্য আরও নিবিড়ভাবে গবেষণা করা দরকার । কারণ গ্রামের মানুষের শ্রেণি

কাঠামোর সাথে এর অর্থনৈতিক স্তর ও যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা সামাজিক মূল্যবোধ, যেগুলো জাতিসত্তা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন রয়েছে।

রওনক জাহানের *Pakistan: Failure in National Integration* শীর্ষক গ্রন্থে পূর্ববাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতি, যা প্রদেশের মানুষকে মুক্তির আন্দোলনে যেতে বাধ্য করেছিল সে বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করা যায়। লেখক হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভটি রচনা করেন। গবেষক আইয়ুব খানের শাসনামলকে (১৯৫৮- ৬৯) তাঁর গবেষণার জন্য বেছে নেন। মজার ব্যাপার হলো গবেষণাকালে গবেষক যে পূর্বানুমান দাঁড় করান তা অচিরেই বাস্তবে রূপ লাভ করে। তাঁর গবেষণা কর্মটি বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার জন্য প্রেসে থাকাকালীন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তানী জনগোষ্ঠী একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার পেছনে কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো বাঁধা হিসেবে কাজ করেছে তা তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতির ব্যর্থতাকেও তিনি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন,

> I hope this book will refresh our memories about the failed policies and politics of the Pakistani ruling elites and of the economic, political and socio-cultural roots of our nationalist movement.[১৪]

লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, জাতীয় ঐক্য গঠনে যে সকল উপাদান মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেগুলো পাকিস্তান রাষ্ট্রে অনুপস্থিত রয়েছে। শাসক অভিজাত ও পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক তফাৎ লক্ষ করেছেন। দুই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ন্যূনতম মূল্যবোধের সামঞ্জস্য সেখানে নেই। পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনে পূর্ববাংলার অংশগ্রণ অনুল্লেখযোগ্য ছিল। পাঞ্জাবী ও উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আগতরাই পাকিস্তানের তথাকথিত জাতীয় অভিজাততন্ত্র তৈরি করেছিল। রওনক জাহান মূলত এসব বৈষম্যমূলক নীতিকেই পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য গঠনে প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ করেন। রওনক জাহান সামগ্রিকভাবে পূর্ববাংলার সমাজকে বিশ্লেষণ করেননি। তিনি বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের সাহায্যে সামরিক-বেসামরিক ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন চাকৃরিতে, উন্নয়ন বরাদ্দ, বিদেশী সাহায্য ব্যয়, রাজস্ব বরাদ্দ, কেন্দ্রীয় সরকারে প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেসব বৈষম্য তৈরি হয়েছিল তা তিনি সুন্দরভাবে তুলে এনেছেন। কিন্তু বৈষম্য সৃষ্টির পেছনে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জাতিগত অহমিকা বোধ, পূর্ববাংলার মানুষকে হীন চোখে দেখার প্রবণতা ইত্যাদি নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল কিনা সে বিষয়টিও জোরালোভাবে আলোচনা হওয়া দরকার। একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের উপস্থিতি অন্যদিকে পূর্ববাংলার ভিন্ন জাতিসত্তা এক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যের পথে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল সে ব্যাপারে বিশেষ কোন আলোচনা করা হয়নি।

ইংল্যান্ডের ব্রুনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবির ইউ আহমেদ *Breakup of Pakistan: Background and Prospects of Bangladesh* শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন। লন্ডনের The social science publisher কর্তৃক ১৯৭২ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবী রাখে। এই গ্রন্থে পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে যা পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বুঝতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহকে বোঝার জন্য এ অধ্যায়টির প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে দুটি অধ্যায়ে যথাক্রমে পাকিস্তান রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বৃহত্তর প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার প্রতি অসাম্যের সৃষ্টি করা হয়েছে সেটিই ছিল মূল আলোচ্য বিষয়। লেখক বলেছেন,

> East Bengal having been the majority wing of Pakistan got the roughest deal from minority wing, and a constitutional attemp to redress it has pushed her to a direct military confrontation with the Pakistan Army equiped with the most sophisticated weapons for which Bengalis were least prepared.[১৫]

রাষ্ট্রের একটি অংশের জনগোষ্ঠীকে তাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য কিভাবে আন্দোলনের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল তা লেখক তথ্য-উপাত্ত সহকারে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এতদসত্ত্বেও পাকিস্তানের দুই অংশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত কোন মিল অথবা অমিল ছিল কিনা এবং তা জনগোষ্ঠীর মনোজগতে জাতি গঠনে কোন প্রভাব ফেলেছিল কিনা তা পরীক্ষা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় ঐ অপূর্ণতাকে যথাযথভাবে বিবেচনায় রেখে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে।

আহমদ কামাল রচিত *State Against The Nation, The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-1954* শীর্ষক গ্রন্থটি একটি মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ। Australian National University তে তিনি পিএইচ ডি ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভটি রচনা করেন। তাঁর গবেষণার সময়কাল ছিল ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ৮ মার্চ ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত। তিনি সুনির্দিষ্ট লক্ষ নিয়েই এই সময়কালের ঘটনাবলি দ্বারা পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পূর্ববাংলার বৈষম্যগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মূল লক্ষ ছিল, যে দলের নেতৃত্বে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির দাবিতে আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলো মাত্র কয়েক বছরের মাথায় পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ববাংলায় সেই দলের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যাওয়ার কারণ কি সে বিষয়টি তিনি গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন। কি কারণে পূর্ববাংলার মানুষের আশাভঙ্গ ও বঞ্চনা বোধ করলো, কেনই বা মুসলিম লীগ তথা পশ্চিম

পাকিস্তানী শাসক ও তাদের সহযোগীদের প্রতি পূর্ববাংলার মানুষ এত দ্রুত তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল সেইসব বিষয়গুলি এখানে উঠে এসেছে। ভূমিকায় তিনি বলেছেন,

> The question that intrigued me was, how did the aspiration of the ordinary people-their demand for a better distribution of land, food and water-get entangled with her large problems of nationalism, democracy, party-politics and state repression that shaped the nature of the state and politics in East Bengal.[১৬]

দেশভাগের পর পূর্ববাংলায় খাদ্য ঘাটতি, খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি পরিস্থিতি পূর্ববাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে। খাদ্য সংকটকে কেন্দ্র করে কৃষি ও কৃষক সম্প্রদায়ের সংকট, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক সংকটকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। পূর্ববাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, যা পূর্ববাংলার মানুষের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব গঠন করতে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল সেসকল বিষয় গবেষণায় অনুপস্থিত রয়েছে।

সম্প্রতি মোঃ হাবিবউল্লাহ্ বাহার কর্তৃক রচিত *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯): পার্লামেন্টের ভাষ্য* শীর্ষক গ্রন্থটি বিবেচনার দাবি রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পিএইডি অভিসন্দর্ভ হিসাবে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করেন। পূর্ববাংলার আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে আইন সভায় যে সকল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে মূলত তাঁর ওপর ভিত্তি করে তিনি গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করেন। লেখক ভূমিকায় বলেন,

> পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান পার্লামেন্টে (জাতীয় ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক) দুই অঞ্চলের বৈষম্যের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ব্যাপক আলোচনা বা বিতর্ক হয়েছে, স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা এবং ফেডারেল কাঠামোর দ্রুত যথাযথ ব্যবহারের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এসব সংসদীয় বিতর্কে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্সংক্রান্ত প্রকাশিত ও সংগৃহিত গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলোর সীমাবদ্ধতা এবং পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থের শূন্যতা পূরণের জন্যই আমার এ গবেষণাগ্রন্থ রচনার প্রয়াস"।[১৭]

এই গ্রন্থে তিনি সারণির মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অংশে বৈষম্যের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। দুই অঞ্চলে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য, সম্পদের অসম বণ্টন, মাথাপিছু ভূমির মালিকানা বৈষম্য, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বৈষম্যনীতি, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য, সামরিক ব্যয় বরাদ্ধ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে পূর্ববাংলার প্রতি বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য, বিদেশি সাহায্য, ঋণদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন। তবে তিনি ঐতিহাসিকভাবে চলে আসা এ অঞ্চলের মানুষের ভাষা, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম, জীবনমান, মূল্যবোধ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ঐতিহ্য, রীতিনীতি ইত্যাদি পূর্ববাংলার মানুষকে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী

জনগোষ্ঠী থেকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে সেসব বিষয়ে তিনি কোন বিশ্লেষণ করেননি। সেটি তাঁর গবেষণার বড় দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা গেছে। এই জাতিগত ও ভাষিক পার্থক্য আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টিতে কোন নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে কিনা সে বিষয়টির প্রতিও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। মোঃ হাবিবউল্লাহ্ বাহারের গবেষণা কর্মটি বৈষম্যের ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে সহায়তা করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি আইনসভার বিতর্ককে ভিত্তি ধরে গবেষণা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। অন্যান্য প্রাথমিক উপাদান অচর্চিত থেকে গেছে। এছাড়া বিষয়বস্তু হিসেবেও পূর্ববাংলার সামাজিক ইতিহাসের অন্যান্য দিক যেমন অধিবাসীদের অর্থনৈতিক স্তর, পেশা, সামাজিক সংগঠনের সাথে রাজনৈতিক সংঘাত ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি, ১৯৫৩-১৯৬৬ শীর্ষক গ্রন্থটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে বোঝার জন্য যথেষ্ট সহায়ক। মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য অভিসন্দর্ভটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটি পাকিস্তানের সমকালীন রাজনীতির একটি ধারাবাহিক বিবরণ। একটি দেশের রাজনীতিকে বোঝার জন্য তাঁর সমাজের বাহ্যবিষয়াবলির বাইরেও তাঁর যে অন্তর্নিহিত চলকসমূহ রয়েছে যা একটি সমাজকে অপর একটি সমাজ থেকে পৃথক করে সেটি জানা অত্যাবশ্যক। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকীর গ্রন্থটি পূর্ববাংলার সমাজকে সম্যকভাবে বোঝার জন্য যথেষ্ট দিকনির্দেশনা দিতে পারেনি।

রেজোয়ান সিদ্দিকীর *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ১৯৪৭-১৯৭১* শীর্ষক গ্রন্থটি পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে বিশেষভাবে সহায়ক। এ অভিসন্দর্ভটি রচনা করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছেন। পূর্ববাংলার রয়েছে সমৃদ্ধশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা এর সমাজকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এছাড়া পাকিস্তানী শাসকদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদেও পূর্ববাংলায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্ম ও প্রতিবাদী কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "বাংলাদেশের স্বকীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় ও আত্ম উদঘাটনের জন্য এসব সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশের বিবরণ তুলে ধরাই গবেষণার প্রধান লক্ষ"।[১৮] লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী এটি একটি বর্ণনামূলক গ্রন্থ। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ববাংলার রাজনৈতিক জনমত গঠিত হয়েছিল। সামাজিক সাংস্কৃতিক শক্তি এবং রাজনৈতিক শক্তি একে অপরের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এর মাধ্যমেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ লাভ করে। কাজেই প্রথমেই পূর্ববাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্যিক রীতিনীতি এবং এর

অধিবাসীদের অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। রেজোয়ান সিদ্দিকীর প্রচেষ্টা নিশ্চয় সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। এতদ্‌সত্ত্বেও এ বিষয়ে আরও নিবিড় গবেষণা করা প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় কোন বিষয়গুলি প্রধান প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল তা জানার জন্য A. M. A. Muhit এর *Bangladesh: Emergence of a Nation* শীর্ষক গ্রন্থটি বেশ সহায়ক। লেখক মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে অবস্থানকালেই এই গ্রন্থটি রচনার তাগিদ অনুভব করেন। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিব নগর সরকারের কর্মকর্তা, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ, প্রকাশিত তথ্যাদির বিশ্লেষণ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমতগঠনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আমলা, বুদ্ধিজীবি এবং বিবেকবান মানুষের কর্মতৎপরতার বিষয়াবলি, দেশি-বিদেশি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত তথ্যাবলি এবং পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিল্লেষণ করে এই গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে যা গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯] এই গ্রন্থের দুটি অধ্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জাতিসংঘ এবং বৃহৎশক্তিবর্গ বিশেষ করে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চায়নার ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন কূটনৈতিক তৎপরতার প্রমাণ্য দলিল। গ্রন্থটির শুরুতেই বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অধিবাসীদের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়, ভাষা, ভৌগোলিক উত্থান বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ধারাবাহিকভাবে এই ভূখণ্ডটি কিভাবে রাজনৈতিক ভূগোলের রূপান্তর ঘটছে তার বিবরণ, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিশেষ করে পূর্ববাংলা সম্পর্কে পাকিস্তানী শাসকদের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক ঘটনাবলি ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম প্রক্রিয়ার আর্থ-রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া জানার জন্য বইটি একটি মাইল ফলক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক বিবর্তনের সাথে লেখক তার প্রত্যক্ষকরণ ও অভিজ্ঞতার দারুণ সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু পূর্ববাংলার উদীয়মান রাজনৈতিক দর্শনের সাথে পূর্ববাংলার নিজস্ব সামাজিক গঠন, স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, ভৌগোলিক বাস্তবতার কারণে কালের ধারায় গড়ে ওঠা নিজস্ব অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম এবং সর্বোপরি জনজীবনের কৃষ্টি ও মনস্তত্ত্বে কী ধরনের প্রভাব রেখেছিল তা জানা অত্যন্ত জরুরী যা আলোচ্য গবেষণা কর্মে ওঠে আসেনি।

৩. গবেষণা উৎস ও পদ্ধতি

প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎসসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধমে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় মহাফেজখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পুরাতন জেলাসমূহের রেকর্ড রুম, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ গ্রন্থাগার, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, দিল্লী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক

সোসাইটি গ্রন্থাগার এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য ও উপাত্তের জন্য *Constituent Assembly of Pakistan Debates, National Assembly Debates, East Bengal Legislature Assembly Debates, East Pakistan provicial Assenly Proceedings* ইত্যাদি থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক উৎস হিসেবে সহায়ক হয়েছে বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট যেমন, *Annual Land Renenue Report, Statistical Abstract, Statistical Digest*, জাতীয় ও আঞ্চলিক বাজেট যেমন *Budget of the Central Government of Pakistan, Budget of the Government of East Pakistan* ইত্যাদি ছাড়া পাকিস্তান শাসনামলে প্রণীত চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রিপোর্ট যেমন *The First Five Year Plan 1955-60, The Second Five Year Plan 1960-65, The Third Five Five Year Plan 1965-70 এবং Reports of The Advisory Pannel for The Fourth Five Year Plan 1970-75, Annual Plan 1970-71* ইত্যাদি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সরকারের প্রকাশিত গেজেট, রাজনৈতিক দলসমূহের গঠনতন্ত্র, নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো, নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল, পোস্টার ইত্যাদি থেকেও তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে প্রকাশিত আদমশুমারির রিপোর্ট এবং কৃষি সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের জন্য কৃষিশুমারির রিপোর্টসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত সরকারি বিভিন্ন প্রচারপত্রও গুরুত্বসহকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের দ্বৈতীয়ক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যাচাই বাছাই সাপেক্ষে তা বর্তমান গবেষণায় কাজে লাগানো হয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত কলকাতা, করাচি এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত তথ্য সতর্কতার সাথে গবেষণা কর্মে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণ করে গবেষণার সময়কাল সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। এ পদ্ধতিতে অতীতকালের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের রাজনৈতিক ঘটনাবলি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সমাজের বিভিন্ন ক্রিয়াশীল উপাদানের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা লাভ করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রকাশিত তথ্যাদি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেছি। আলোচ্য সময়কালে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক উৎস আমাদের জন্য বেশ সহায়ক হয়েছে। বিশেষ করে ঘটনাসমূহকে আবর্তন করে যে সকল পরিসংখ্যানগত তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে তা সাহিত্যিক দলিলাদির সাথে সমন্বয়

করে ইতিহাসের সাহিত্যে রূপান্তর করা হয়েছে। এভাবে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে অবরোহী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

৪. অধ্যায় বিন্যাস

'পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৪৭-১৯৭১' শিরোনামে প্রস্তাবিত পিএইচডি থিসিসটি ভূমিকা ও উপসংহার সহ নিম্নোক্ত আটটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। অধ্যায়গুলির সারসংক্ষেপ ও গঠন পরিকল্পনা নিচে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়ে একটি ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। এখানে গবেষণার সময়কাল, গবেষণার বিষয়বস্তু, গবেষণার যৌক্তিকতা ইত্যাদি আলোচনা স্থান পেয়েছে। ইতোমধ্যে সম্পন্ন গবেষণাকর্ম এবং প্রকাশিত সাহিত্য পর্যালোচনা করে বর্তমান গবেষণার স্থান নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণার প্রধান প্রধান ধারণা, অনুমান ও সংজ্ঞা এবং গবেষণা তত্ত্বের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে এখানে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ভূগোল ও জাতি গঠন

একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, এবং জলবায়ু সে অঞ্চলের অধিবাসীদের জাতিতাত্ত্বিক অবয়ব দান, মানসিক গঠন এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সে কারণে কোন অঞ্চলের জনজীবনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তার অধিবাসীদের ওপর ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব নিরীক্ষা করা অত্যাবশ্যক। আলোচনাধীন অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোলের গঠন প্রক্রিয়া দীর্ঘ ঐতিহাসিক পরিক্রমায় বর্তমান আকৃতি লাভ করেছে। সে কারণে অতি প্রাচীনকাল থেকে আলোচ্য সময়কাল পর্যন্ত এর ভৌগোলিক ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র এবং তার শাখা নদী এবং অন্যান্য নদ নদীর প্রবাহমান জলধারায় বাহিত পলি জমে পূর্ববাংলার ভূমিরূপ গঠিত হয়েছে। এর ভূমির গঠন বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া ও জলবায়ু এ অঞ্চলের জনচরিত্র গঠনে ভূমিকা রেখেছে। কালের ধারায় তা এক সময়ে জাতীয় চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে, যা থেকে বিকাশ ঘটেছে জাতিসত্তার। এভাবে ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক ক্রমধারায় তা জন্ম দিয়েছে জাতীয়তাবাদী চেতনার। দীর্ঘকালীন এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এই ব-দ্বীপ স্বাতন্ত্র্য ভৌগোলিক অঞ্চলের মর্যাদা লাভ করেছে, একই সাথে ভৌগোলিক প্রভাবে অধিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে। এ অঞ্চলের আর্থ-সামিাজিক কর্মকাণ্ডের ওপর যেমন এর ভৌগোলিক প্রভাব রয়েছে, স্বাভাবিকভাবে এর অধিবাসীদের চরিত্র গঠনেও ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া ও

জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে। এখানকার শান্ত-নির্মল পরিবেশের প্রভাবে এই জনপদের আপাত সরল মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রকৃতির বৈরী পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে। সংগ্রাম করে টিকে থাকার শিক্ষা অধিবাসীরা প্রকৃতির কাছ থেকে শিখেছে। কাছেই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে গড়ে ওঠা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য এ অঞ্চলের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতিতেও প্রভাব রেখেছে স্বাভাবিক কারণেই। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এ অঞ্চল দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রাজনৈতিক কৌশলগত স্থান হিসেবে বিবেচিত। পূর্ববাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, অধিবাসীদের স্বতন্ত্র নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং বাঙালি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্যই সম্ভবত পাকিস্তানের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বিপরীতে এ অঞ্চলের মানুষকে নতুন করে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। কাজেই পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতিকে এর ভৌগোলিক উপাদান কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তা গুরুত্বসহকারে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে এসব বিষয় স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: পূর্ববাংলায় পেশাভিত্তিক সমাজ কাঠামো

আর্থ-সামাজিক ইতিহাস অধ্যয়নের মূল লক্ষ্য হলো কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের পূর্ণাঙ্গ জীবন চিত্র অংকন করা। পূর্ববাংলায় অব্যাহতভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মানুষ যেমন: শক-কুষাণ, হূণ, চালুক্য, ভোট-চীনা, চোল, কর্ণাট, হাবসী, আরাকানী-মগ, মোঙ্গল, পাঠান, উজ্বেক, পর্তুগীজ, ইংরেজ, বিহারী, মুলতানী, মাড়োয়ারী, সিন্ধিয়া, পাঞ্জাবী প্রভৃতির আগমণের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন একটি বহুত্ববাদী (Pluralistic Culture) সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে এসকল জনগোষ্ঠী বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কালের পরিক্রমায় বিলিন হয়ে গিয়ে বাংলা ভাষাভিত্তিক একটি সমসত্ত্বতা (Homogenity) সম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণ করেছে। স্বাভাবিকভাবে এখানে ধর্ম-বর্ণ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে অধিবাসীরা বিভক্ত। রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে এসকল শ্রেণি-চরিত্রের মানুষের ভূমিকাও বিভিন্ন রকমের। বর্তমান অধ্যায়ে পূর্ববাংলার অধিবাসীদেরকে সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতার ভিত্তিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে কার কি ভূমিকা ছিল সেটি বিশ্লেষণ করা জরুরি। ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট হাতেগোনা সুবিধাভোগী তথাকথিত অভিজাত শ্রেণি পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর সহযোগী হিসেবে সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীতে কাজ করে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে বিকশিত মধ্যত্তি শ্রেণী মানুষের অধিকারের প্রশ্নে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। এরাই এক সময় সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পরিশেষে অর্থনৈতিক কাঠামো ও মর্যাদার নীরিখে যারা সমাজের তলানীতে অবস্থান করছিল তারাও এক সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতকে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে গতিশীল করে। বর্তমান অধ্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: ধর্ম সমাজ ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক

পূর্ববাংলা ভারত বর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। বার্মিজ পর্বতশ্রেণি এটিকে পূর্ব-এশিয়া থেকেও বিচ্ছিন্ন করেছে। ফলে এখানে অধিবাসীরা প্রতিবেশী অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে অনেকটাই ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যুগ যুগ ধরে মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মানুষ ভারতে আগমণের মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষকে বহু ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্রে পরিণত করেছে। আবার মানব অভিগমনের স্রোত ভৌগোলিক কারণে পূর্ববাংলায় এস থেমে যায়। এসব কারণে পূর্ববাংলায় একটি সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। পূর্ববাংলায় বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। আবহমান কাল ধরে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের আগমনের মধ্য দিয়ে এ জনপদ সমৃদ্ধ হয়েছে। অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী বৈশিষ্ট্য পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এই অধ্যায়ে পূর্ববাংলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ, বিশেষ করে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব। ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে জন্ম নেওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পূর্ববাংলার অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ সম্পন্ন অধিবাসীদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি সম্যক চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। একই সাথে অত্র জনপদের মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের বিকাশ কেন ঘটেছিল সে বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এই অধ্যায়ের আলোচনায়।

পঞ্চম অধ্যায়: পূর্ববাংলার রাজনীতি ও রাজনৈতিক ঘটনা: পরিপ্রেক্ষিত পাকিস্তান রাষ্ট্র

ধর্মকে উপজীব্য করে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, পূর্ববাংলার অধিবাসীরা ধর্মীয় মূলবোধকে ব্যক্তিগত জীবনে লালন করলেও সামাজিক ও জাতীয় জীবনে তারা ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার অধিকারী ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্যেই এর ভাঙনের বীজ উপ্ত ছিল বলে অনেকে মত দিয়েছেন। কেননা ভারত বিভক্তির ধারণার মধ্যে স্বাধীন পূর্ববাংলা গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সেটিই ছিল মূলত বাঙালির রাষ্ট্র ভাবনা যা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল ও বিবাদমান আঞ্চলিক স্বার্থান্বেষী মহলের তৎপরতার কারণে পূর্ববাংলার জনস্বার্থ চাপা পড়ে যায়। রাজনৈতিক কৌশলে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের সাথে একীভূত করা হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি লগ্ন থেকেই পূর্ববাংলার সাথে পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেতে থাকে। সাংস্কৃতিক বিভেদ থেকেই মূলত রাজনৈতিক সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। আলোচ্য অধ্যায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

পর্যন্ত পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ও সংসদসহ সরকারের বিভিন্ন স্তরে পূর্ববাংলকে কিভাবে তার ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আইন পরিষদকে অকার্যকর করে রাখা, সংবিধান প্রণয়নে গড়িমসি করা, একের পর এক সামরিক শাসন জারি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকার গঠন করতে না দেয়া ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ববাংলাকে রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে রাখা হয়। রাজনৈতিক অসন্তোষ এবং বঞ্চনাবোধ থেকে পূর্ববাংলায় এ সময়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর বাইরে একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে যা মুক্তিযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। এই অধ্যায়ে মোটা দাগে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন, ৬৬'র ৬-দফা কর্মসূচি, ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান ৭০ এর নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একটি বিষয় স্মরণযোগ্য তা হলো, প্রাচীনকাল থেকেই পূর্ববাংলা ছিল 'রাজনৈতিক অর্থনীতির' (political economy) যোগানদাতা মাত্র। পূর্ববাংলার অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবি। এখানে বিভিন্ন ধরনের গ্রামীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ক্রিয়াশীল ছিল। তবে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে খুব একটা অগ্রসর ছিল না। পাকিস্তান শাসনামলে এ ধারার পরিবর্তন সূচিত হয়। এসময়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি কিভাবে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল সে বিষয়টিও এই অধ্যায়ের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক চর্চা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় পূর্ববাংলায় সেই অর্থে শক্তিশালী কোন আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। ব্রিটিশ আমলে 'অল ইন্ডিয়া'র পরিপ্রেক্ষিতে যেসকল রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল তা তৃণমূল পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতার অভাব এবং জনমানসের মূল্যবোধকে ধারণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের কাছে এসব দল উপযোগিতা হারায়। পারপরবর্তীকালে পূর্ববাংলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয় এবং সে সকল সংগঠন পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সোচ্চার হতে শুরু করে। তবে ভাষার প্রশ্নে প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন,সাংস্কৃতিক কর্মী, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে। এভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ২৪ বছরের শাসনকাল পর্যালোচনা করলে দেখ যায়, যে কোন সমস্যায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলো একে অপরের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো প্রথম এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিচয়, তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রতিবাদী কর্মসূচি ইত্যাদিসহ পাকিস্তানপন্থী সংগঠনের ভূমিকা ও পরিণতিও তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালি সংস্কৃতিকে হীন করে দেখার প্রবণতা এবং

এর পরিণতি এখানে উঠে এসেছে। পূর্ববাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো রাজনৈতিক সংগঠনের পরিপূরক ছিল কিনা সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। এ ছাড়াও পূর্ববাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিকাশ ও পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে সেসবের ভূমিকা পর্যালোচনা হয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত জাতীয়তাবোধ-এর উন্মেষ ঘটাতে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ছাত্র-শিক্ষক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা নিয়ে এ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: পূর্ববাংলার অর্থনীতি ও সমাজ

অতীতকাল থেকেই পূর্ববাংলার অর্থনীতির মূল যোগানদাতা ছিল কৃষি। ব্রিটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলটি কলকাতা ও আশেপাশের শিল্পাঞ্চলের পশ্চাদ্‌ভূমি হিসেবে পরিচিত ছিল। পূর্ববাংলা ছিল এসকল শহরের মানুষের খাদ্য ও শিল্প-কলকারখানার কাঁচামালের যোগানদাতা। ব্রিটিশ শাসনাবসানে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক পূনর্গঠনের মাধমে অধিবাসীদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে বলে মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। কেননা পাকিস্তান আন্দোলনে মানুষকে সে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান শাসনের শুরু থেকেই বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক নীতি গৃহীত হয়। সাংস্কৃতিক বঞ্চনার দ্রুত প্রতিক্রিয়া হলেও অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া হতে কিছুটা সময় লাগে। কেননা অধিকার সংক্রান্ত ধারণা তৈরি হতে এ অঞ্চলের মানুষের কিছুটা সময় লাগে। সাধারণভাবে মানুষ সব কিছুকে নিয়তি হিসেবে মনে করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষার উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনাতাও সৃষ্টি হয়। এভাবে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকার সংক্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে। ক্রমবিকাশমান শিক্ষার প্রভাবে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মতৎপরতার ফলে মানুষ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে অনুধাবন করতে শুরু করে। অধিবাসীদের মধ্যে এই উপলব্ধি তৈরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মূখ্য ভূমিকা পালন করে। ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তা সারা দেশে সঞ্চারিত হয়। এভাবে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্যে সংক্রান্ত প্রচারণার ফলে মানুষ অধিকার সচেতন ও প্রতিবাদমূখর হয়, যা রাজনৈতিক শক্তিকে বেগবান করে। এই অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ বিষয়টি পরিস্কারভাবে বোঝার জন্য পূর্ববাংলার ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ববাংলার প্রতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছিল তার কিছুটা তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পূর্ববাংলার অধিবাসীরা ভেবেছিল নতূন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের বঞ্চনার অবসান ঘটবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবস্থার আরও অবণতি হয়। চাকুরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প ও কলকারখানা, মুদ্রা ও ব্যাংকিং, উন্নয়ন বরাদ্দ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার চিত্র তথ্য-উপাত্ত সহকারে আলোচনার পাশাপাশি এই অর্থনৈতিক বঞ্চনাবোধ কিভাবে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে সে বিষয়টিও ফুটে উঠেছে বর্তমান অধ্যায়ে।

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার

পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৪৭-১৯৭১ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি পূর্ববর্তী আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এসকল অধ্যায়ের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে কিভাবে পূর্ববাংলার আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যে জনমানস, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মকে প্রভাবিত করেছিল। একই কারণে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ও মনস্তত্ব কিভাবে তাঁদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করেছে, যা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। উপর্যুক্ত অধ্যায়সমূহের আলোচনার ভিত্তিতে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। পূর্ববাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিভাবে রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করেছিল এবং যার ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তা উপসংহারে পরিস্কারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পরিশেষে পরিশিষ্ট এবং গবেষণায় ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জির একটি তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ R. C. Majumdar. *History of the freedom movement in India*, Vol. III, Firma KLM private Limited, Calcutta, 1963, p. 674, দৈনিক আজাদ, ১৪ জুন, ১৯৪৭

২ Indian Independence act 1947 এর সেকশন-৩ এর সাব সেকশন-১ এ বলা হয়েছে– As from appointted day the province of Bengal, as constituted under the Government of India Act, 1935, Shall cease to exist and there shall be constituted in lieu thereof two new provinces, to be known respectively as East Bengal and West Bengal. দ্রষ্টব্য– রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পা.), বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ: প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৬৫

৩ অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩১

৪ ঢাকা প্রকাশ, ২৪ আগস্ট, ১৯৪৭

৫ The Indian Independence Act, 18 July, 1947, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, প্রথম খন্ড, (১৯০৫-১৯৫৮), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ. ৩৫-৩৯

৬ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পা.),*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

৭ *Constituent Assembly of Pakistan*, Debates, Official report, 13th july 1955, Vol. 1, p. 296

৮ *Constituent Assembly of Pakistan*, Debates, Official report, 22nd September 1955, Vol. 1, p. 1045-1046

৯ দৈনিক পূর্বদেশ, ৩০ নভেম্বর, ১৯৬৯

১০ বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র প্রকাশনা-১, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১১ (অধ্যাপক ড. হারুন-অর রশিদ, বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা ২০১৯, বাংলাদেশ এশিয়াটি সোসাইটি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১২

১১ Nazmul Karim, *Changing Society in India Pakistan and Bangladesh,* Nawroz Kitab Bitan, Dhaka, second impression, 1961 p.142

১২ *Ibid,* p. viii

১৩ আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম: সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি সমীক্ষা*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৮

১৪ Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in national integration,* The University Press Limited, 1994, p. preface.

১৫ Kabir U Ahmad, *Breakup of Pakistan: Background and prospects of Bangladesh*, The social science publishers, London, 1972, p. 3

১৬ Ahmed kamal, *State Against the Nation: The decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-1954*, The university press limited, 2009, p. xvi

১৭ মোঃ হাবিবউল্লাহ্ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯): পার্লামেন্টের ভাষ্য*, বাংলা একাডেমী, ২০১৫, পৃ. ছয়

১৮ রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ১৯৪৭-১৯৭১, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩

১৯ A. M. A. Muhit, *Bangladesh Emergence of a nation*, The University press Limited, Dhaka, 1992, p. viii

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ভূগোল ও জাতি গঠন

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ভূগোল ও জাতি গঠন

পূর্ববাংলা একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অঞ্চল যা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অবস্থিত। অনেক ঐতিহাসিক উত্থান-পতন এবং ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এটি বর্তমান পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্তির মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ভূগোলের বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে ভাগ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালে এটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আলোচ্য অধ্যায়ে পূর্ববাংলার ভৌগোলিক ক্রমবিকাশ এবং অধিবাসীদের জনজীবনে এ অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভৌগোলিক প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে, পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ ও বিকাশে ভূ-প্রাকৃতিক প্রভাব নিরীক্ষা করা আমাদের মূল লক্ষ। পূর্ববাংলার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস গবেষণায় এ অঞ্চলের কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এবং ভৌগোলিক প্রভাবের বিষয়টি পূর্বের কোন গবেষণায় গুরুত্বসহকারে উঠে আসেনি। অধিকাংশ গবেষণায় সাধারণভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ববাংলার দূরত্ব ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি অঞ্চল দুটির মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধের প্রাথমিক কারণ হিসেবে দেখানোর প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে। বর্তমান অধ্যায়ে পূর্ববাংলার ভৌগোলিক ক্রমবিকাশ এবং বাঙালি জাতিসত্তা তথা জাতীয়তাবাদী চেতনা বিনির্মাণে ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্রময়তার কোন প্রভাব ছিল কিনা সেটি অনুসন্ধান করা জরুরী। কেননা, আবহাওয়া, জলবায়ু এবং ভূ-প্রকৃতি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠন এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের একটি বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। কাজেই এ অঞ্চলের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনপ্রণালি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্ব নির্মাণে ভৌগোলিক প্রভাব বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুলতানী আমলে পূর্ববাংলা সর্ব প্রথম একক শাসনাধীনে আসে। এর পূর্বে এটি কোন একক শাসনাধীনে ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চল ছোট ছোট জনপদে বিভক্ত হয়ে সামন্ত শাসকদের শাসনাধীনে ছিল। রেঁনেলের মানচিত্র তৈরীর পূর্বে সম্ভবত এদেশের পূর্ণাঙ্গ কোন মানচিত্রও ছিল না। কাজেই আলোচনাধীন অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবর্তনের সঠিক ইতিহাস নির্মাণ করাও বেশ কঠিন। বিখ্যাত গ্রিক (ম্যাসিডেনীয়) বীর আলেকজান্ডার (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭-৩২৪) ভারতবর্ষ অভিযানে এসে পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করে পূর্বে যাত্রার রণকৌশল নির্ধারণের সময় জানতে পারেন প্রাসিয়ার (প্রাচ্য) পূর্বে 'গঙ্গারিডি' নামে একটি দেশ আছে। ঐতিহাসিকগণের মতে, গঙ্গার ঋদ্ধি (বৃদ্ধি) প্রাপ্ত অঞ্চলই গঙ্গারিডি হিসেবে পরিচিত।[১] ধারণা করা হয়, এটিই পূর্ববাংলার প্রাচীন সীমা নির্দেশক। এ অঞ্চলে গড়ে ওঠা প্রাচীন জনপদের মধ্যে পঞ্চ, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল, বঙ্গ ইত্যাদি অঞ্চল নিয়ে আধুনিক পূর্ববাংলা গঠিত বলে ধারণা করা হয়।[২] ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ[৩] এ অঞ্চলে মুসলমানদের অভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ নামের বিভিন্ন অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণের মধ্যে জিয়াউদ্দিন বারানী (মৃত্যুঃ ১৩৫৭ খ্রি.) সর্বপ্রথম 'বাঙ্গালা' শব্দটি ব্যবহার করেন।[৪] শামস্-সিরাজ আফীফ সুলতান শামস্-উদ-দীন ইলিয়াস শাহকে 'শাহ্-ই-বঙ্গালা', 'সুলতান-ই-বাঙ্গালিয়ান' বা 'সুলতান-ই বাঙ্গালা' বলে আখ্যা দেন।[৫] ইলিয়াস শাহ্‌র শাসনামলে সর্বপ্রথম এ অঞ্চলের বিভিন্ন জনপদ একক শাসনাধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এ অঞ্চলটি সুলতানী আমলে 'বাঙ্গালা' মোগল আমলে 'সুবা বাংলা', ব্রিটিশ আমলে 'বেঙ্গল' আধুনিককালে বাংলা হিসেবে পরিচিতি পায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় 'বেঙ্গালা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মার্কোপোলো (১৩ শতক), ইবনে বতুতা (১৩৩৩-১৩৪৬), ভার্থেমা (১৫০৩-১৫০৮), ডুয়ার্তো বারবোচা (১৫১৪), জোয়াও দ্য ব্যারোস (১৫৫০), সীজার ফ্রেডারিক (১৫৬৩-১৫৮১), র‍্যালফ ফিচ্ (১৫৮৬), দুজারিক (১৫৯৯), স্যামুয়েল পর্চাস (১৬২৬), ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ার (১৬২০-১৬৮৮) প্রমূখ পরিব্রাজকের বর্ণনা এবং ব্ল্যভের (১৬৫০), সসেন (১৬৫২), ও গ্যাস্টালদি (১৫৬১) প্রমুখ ভূগোলবিদদের মানচিত্র অনুযায়ী 'বেঙ্গালা' বলতে পূর্ববাংলার ভৌগোলিক সীমাকেই নির্দেশ করে।[৬] 'বেঙ্গালা' বা 'বঙ্গ' এ অঞ্চলের দক্ষিণ পূর্ব দিকে সমুদ্র উপকূলের কাছে অবস্থিত ছিল বলে বিদেশি বণিকদের মাধ্যমে এ অঞ্চলটি বাইরের দুনিয়ায় পরিচিতি পায়।[৭] এছাড়া বঙ্গকে এক সময় জাতিবাচক অর্থে বোঝানো হতো যাদের মুখের ভাষা ছিল বাংলা।[৮] বাংলা শব্দটি ভৌগোলিক, ভাষাগত এবং জাতিবাচক এই তিনটি অর্থেই ব্যবহৃত হতে থাকে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর 'বাঙ্গালার' ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত হওয়ায় এই বন্দরের মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকেই বাঙ্গালা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি পায়।

এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোলের ক্রম বিবর্তন লক্ষ করে একথা বলা যায় যে, 'বঙ্গ' শব্দ থেকেই আধুনিক বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে। বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উৎপত্তির পথ পরিক্রমায় এ অঞ্চল যে সকল রাজবংশের শাসনাধীনে ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, গুপ্ত শাসনকাল, হরসা-শশাঙ্ক শাসনকাল, পাল বংশের শাসনকাল, সেন বংশের শাসনকাল, সুলতানী আমল, মোগল আমল, ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তানী আমল হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উৎপত্তি। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বারে বারেই এর রাজনৈতিক ভূগোলের পরিবর্তন হয়েছে। জেমস রেঁনেলের মানচিত্রের মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক ভূগোলের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

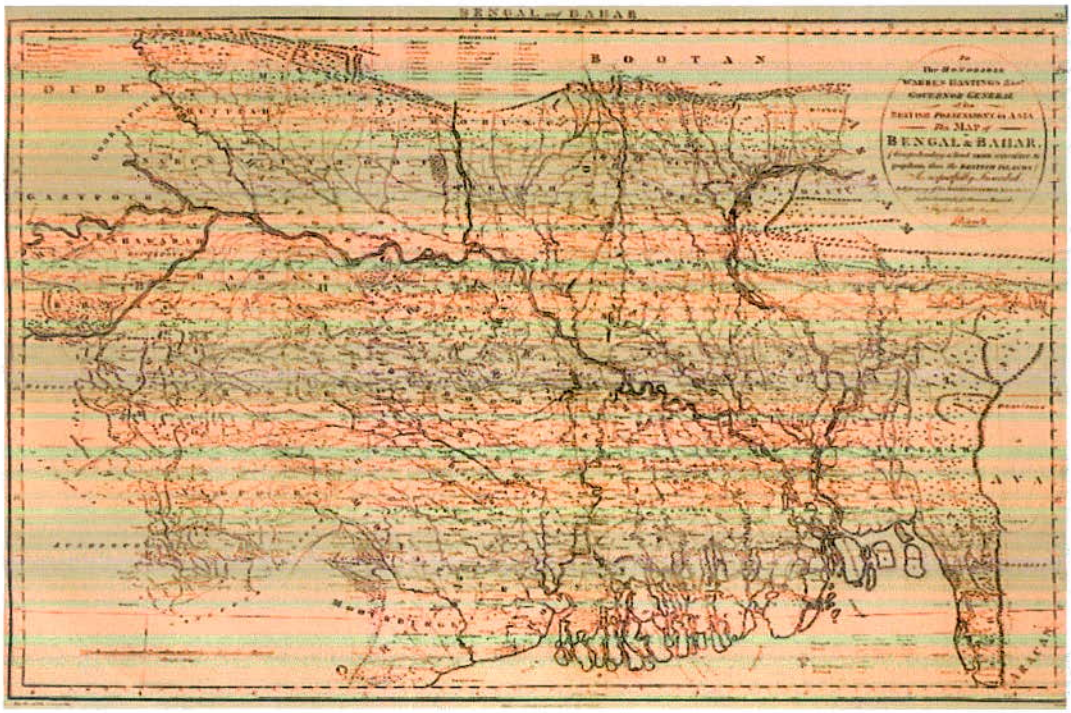

মানচিত্রে বাংলা ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল (জেমস রেঁনেল, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ)[৯]

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক ভূগোল দুইবার পরিবর্তিত হয়। ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভাগ করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে একদিকে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোলে নতুন মাত্রা যোগ হয় অপরদিকে অধিবাসীদের মনস্তত্ত্বেও নতুন রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বোধের জন্ম লাভ করে। আর ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগ এক অভাবনীয় রাজনৈতিক মানচিত্রের জন্ম দেয়। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের দুটি আলাদা ভৌগোলিক অবস্থান তৈরী হয়। দুটি অংশের মধ্যে ১২০০ মাইলের ব্যবধান তৈরী হয় মাঝখানে অন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অবস্থিতির কারণে। পৃথিবীর মানচিত্রে ঔপনিবেশিক শাসন

কাঠামোর বাইরে এধরনের রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিরল। ১৯০৫ সালের বাংলা ভাগ করার কারণ হিসেবে ব্রিটিশ সরকার যে কথাই বলুক না কেন এটি ছিল বাঙালির ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনার প্রতি প্রথম আঘাত।

নিচের মানচিত্রে ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার ভৌগোলিক বিবর্তনের একটি চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে–

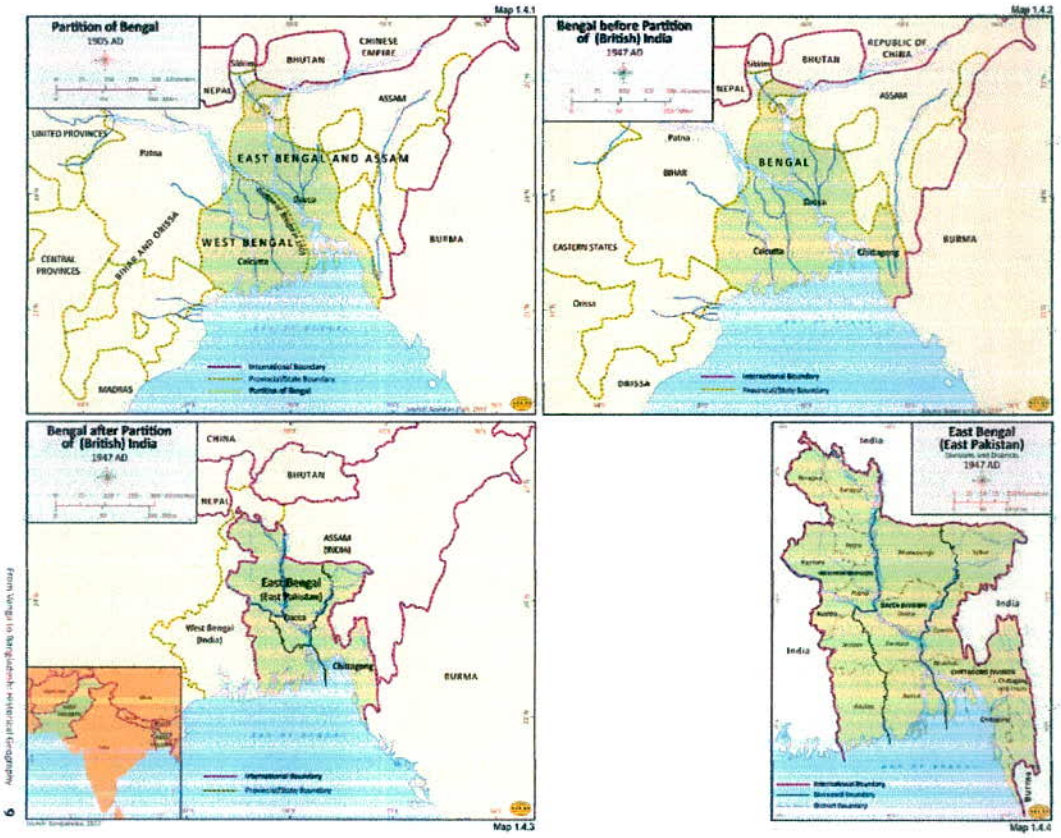

চিত্র: ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ভূগোলের বিবর্তন।[১০]

উপরের মানচিত্রে বাংলার ইতিহাসে যে ক্রমবিবর্তন দেখানো হয়েছে তাতে লক্ষণীয় যে, ১৯০৫ সালের বাংলাভাগের ফলে পূর্ববাংলার মানুষ একে স্বাগত জানিয়েছিল কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এর বিরোধিতা করেছিল। তাঁরা এই বিভাগ প্রক্রিয়াকে বাঙালি জাতিসত্তার উদ্দেশ্যমূলক বিভক্তিকরণ হিসেবে দেখেছিল। অন্যদিকে ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগ বাংলার উভয় অংশের অধিবাসীদের হতাশ করেছিল। এবারের বাংলা ভাগ এ অঞ্চলের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বাঙালিত্বের একতাকে বিভক্ত করে ধর্মীয় ভাবধারায় জাতি গঠনের প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করা যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যাবে ভৌগোলিক বাস্তবতা কিভাবে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা নৃ-তাত্ত্বিক ঐক্যের বিপরীতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গড়ে তোলা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের চেতনাকে অকার্যকর করে দেয়। পাকিস্তানের সাথে পূর্ববাংলার

জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় জাতি গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যেই ভাঙ্গনের বীজ উপ্ত ছিল, যা এ অঞ্চলের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করে।

২.১ পূর্ববাংলার রাজনৈতিক সীমা এবং এর ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় ব্রিটিশ ভারতের 'বেঙ্গল' প্রদেশকে ভাগ করে যেসব অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তানের পূর্ববাংলা প্রদেশ গঠন করা হয়েছিল সেসব ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। ইতোমধ্যে স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে পূর্ববাংলার বিকাশের সংক্ষিপ্ত অথচ ধারাবাহিক একটি বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। অবিভক্ত বাংলার সর্বমোট আয়তন ছিল ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল। মুসলিম সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে বাংলার ৪৯,২৫৯ বর্গমাইল এবং সিলেট ও আসাম প্রদেশের প্রায় ৪,৮৮২ বর্গমাইল এলাকাসহ নবগঠিত পূর্ববাংলা প্রদেশের সর্বমোট আয়তন হয় ৫৪১৪১ বর্গমাইল।[১১] তৎকালীন সময়ে পূর্ববাংলার উত্তরে ভারতের আসাম প্রদেশ, পূর্বদিকে বার্মা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ছিল এর আন্তর্জাতিক সীমানা। পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশের কিছু পার্বত্য এলাকা ব্যতীত পূর্ববাংলার বেশির ভাগ এলাকাই সমতল। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মিলিত প্রবাহে যুগ যুগ ধরে পলি সঞ্চয় করে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ পূর্ববাংলার ভূ-ভাগ গঠিত হয়েছে।[১২] বি এম মরিসন বাংলাকে যে পাঁচটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করেছেন তার অধিকাংশই পূর্ববাংলার অংশ।[১৩] চট্টগ্রাম ও সিলেটের পার্বত্যাঞ্চল মূলত টারশিয়ারী যুগের পাহাড়ী এলাকা যা বার্মা এবং আসামের পাহাড়ী এলাকার বর্ধিতাংশ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহীর উচুঁ ভূমি 'বরেন্দ্র অঞ্চল' নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কিছু ছোট বড় নদী যা এ অঞ্চলের জীবনধারা সচল রেখেছে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র এবং বুড়িগঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ প্লায়োস্টোসিন যুগের উচুঁ ভূমি নামে পরিচিত। কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ও প্লায়োস্টোসিন যুগের ভূমি। পূর্ববাংলার অবশিষ্ট অংশ সাম্প্রতিক কালের পলিমাটি দ্বারা গঠিত সমভূমি। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং যমুনা অববাহিকা জুড়ে এই সমভূমির অবস্থান। ময়মনসিংহের পূর্বাংশ এবং সিলেট অঞ্চলের বেশির ভাগ এলাকা জুড়ে রয়েছে অনেক হাওড় তথা নিচু এলাকা। উত্তরাংশের বড় নদী থেকে সৃষ্ট খালের জল প্রবাহের দ্বারা চলন বিল সৃষ্টি হয়েছে। চলন বিল বর্তমানে নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলা নিয়ে গঠিত। ফেনী, মাতামুহুরী, সাঙ্গু এবং কর্ণফুলি নদী চট্টগ্রাম, ফেনী ও নোয়াখালী অঞ্চলের জীবনযাত্রার ওপর ব্যাপক প্রভাব রেখে চলেছে। গঙ্গা নদী থেকে সৃষ্ট অসংখ্য ছোট বড় খাল প্লাবিত হয়ে দক্ষিণাঞ্চলের পলল ভূমি গঠিত হয়েছে। গড়াই, মধুমতী এ অঞ্চলের দুটি প্রধান নদী। নদীর গতি-প্রকৃতির সাথে এ অঞ্চলের গতি-প্রকৃতিও নিয়ত পরিবর্তনশীল। গঙ্গা অববাহিকার দক্ষিণাংশে জোয়ার ভাটার মাধ্যমে সৃষ্ট পলল ভূমিতে পৃথিবীর বৃহত্তম 'ম্যানগ্রোভ' বনভূমি সুন্দরবন অবস্থিত। এ অঞ্চলের জনজীবনে সুন্দরবনের ভূমিকা অপরিসীম।

পূর্ববাংলায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমী জলবায়ু বিরাজমান। এখানে গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকাল শুষ্ক ও ঠাণ্ডা থাকে। ছোট আয়তন, সাগরের নৈকট্য, সমতলভূমি, গাছপালার আধিক্য, প্রচুর নদ-নদী এবং হাওড়-বাওড়ের পর্যাপ্ত জল সরবরাহ থাকায় পূর্ববাংলায় স্থানভেদে জলবায়ুর তারতম্য খুব একটা নেই। শীতকাল এখানে আরামদায়ক। গ্রীষ্মকালে এখানে কিছুটা গরম আবহাওয়া বিরাজমান। গ্রীষ্মকালের শেষের দিকে বজ্রবৃষ্টিসহ কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যায়। কালবৈশাখী ঝড় মৌসুমী ফসল পাট ও আউশ ধান বপনের উপযোগী বৃষ্টিপাত ঘটায়। জুলাই থেকে অক্টোবর মাস বর্ষাকাল। বর্ষাকালে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। বর্ষার বৃষ্টিপাতের ফলে তাপমাত্রা কিছুটা কম হয়। বর্ষাকালে দেশের নিম্নাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যায়। বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি সঞ্চিত করে, ফলে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রাকৃতিকভাবে এদেশ উচ্চ ফলনশীল কৃষি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। উর্বর ভূমি এ অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করেছে। এছাড়া প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চল বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। মুঘলদের পতনের যুগে তাদের রাজস্ব আয়ের একটা বড় জোগান আসতো বাংলা থেকে।[১৪] ব্রিটিশ শাসনামলেও পূর্ববাংলা কলকাতার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং শিল্পের কাঁচা মালের প্রধান জোগানদাতা ছিল। অনুরূপভাবে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান রপ্তানি পণ্য পাট প্রধানত পূর্ববাংলায় উৎপাদিত হত। সে সময় এটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল।

২.২ জনজীবনে আবহাওয়া জলবায়ু ও ভৌগোলিক প্রভাব

একটি অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু এবং ভূ-প্রকৃতি সে অঞ্চলের জনজীবনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। জার্মান দার্শনিক জর্জ ভিলহেলম ফ্রেডরিখ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) জাতীয় চরিত্র গঠনে ভূগোল ও জলবায়ুর উপাদানের গুরুতপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ুর প্রভাবে একটি জাতির আত্মিক পরিচয় গড়ে ওঠে, যা কালের ব্যবধানে সুনির্দিষ্ট নীতি হিসেবে গৃহীত হয়। তা থেকে জন্ম নেয় বিশেষ চেতনা ও বাস্তবতা। এভাবেই সৃষ্টি হয় জাতির আভ্যন্তরীণ ইতিহাস।[১৫] আমরা হেগেলের তত্ত্বের আলোকে পূর্ববাংলার জনচরিত্র গঠনে ভৌগোলিক উপাদান ও জলবায়ুর প্রভাব নিরীক্ষার সাথে সাথে ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের সাথে পাকিস্তানের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক মনস্তাত্ত্বিক দিকের কি ধরনের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর আবর্তনে পূর্ববাংলার আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হয়। আবহাওয়া ও জলবায়ুর মতই পূর্ববাংলার মানুষের চরিত্রও বৈচিত্র্যের অধিকারী। এখানে মানুষকে সর্বদা প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা, সাইক্লোনসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্ববাংলার

ভৌগোলিক বাস্তবতা। এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে টিকে থাকার কারণে এ দেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সংগ্রামী চেতনার অধিকারী হয়। বাংলার মানুষের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। বাংলার অধিবাসীদের বিদ্রোহী ও সংগ্রামী চেতনার যথার্থ চিত্র অঙ্কন করেছেন জিয়াউদ্দিন বারানী। তিনি বলেছেন,

> অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা লক্ষণাবতীকে 'বলগাকপুর' (বিদ্রোহী অঞ্চল) বলিয়া ডাকিতেন। প্রাচীনকাল অর্থাৎ মুয়েজউদ্দিন মুহম্মদের দিল্লী অধিকার করার পর হইতে দিল্লীর বাদশাহগণ যে সকল লোককে লক্ষণাবতীর শাসক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে; যাহারা বিদ্রোহ করে নাই, অন্য লোকেরা তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে ...। ফলে অনেক দিন হইতেই বিদ্রোহ ঘোষণা এই অঞ্চলের লোকজনের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে এবং যে কোন শাসক এই অঞ্চলে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তথাকার বিদ্রোহী জনসাধারণ তাহাকে কেন্দ্রের বিরোধী করিয়া তোলে।[১৬]

জিয়াউদ্দিন বারানীর এই বক্তব্য খুবই গুরুত্বসহকারে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর বিবরণে তিনটি বিষয় ফুটে ওঠেছে। প্রথমত, বাংলায় নিয়োগ লাভের পরই যে কোন শাসক তাঁর উর্ধতন কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন; দ্বিতীয়ত বিদ্রোহ না করলে অন্যরা তাকে হত্যা করতেন; তৃতীয়ত, স্থানীয় অধিবাসীরা নিযুক্ত শাসককে বিদ্রোহী হতে প্ররোচনা দিতেন। বারানীর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে পূর্ববাংলায় শাসক যেখান থেকেই আসুক সে বিষয়ে অধিবাসীদের কোন সমস্যা নেই, তবে তাকে অন্যের অধীনতামুক্ত থাকতে হবে। তাঁরা শাসকের পরাধীনতাকে নিজেদের পরাধীনতা হিসেবে দেখেছেন। অর্থাৎ শাসককে তারা সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে মনে করতেন। পরবর্তীতে মোগল অভিজাত আবুল ফজলও বাঙালি চরিত্রের প্রায় একই রকমের চিত্র অংকন করেছেন। তিনি তাঁর আকবরনামায় লিখেছেন "বঙ্গদেশ এমন একটা জায়গায় অবস্থিত, যেখানে আবহাওয়ার কারণে মানুষের মনে বিদ্রোহের মনোভাব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানুষ শঠতার শিকার হয়। এই শঠতা পরিবার ও জনপদকে ধ্বংস করে। প্রাচীন গ্রন্থে সে কারণে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে অশান্ত গৃহ হিসেবে (Balghakkana- house of turbulence)।"[১৭] আবুল ফজল ও জিয়াউদ্দিন বারানীর বক্তব্য অনুসারে বাংলার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান জনচরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ধারক। আর এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়; কারণ এ দুজন ঐতিহাসিক দুটি পৃথক যুগের প্রতিনিধিত্ব করে; একজন সুলতানী আমলের অন্যজন মোগল আমলের। তাঁদের এ মন্তব্য বাংলার অধিবাসীদের ওপর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের বিষয়টি ফুটে ওঠে, যা পূর্বে উল্লেখিত জনজীবনের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মানস গঠনে ভৌগোলিক প্রভাব সংক্রান্ত হেগেলের মতকেও সমর্থন করে।

বাংলায় দুই'শ বছরব্যাপী স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত ছিল। মোগল আমলের শুরুর দিকেও বাংলা প্রায় স্বাধীন ছিল। বাংলার ভাটি অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার বার ভূঁইয়ারাও মোগল সেনাদের বিরুদ্ধে সর্বদা

লড়াই করে স্বাধীন জমিদারী পরিচালনার চেষ্টা করেছেন।[১৮] সুলতানী ও মোগল আমলের আগেও প্রাচীনকালেও এ অঞ্চলে স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। গ্রীকদের বর্ণনা মতে, গঙ্গাঋদ্ধি হয়তো চার-পাঁচশো বছর স্বাধীন ছিল।[১৯] ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে গুপ্ত শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।[২০] ধারণা করা যেতে পারে যে, এই স্বাধীনতা বলতে মূলত স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় তা ১৯৭১ সালের পূর্বে এ অঞ্চলে গড়ে ওঠেনি। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা এবং ভৌগোলিক দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতার সুযোগে এ অঞ্চলের শাসকরা কখনো কখনো কার্যত স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সেটাকে কোনভাবেই সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলা যাবে না। তবে এ অঞ্চলের মানুষের স্বাধীনচেতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা অনেক ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন।

এ অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাধীনচেতা মনোভাব গঠনে ভৌগোলিক প্রভাবের বিষয়ে আবুল ফজলের ধারণা একেবারেই অযৌক্তিক নয়। পূর্ববাংলার সাংবাৎসরিক আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক কার্যকলাপ একটি ছকে বাঁধা। গ্রীষ্মের শেষে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে কালবৈশাখী ঝড় রুদ্র মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং জনপদ ও সম্পদের ওপর ধ্বংস লীলা চালায়। আবার জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এক বা একাধিক সাইক্লোনের আবির্ভাব জনপদকে পর্যদুস্ত করে। এভাবে সম্পদ এবং জীবনহানী এখানকার অধিবাসীদের নিয়তি। এছাড়া বন্যা, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগও বাংলার মানুষকে নিয়মিত মোকাবেলা করতে হয়। আবহাওয়ার এই রুদ্ররোষ একদিকে মানুষকে বিদ্রোহী চেতনার অধিকারী করে অপরদিকে প্রকৃতির অপার মহিমায় খাদ্যের সহজ লভ্যতা মানুষকে করে অলস ও আরামপ্রিয়। এই অদ্ভুত বৈপরিত্যের মাঝেই এ জনপদ সর্বদাই কর্মমুখর থেকেছে। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানকার মানুষের আর্থ-সমাজিক কার্যক্রমকে মাঝে মাঝে ব্যাহত করতে পারলেও এর অগ্রগতিকে রোধ করতে পারেনি। এখানে হেগেলের তত্ত্ব অনুযায়ী বিদ্যমান পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়ে মানুষ নিজেরাই সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করার শক্তি অর্জন করেছে যা কালের আবর্তে জাতীয় চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই সংগ্রামী চেতনাই ধীরে ধীরে মানুষের মনে জাতীয় স্বাধীনতার চেতনা জন্ম দেয়।

এ অঞ্চলের অধিবাসীরা নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁদের জীবন সচল রেখেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা দেশ বিদেশের মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়ে, যা এ অঞ্চলের রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। কখনও রাজনৈতিক কারণে, কখনও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিরীক্ষণ করার জন্য, কখনো আবার নিছক ভ্রমণের নেশায় বহু বিদেশি পর্যটক বাংলা ভ্রমণ করেছেন। এদের বর্ণনায় বাংলার প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ আছে। আফ্রিকান পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলার ভৌগোলিক

অবস্থানগত সুবিধা ও সৌন্দর্যের যেমন প্রশংসা করেছেন[২১], তেমনি মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ফ্রান্সের অধিবাসী ফ্রাসোঁয়া বার্ণিয়ার বাংলাকে অদ্ভুত এক সৌন্দর্যমণ্ডিত সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে বর্ণনা করেছে। তিনি বাংলার ভৌগোলিক সৌন্দর্যের বর্ণনার পাশাপাশি এর ভৌগোলিক গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। বার্ণিয়ার বাংলাকে তৎকালীন সময়ে পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধশালী দেশ মিশরের চেয়ে উন্নত বলে মনে করেছেন। বাংলার অসংখ্য নদ-নদী সমুদ্রের সাথে যুক্ত হওয়ায় নৌবাণিজ্যের আন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তর্দেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।[২২] বার্ণিয়ারের তথ্যে বাংলার বাণিজ্যিক সুবিধার পাশাপাশি এর কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের গুরুত্বের বিষটিও ফুটে ওঠেছে; কেননা প্রাচীন কাল থেকে আরব বণিকরা চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যেমন বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, পরবতিকালে পর্তুগীজ ও ইংরেজ বণিকরা এ অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হয়েছিল। পূর্ববাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের অন্য একটি দিকও উল্লেখযোগ্য, তা হলো নদ-নদী যেমন বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, ঠিক তেমনি এসবের সুবিধা নিয়ে বাংলা বহিঃশত্রুর প্রভাব মুক্ত থেকেছে। সুলতানী ও মোগল শাসনামলে এ কারণে বাংলার শাসকরা কার্যত স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে পেরেছে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে পূর্ববাংলার ওপর কিছুটা প্রভাব রাখতে পারলেও বর্ষা মৌসুমে তাঁরা দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে বসতেন। বাংলাকে বসে আনা মোগলদের জন্যও কঠিন হয়ে পড়েছিল যা আবুল ফজলের মন্তব্যেও বোঝা যায়। এভাবে যুগ যুগ ধরে ভৌগোলিক সুবিধা নিয়ে এ অঞ্চলের মানুষ এক ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করেছে।

তবে একথা সত্য যে বাংলা অধিকাংশ সময়ই বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর দ্বারাই শাসিত হয়েছে, কিন্তু শাসকশ্রেণির লোকেরা কর আদায় ব্যতীত অধীবাসীদের নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং জীবণধারা ব্যাহত হয় এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এ কারণে শাসকগোষ্ঠীর ব্যাপারে তারা সর্বদা উদাসীন থেকেছে। এ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে অধিবাসীদের মননে জন্ম হয়েছে স্বায়ত্বশাসনের মনোভাব। যার ফলে তারা কখনোই নিজস্ব জীবনাচরণের ক্ষেত্রে বাইরের আরোপিত কোন ধরনের প্রভাব মেনে নেয়নি। পি সি চৌধুরী ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তাঞ্চলের জনজীবনে ভৌগোলিক প্রভাব নির্ণয় করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এখানকার জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনচেতা মনোভাবাপন্ন করেছে। [২৩] পূর্ববাংলাও একই প্রাকৃতিক অঞ্চলে অবস্থিত। বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এ অঞ্চলকে যে প্রাকৃতিক সুরক্ষা দান করেছে তা অধিবাসীদের মনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেতনা জন্ম দেয়।[২৪] এই ধরনের মনোভাব যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলের মানুষের জাতীয় স্বাধীনতার চেতনার উন্মেষ ঘটায়। বাংলার অধিবাসীদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোটামুটি সকলেই একমত পোষণ করেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে, এসব বিবরণের বহু পূর্বে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (Hiuen Tsang, 629-645)

বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্যসূচক বিবরণ দিয়েছেন।[২৫] পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজক বা রাষ্ট্রদূতগণও বাংলার স্বতন্ত্র ভৌগোলিক গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন।[২৬] তাঁদের সকলের বর্ণনায় বাংলার জনজীবনে ভূ-প্রকৃতির প্রভাবের বিষয়টি পরিস্কারভাবে চিত্রিত হয়েছে। আমেরিকার প্রাক্তন সেনাকর্মকর্তা জেমস জে নোভাক বহু বছর বাংলা ভ্রমণ করে লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে পূর্ববাংলার জনজীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি এখানকার আবহাওয়া ও জলবায়ুর বর্ণনা দিতে গিয়ে ষড়ঋতুর চিত্র এমনভাবে অঙ্কন করেছেন যা থেকে এ অঞ্চলের জনচরিত্র গঠনে ভূ-প্রকৃতির প্রভাবকে দৃশ্যমান করে। তার মতে, পূর্ববাংলার মত মনোরম আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় দেশ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। বাংলার ষড়ঋতুর আবর্তনের সাথে সাথে এর আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হয়। প্রতি ঋতুতে জন্মে ভিন্ন ভিন্ন ফল ও ফসল। তিনি মনে করেন পূর্ববাংলার রয়েছে একটি সমৃদ্ধশালী এবং স্বাতন্ত্র্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।[২৭] ঋতুর আবর্তনের সাথে সাথে মানুষের দৈনন্দিন কর্মকান্ডও নিয়ত পরিবর্তিত হয়। আবহাওয়া ও জলবায়ু কিভাবে পূর্ববাংলার মানুষের লোকজ প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে তা নীহাররঞ্জন রায়ের বর্ণনায়ও ফুটে ওঠেছে।[২৮] পূর্ববাংলার মানুষের জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু আদিবাসী এবং পাহাড়ী জনগোষ্ঠী থাকলেও অধিকাংশ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে, পোশাক পরিচ্ছদ খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রায় সকলের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। ফলে অধিবাসীদের মধ্যে একটি সাধারণ চেতনা গড়ে ওঠেছে যা তাদের মধ্যে একটি জাতীয়তাবোধের ধারণা তৈরী করতে সহায়ক।

অপরদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের অধিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই ব্যাপক বৈশাদৃশ্য বিদ্যমান। সেখানকার আবহাওয়া জলবায়ু, ভূমিরূপ অত্যন্ত রুক্ষ এবং চরমভাবাপন্ন। মরুময় উষর ভূমি, চরমভাবাপন্ন জলবায়ু, রুক্ষশুষ্ক পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভৃতির প্রভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের আচার-আচরণে অসহিষ্ণুতা ও রুক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই পাকিস্তানের উভয় অংশের গঠনগত পার্থক্য অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠার পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে ই.এল. হামজার একটি পর্যবেক্ষণ খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন,

> When a number of different races have been living in different climatic conditions for ages, it is not been possible that there should be much common between them. Bengal its 80 inches of annual rainfall, its hot and humid atmosphere, its rice fields, its impenetrable thick forests, its mighty cities and its amazing dense population of dark lithe, jute and rice cultivators, is a different world from the Punjab with its dry, treeless plains, its extremly cold winters and extremly hot summers, its desart flora and fauna, and its comparatively spares population of tall, big-boned Aryan and cotton growers.[২৯]

এই বক্তব্যে ভৌগোলিক কারণে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পরিবেশ প্রতিবেশ এবং অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্যে ফুটে ওঠেছে। সে কারণে পাকিস্তানের মত একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনেকেই সন্ধিহান ছিলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতে, 'কংগ্রেসীদের মধ্যে দেশভাগের সবচাইতে বড় সমর্থক ছিলেন সর্দার প্যাটেল। তিনি দেশভাগকে ভারতীয় সমস্যার সবচেয়ে সেরা সমাধান বলে মনে করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল পূর্ববাংলা পাকিস্তানের সাথে বেশি দিন থাকতে পারবে না'।[৩০] পূর্ব ও পশ্চিমের পার্থক্য লক্ষ করে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। এ রকম দুটো বৈশাদৃশ্যপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল নিয়ে একটি জাতি রাষ্ট্রের চিন্তাকে অবাস্তব বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। অনেক চিন্তাবিদ পাকিস্তানকে দেশ হিসেবে 'অঙ্গবিকৃত' এবং ভৌগোলিক দিক থেকে 'অসামঞ্জস্যপূর্ণ জাতি' হিসেবে মন্তব্য করেছেন।[৩১] উভয় অংশের মানুষ মুসলিম শুধু মাত্র এই বাস্তবতা একটি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। আবহাওয়া এবং জলবায়ু একজন মানুষের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, পেশা, আবেগ, অনুভূতি, রুচি, অনুরাগ, বিরাগ ইত্যাদি মানবিক মূল্যবোধ গঠনে ভূমিকা রাখে। এভাবে গড়ে ওঠে একটি সমাজের সাধারণ পরিচয়। ইএল হামজা উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রস্তাবিত রাষ্ট্র এবং পূর্ব ভারতে বাংলার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবনপ্রণালি, অধিবাসীদের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য, জনঘনত্ব ইত্যাদির পার্থক্য তুলে ধরে উভয় অংশের মানুষ একত্রে থাকার সম্ভানাকে নাকচ করে দেন।[৩২] ভৌগোলিক ভিন্নতাই পাকিস্তানের উভয় অংশের মানুষের মধ্যে মূল পার্থক্য গড়ে দেয়। আর সে কারণেই ধর্মের ভিত্তিতে একটি জাতি রাষ্ট্র গড়ে ওঠার স্বপ্নে বিভোর নেতাদের ঘুম ভাঙ্গার আগেই নতুন রাষ্ট্রের ভাঙ্গনের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর উপাদানই যে জাতিগত পার্থক্যের অন্যতম প্রধান কারণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিখ্যাত সাংবাদিক অ্যান্থনী মাসকারেণহাস তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান থেকে যে ভাষ্য প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে "পশ্চিম পাকিস্তানের প্রকৃতি জনগণকে কর্মঠ ও উগ্র করেছে। কষ্টসহিষ্ণু পার্বত্য মানুষ ও উপজাতীয় কৃষকদের সবসময় বন্ধুর পরিবেশে জীবন ধারণের জন্য তৎপর থাকতে হয়। বাঙালি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। ভদ্র ও মর্যাদা সম্পন্ন বাঙালি, তারা সহজ জীবন যাপন ও ব-দ্বীপ এলাকার প্রাচুর্যে বসবাসে অভ্যস্ত।"[৩৩] পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-দর্শন, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্যের প্রাথমিক কারণ জলবায়ু ও ভূ-প্রাকৃতিক ভিন্নতার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

প্লাবণ-ভূমির বৈশিষ্ট্য পূর্ববাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূ-প্রকৃতি থেকে আলাদা করেছে শুধু তা-ই নয়, এ অঞ্চলকে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাতন্ত্র্য ভৌগোলিক অঞ্চলের মর্যাদা দান করেছে। সে কারণে উভয় অংশের অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের শত প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের উভয় অংশের মানুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ৫০০ টাকা

যৌতুক প্রদানের রীতি চালু করা হলেও এক্ষেত্রে খুব একটা সফলতা আসেনি।[৩৪] জাতিগত চেতনার প্রতি বাঙালির সহজাত আকর্ষণই এর মূল কারণ। ব্রুনেল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কবির উদ্দিন আহমেদ বলেন,

> Its (Pakistan) geography did not constitute a natural boundary of a 'Nation State'. ...the Bengali speaking people of the Eastern wing were linguistically, culturally and economically a` homogeneous group while the population of West Pakistan were a heterogenous conglamerate of verious nationalities.[৩৫]

অবশ্য এ ধারার বিপরীত ছিলেন টরেন্টো ইউনিভার্সিটির রাজনৈতিক ভূগোলবিদ অধ্যাপক আলী তাইয়েব। পাকিস্তানের দুই অংশের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য নিয়ে যখন দুই অংশের রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিদি, রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানীরা তুমুল বিতর্কে লিপ্ত, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নিয়ে যখন নানা আলোচনা চলছে এমন সময়ে তিনি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ববাংলার আবির্ভাব হলে তা পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিতকর রাষ্ট্র হবে বলে মত প্রকাশ করেন।[৩৬] পূর্ববাংলার জনঘনত্ব, ভূমি ও জনসংখ্যার অনুপাত, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে তুলে ধরেন। কিন্তু মজার বিষয় হলো জনঘনত্ব এবং পূর্ববাংলার প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বলা হলেও ২৪ বছরের ইতিহাসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কানাকড়িও পূর্ববাংলার উন্নয়নে ব্যয় করা হয়নি, এমনকি পূর্ববাংলার জন্য কখনো বিশেষ বরাদ্ধের ব্যবস্থাও করা হয়নি। উল্টো পূর্ববাংলার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের একজন প্রবাসী ভূগোলবিদের চিন্তা এরকম একদেশদর্শী হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তিনি যখন গ্রন্থটি রচনা করেন তখনও পূর্ববাংলায় প্রাকৃতিক সম্পদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আবিস্কার হয়নি। তার বক্তব্যের অনেক পরে অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে তিতাস গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়। এ ছাড়াও আলী তাইয়েব পূর্ববাংলার ভূমির উর্বরতা এবং নতুন নতুন চর জেগে ওঠার মাধ্যমে এদেশের আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নেননি। অথচ বাস্তবতা হলো পূর্ববাংলার বুক চিরে সাগরের পথে বয়ে চলা শত শত নদী প্রচুর পরিমাণ পলি জমা করে নতুন ভূমি সৃষ্টি করে চলেছে অব্যাহতভাবে।[৩৭] নবসৃষ্ট এই ভূমির উর্বরতা এটিকে উচ্চ ফলনশীল কৃষি অঞ্চলে পরিণত করেছে। রিচার্ড এম ইটন পূর্ববাংলার ভাটি অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং কৃষির উচ্চ ফলনশীলতা একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মত দিয়েছেন[৩৮] নীহাররঞ্জন রায়ও মনে করেন, বাংলার নদনদী বাংলার ইতিহাস রচনা করেছে। তাঁর মতে,"এইসব নদনদী উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গের ব-দ্বীপের নিম্নভূমি গড়িয়াছে, এখনও সমানে গড়িতেছে।... পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ছাড়া বঙ্গের প্রায় সবটাই ভূতত্ত্বের দিক হইতে নবসৃষ্ট"।[৩৯] পৃথিবীর অনেক দেশের জন্য নতুন নতুন ভূ-ভাগ গঠনের বিষয়টি কল্পণাতীত। অতিসম্প্রতি প্রখ্যাত ভূগোলবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম তাঁর একটি গবেষণায় স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সৃষ্টির যৌক্তিকতা ও এই দেশটির অস্তিত্ব

টিকে থাকার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বাস্তবতা বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।[৪০] পূর্ববাংলার আপেক্ষিক অবস্থান, দেশটির আকার-আয়তন, ভূ-গাঠনিক ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু ও আবহাওয়াগত দিক, জনসংখ্যা ও এর গুণগত পরিচয়, অর্থনৈতিক সম্পদ, মানবসৃষ্ট, বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে পূর্ববাংলা যে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল তথা ভৌগোলিক বাস্তবতা একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

ভৌগোলিক কারণেই এখানে অধিবাসীদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটেছে। আধুনিক শিল্পের বিকাশের আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগে এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই ছিল কৃষিজীবি। পেশাগত পরিচয়, কৃষিক্ষেত্র, নদীভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, হাটবাজার, গ্রামগঞ্জ, আড়ং, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপাদানের সার্বজনীন উৎসস্থলে একে অপরের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যদিয়ে কালের পরিক্রমায় অধিবাসীদের মন থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা মুছে যায়। যুগ যুগ ধরে এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোক পাশাপাশি এবং পরস্পরের খুব কাছাকাছি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথা খুব একটা জানা যায় না। প্রাক-মুসলিম সমাজের প্রচলিত ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসকে বর্ণনা করতে গিয়ে 'ফোক-ইসলাম', 'পপুলার ইসলাম', 'লৌকিক বা লোকায়ত ইসলাম' 'আদর্শ ইসলাম' ইত্যাদি নতুন শব্দের অবতারণা করেছেন কোন কোন গবেষক।[৪১] এই অভিব্যক্তির মাধ্যমে তাঁরা গ্রাম-বাংলার মানুষের সহজ সরল জীবন প্রণালির সাথে ধর্মবিশ্বাসের সমন্বয়ের বিষয়টিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। বাংলার মানুষের চিন্তা চেতনায় নাথ, বাউল, অতীন্দ্রিয়বাদ এবং সহজিয়া মতবাদের প্রভাব যেমন দেখা যায় তেমনি মধ্যযুগীয় উদারনৈতিক সুফী প্রভাবও মানুষের অসাম্প্রদায়িক ধর্মীয় চেতনা নির্মাণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। গ্রামীণ জীবনে ধর্মীয় চিন্তায়, সামাজিক আচার ব্যবহারে এবং জীবনযাত্রায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে খুব কমই প্রভেদ লক্ষ করা যায়।[৪২] ধর্ম না জাতিসত্তা কোনটি আগে এ প্রশ্নে পূর্ববাংলার মানুষের মনোভাব তারা প্রথমত জাতিগতভাবে বাঙালি অতঃপর হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম বা খ্রিষ্টান। উনিশ শতকের বাংলায় বাঙালি না মুসলমান সে প্রশ্নে এক বিতর্কের সূত্রপাত হয়। বহিরাগত অভিজাত মুসলমানরা বাঙালিদের মুসলমান মনে করত না। তাদের মতে বাঙালিরা হিন্দু। বাঙালি সংস্কৃতি ও ইসলাম সাংঘর্ষিক।[৪৩] পরবর্তীকালে এধরনের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলার মুসলমানদেরকে আরবি-ফারসি বা উর্দু সংস্কৃতিকীকরণ প্রক্রিয়া সফল হয়নি। বাঙালির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ধর্ম ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ হলেও জাতীয় জীবনে ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার স্থান সবার উপরে। একটি দেশের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে ভৌগোলিক পরিচয়, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ইত্যাদি উপাদান ভূমিকা রাখতে পারে। পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে ভাষা এবং সংস্কৃতিই এর জাতীয়তাবোধের মূল উপাদান। বাঙালি চরিত্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং এখানকার মানুষের ভাষা সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণেই পাকিস্তান কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া ধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদের প্রচেষ্টা এখানে ব্যর্থ হয়। সাংস্কৃতিক পরিচয় কিভাবে ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে গভীরতর হয়

তার উদাহরণ আরব-পারস্য সম্পর্কের মধ্যে নিহিত। পারসিকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও আরবীয়দের ওপর পারস্য সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার একই ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আরবীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠা অসম্ভব। ১৯৬১ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহমুদ হোসাইন পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ বিষয়ক এক সেমিনারে বলেন,

> After all there must be some explanation of the fact that in spite of the great cementing force of Islam, the world of Islam could no, except in the earliest times, be united into a single state during these so many centuries[৪৪]

পূর্ববাংলার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। ভারতবর্ষে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির প্রবক্তাগণ পাকিস্তানের দুই অংশের ভৌগোলিক বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আরব-পারস্য বা মুসলিম বিশ্বের কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠেনি তেমনিভাবে পূর্ববাংলা-পশ্চিম এ ধরনের জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ভুল ছিল। পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে হিন্দ-মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রে বাঙালিত্বের পরিচয়টাই ছিল মূখ্য। এ প্রসঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একটি উক্তি এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন,

> বাঙালি হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক বাঙালি বাঙালি। বাঙালির একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালির একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙালি সৃষ্টি স্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি, লীলাধারের রূপ বৈচিত্রের মধ্যে বাঙালি একটি বিশিষ্টরূপ অনন্তরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙলা সেই রূপের মূর্তি। আমার বাঙলা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইলেন।[৪৫]

উপর্যুক্ত বক্তব্যে বাঙালির ঐক্যসূত্রের একটি ইঙ্গিত আছে। বাঙলির ধর্মীয় পরিচয় যাই হোক না কেন, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, সংস্কার, কুসংস্কার, গ্রামীণ বিনোদন ব্যবস্থা, ক্রীড়া-কৌতুক,সাহিত্য-সংস্কৃতি, কৃষ্টি, জীবনদর্শন, ভাব-ভাবনা প্রভৃতি মৌলিক মানবিক জীবনাচরণ একই সূত্রে গাঁথা। একই নদীর জলে সূচি হয়ে হিন্দু যায় মন্দিরে, মুসলিম যায় মসজিদে, বৌদ্ধ বিহারে। এসব ক্ষেত্রে ভৌগোলিক প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। দেশবন্ধুর বক্তব্য বাঙালির শাশ্বত চরিত্রের মূর্ত রূপায়ন। বাঙালি তাঁর নিজস্ব সত্তা এবং জাতীয় চেতনা নিয়ে সর্বদা অন্যের প্রভাব মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ১৯০৫ সালের বাংলা ভাগকে একান্নবর্তী পরিবারের ভাগাভাগির মত বিষাদময় ঠেকেছে অনেকের কাছে। সে কারণে ভৌগোলিক অঙ্গহানির পাশাপাশি এটিকে বাঙালিত্বের অঙ্গহানি মনে করেছেন অনেকে। মৌলভী লিয়াকত গজনভী, মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, ইউসুফ আলী খান বাহাদুরসহ অনেক মুসলিম নেতাও বাংলা ভাগের বিরোধিতা করেছিলেন। বিশ্ব কবি

রবীন্দ্রনাধ ঠাকুর বলেছিলেন আইনের দ্বারা বাংলাকে ভাগ করা গেলেও বিধাতা বাংলাকে ভাগ করতে পারেন না। তিনি বলেছেন ভাই কখনো ভাগ হতে পারে না। তিনি এর প্রতিবাদে গঙ্গামুখে পদযাত্রা করেছিলেন যার স্রোতধারায় বাংলা অববাহিকা গড়ে ওঠেছিল এবং যার দুগ্ধবত স্রোতধারা অধিবাসীদের মাতৃরূপে লালন করে চলেছে। তিনি রচনা করেন 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল গানটি।[৪৬] রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাংলার নদী বাংলার ভূ-প্রকুতির ছবি চিত্রিত হয়েছে, এর নদী মূলত পূর্ববাংলাকে সৃষ্টি করেছে এবং অধিবাসীদের রসদ যুগিয়েছে, লালন পালন করেছে। একই উৎস হতে প্রাপ্ত খাবার, জল, এবং বায়ু জীবনদায়ী ভূমিক পালন করেছে এবং বাঙালিকে একে অপরের আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধেছে রেখে যুগ থেকে যুগান্তরে। কবির এই বাণী শুধুই কি কবিত্বের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিল? দ্বিতীয়বার বাংলা ভাগ করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত করা হলেও সেটা বেশি দিন টেকেনি, এর প্রাথমিক কারণ ভৌগোলিক। একই কারণে পূর্ববাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হয়েও তা একটি জাতি রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারেনি। পূর্ববাংলার ভৌগোলিক অবস্থানের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ ছিল শুধু আইনগতভাবে, ভৌগোলিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এর দুটি অংশ ততটাই আলাদা ছিল। জাতিতাত্ত্বিক একাত্মবোধ কিভাবে মানুষকে আলোড়িত করতে পারে সেটি অনুধাবনের জন্য ১৮৭৪ সালে বাংলার সিলেট জেলাকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার ঘটনাটি স্মরণ করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকভাবে সিলেট বাংলার অংশ ছিল। সিলেটকে আসামের সাথে যুক্ত করায় 'সিলোটি'রা বিপন্ন বোধ করেছিল। কারণ তারা সব সময় নিজেদের বাংলার অংশ বলে মনে করত। ১৯৪৭ সালে সিলেটের গণভোটে অংশগ্রহণকারী জনাব নুরুল ইসলাম বলেন, 'যদিও আমরা আসামে ছিলাম কিন্তু তারপরেও কখনো আমরা নিজেদের আসামি জনগোষ্ঠী বলতে পারতাম না। আসামি জনগোষ্ঠী আমাদের বলতো সিলেটিরা হচ্ছে বাঙালি। আর এদিকে বাঙালিরাও আমাদের ডাকত আসামি বলে'। অবশেষে ১৯৪৭ সালের গণভোটে সিলেট পূর্ববাংলার সাথে ফিরে আসার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়ে।[৪৭] সিলেটের এ ঘটনা থেকেও বোঝা যায় জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষিক পরিচয়ই মানুষকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করে। আমেরিকান কূটনীতিক আর্চার কে ব্লাড দুই দফায় ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকায় অবস্থান কালে পূর্ববাংলার জনজীবণ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি মনে করেন, পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্থান যেমন ভৌগোলিকভাবে আলাদা তেমনি জাতিতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিকভাবেও তারা আলাদা।[৪৮] এই কূটনীতিক আরও মনে করেন, ভৌগোলিক নৈকট্য এবং সাদৃশ্যের কারণে পূর্ববাংলার মানুষ ভারত বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গকে বেশি আপন মনে করে। একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দুই বাংলার মানুষ হাজার বছরব্যাপী অভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক সাথে থেকেছে। কাজেই শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক দুটি অঞ্চলের মধ্যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা গেলেও পূর্ব এবং পশ্চিমের জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে একটি জাতি গঠিত হয়নি। এধরনের ভৌগোলিক কাঠামো বিশিষ্ট রাষ্ট্র পূর্ববাংলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

একই কারণে পশ্চিম পাকিস্থানের অধিবাসীরাও বাঙালিদের কখনো আপন করে নিতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা সংস্কৃতি অনেকটা মধ্যপ্রাচ্যের অনুরূপ। সে কারণে পশ্চিম পাকিস্তান নিজেকে মধ্যপ্রাচ্যের অংশ মনে করে। অন্যদিকে পাকিস্তানের অংশ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববাংলার রয়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের প্রতি সহজাত আকর্ষণ।[৪৯] এমনকি দূরত্বের বিচারে ভারত এবং মিয়ানমারের পরে এর নিকট প্রতিবেশি দেশ নেপাল এবং ভূটান। আর পুরো পূর্ববাংলাকে বেষ্টন করে আছে ভারত ও মিয়ানমারের অবস্থান। পূর্ববাংলা দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংযোগ স্থলে অবস্থিত। এর উত্তর-পূর্বাংশ পর্বতশ্রেণী দ্বারা বাঁধা প্রাপ্ত এবং দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান। ফলে পশ্চিম দিক থেকে আগত আক্রমণকারী অথবা অভিবাসীদের অগ্রযাত্রা এখানে এসে থেমে যায় অথবা বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। এই কারণে রিচার্ড এম ইটন এটাকে 'ফ্রন্টিয়ার জোন' এবং 'ট্রানজিশান জোন' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৫০] পূর্ববাংলার এ ধরনের অবস্থান দেশটিকে এশিয়ার বিভিন্ন অংশের প্রবেশ দ্বার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অনেকে এটিকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে কৌশলগত ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৫১]

পক্ষান্তরে, পূর্ববাংলার সাথে তো বটেই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর মধ্যে নানা ধরনের ভিন্নতা বিদ্যমান ছিল। ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে সকল প্রদেশের মানুষের জীবনধারার দৃশ্যমান ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভাষা এবং সংস্কৃতির পার্থক্য তো ছিলই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাও দু'অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। স্থল পথে পূর্ববাংলার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব বার'শ মাইল। সমুদ্র পথেও এর দূরত্ব তিনগুন বেশি অর্থাৎ তিন হাজার মাইল।[৫২] আকাশ পথেও তৃতীয় কোন দেশের আকাশসীমা পাড়ি দিতে হত। অর্থাৎ পাকিস্তানের দুই অংশের সাথে সরাসরি যোগাযোগের কোন পথই ছিল না। আঞ্চলিকতার কারণে পূর্ববাংলা উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার হয়। পাকিস্তানের গণ পরিষদে বিভিন্ন সময় বৈষম্যের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালের ২৩ আগস্ট গণ পরিষদ সদস্য আবুল মনসুর আহমদ বৈষম্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রশ্ন রাখেন, 'ভৌগোলিক কারণে যদি কেন্দ্র এ অঞ্চলের প্রতি নজর দিতে না পারে তবে এ অঞ্চলের স্বাধিকার দাবি মেনে নিতে বাঁধা কিসের'?[৫৩] এভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকে ভৌগোলিক বাস্তবতার কারণেই পূর্ববাংলার অধিবাসীদের মনোভাব বদলাতে থাকে। পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্যের ধারণাগুলি পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববাংলার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হলো এর বর্ধনশীল চরিত্র। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনাসহ অসংখ্য নদ নদীর বহমান স্রোতধারায় যুগ যুগ ধরে পলি সঞ্চিত হয়ে এর ভূ-ভাগ গঠিত। অপেক্ষাকৃত নবীন কিন্তু এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ। পূর্ববাংলার আয়তন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমবর্ধমান।

এর উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবহমান অসংখ্য নদ নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হওয়ার পথে প্রচুর পলিমাটি জমা করে অব্যাহতভাবে নতুন ভূ-ভাগ গঠন করে চলেছে। পলি জমা হয়ে গঠিত হয় বলে এদেশের ভূ-ভাগ অত্যন্ত উর্বর। বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে এর উর্বরতা প্রতিবছর প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে নবরূপ লাভ করে। ভূমির উর্বরতা, জলের সহজ জোগান এবং ক্রান্তীয় জলবায়ুর প্রভাবে এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিজীবি এবং অলস প্রকৃতির। নদীই এখানকার জনজীবনকে সচল রেখেছে। ভূমির উর্বরতা এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপাদানের সহজলভ্যতার কারণে যুগ যুগ ধরে বিভন্ন জনগোষ্ঠী পূর্ববাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছে। এখানকার মাটি, বায়ু, পানি ও পরিবেশ অকাতরে সকলকে ধারণ করেছে, খাদ্য ও বাসস্থান যুগিয়েছে এবং বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নৃগোষ্ঠীর মানুষকে একই সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এই গ্রহণ ও সমন্বয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলায় একটি বহুত্ববাদী সমাজ (Pluralistic society) বিকাশ লাভ করেছে, যে সমাজ সর্বদা মানবিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর দাঁড়িয়ে মানবতার জয় গান গেয়েছে।

পূর্ববাংলার মতো ছয়টি আলাদা ঋতুতে বিভক্ত দেশ পৃথিবীতে আর কোথাও হয়তো নেই। ঋতু বৈচিত্র্যের মতই জনজীবনের উৎসব পালা পার্বণের বৈচিত্র্যময়তা পূর্ববাংলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। এখানে মানুষের মন প্রকৃতির মতই উদার এবং বৈচিত্র্যময়। মানুষের মন বর্ষার কাদামাটির মত কখনো নমনীয়, কখনো চৈত্রের শুষ্ক মাটির মতই দৃঢ়তা লাভ করে। প্রকৃতির প্রভাবে এখানকার মানুষ সহজ, সরল, শান্ত ও বিনয়ী কিন্তু প্রয়োজনে হয়ে ওঠে চরম প্রতিবাদী। সমতল ভূমির সমতার মনোভাব নিয়ে এখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হয়। পূর্ববাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ভৌগোলিক উপাদান এবং জলবায়ুর গভীর প্রভাব বিদ্যমান। এখানে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, বাউল, কবিগান, গাঁথা, কবিতা প্রভৃতি মানবতাবাদী সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড জনজীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। এসকল গান ও কবিতার উপজীব্য হলো এখানকার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপাদান। যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও মনিষীদের জন্ম হয়েছে পূর্ববাংলায়, যাঁদের মানবতাবাদী জীবনদর্শন মানুষকে করেছে উদারনৈতিক চেতনার অধিকারী অপরদিকে তাঁদের লেখনী বাংলা ভাষাকে করেছে সমৃদ্ধ। এছাড়া নাথ, বাউল, সহজিয়া, সুফি প্রভৃতি মতবাদ ও দর্শন এখানকার মানুষকে করেছে অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। পূর্ববাংলার অধিবাসীদের ভাষা, দেশ, জাতি (বাঙলা, বাঙলাদেশ, বাঙালি) একই শব্দ থেকে উদ্ভূত। বাঙালির রয়েছে গৌরবময় অতীত, উন্নততর কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আবহমান কাল ধরে সকল মত পথ দর্শনের মানুষের অবদানের মাধ্যমে পূর্ববাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি সভ্যতা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই উন্নত সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্ম, ও বর্ণের সমন্বয়ে এখানে গড়ে ওঠে

বাঙালির সার্বজনীন আত্মপরিচয় যা থেকে কালের ব্যবধানে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটে। এই জাতিসত্তা থেকেই বিকাশ ঘটে বাঙলি জাতীয়তাবাদের।

অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের পার্বত্য, কঙ্করময় উষর ভূমির রুক্ষতার মতই অধিবাসীরা উগ্রপন্থী ও পরমতের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাবের অধিকারী। তাদের খাদ্যাভ্যাস, রুচি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আবেগ অনুভূতি সবকিছু বাঙালিদের থেকে আলাদা। উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের পশতু ভাষার অধিকারী অধিবাসীগণ আফগানিস্তানের অধিবাসীদের অনুরূপ। পাঞ্জাবের অধিবাসীরা মার্শাল জাতি বলে নিজেদের পরিচয় দেয় যা তাদের দাম্ভিকতার বহিঃপ্রকাশ। বেলুচিস্তানের অধিবাসীদের ভাষা বেলুচ। দেখা যায় পূর্ববাংলা ও পাকিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক পার্থক্যের কারণে জনজীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পার্থক্য সৃষ্টি হয়। বলা হয়ে থাকে, একজন পাকিস্তানি যখন যমুনা নদী পাড়ি দিয়ে গঙ্গা অববাহিকা দিয়ে পূর্বদিকে যাত্রা করে তখনই সে বুঝতে পারে সে তার মাতৃভূমি ছেড়ে এসেছে, এবং সে ভিনদেশে একজন আগন্তুক মাত্র। এই বক্তব্যই পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগোলিক কারণে জনমানসের পার্থক্যের মাত্রা নির্দেশক।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ভূগোলের উত্থান হয়েছে যা বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত। ভৌগোলিক প্রভাব এবং ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত কারণে যুগ যুগ ধরে এখানকার অধিবাসীগণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের চেতনা হৃদয়ে লালন করে এসেছে। প্রাচীন বাংলার অন্যান্য জনপদের মত আমাদের আলোচনাধীন অঞ্চলটি বেশিরভাগ সময়ই একধরনের স্বায়ত্ব-শাসন ভোগ করেছে। 'গঙ্গাঋদ্ধি' চার পাঁচশো বছরের বেশি স্বাধীন ছিল। মুসলিম শাসনামলের পুরো সময় জুড়ে অঞ্চলটি হয় স্বাধীন না হয় আধা স্বাধীন থেকেছে। ১৯০৫ সালেও এটি আলাদা প্রদেশের মর্যাদা লাভ করেছিল। এখানেও বাঙালি জাতিসত্তার চেতনার আন্দোলনে ১৯১১ সালে সেটি রহিত হয়। সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক কারণে ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চল এবং আসামের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হলেও অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিসত্তার ধাক্কায় সেটি বেশি দিন টেকেনি। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময় বাংলা অবিভক্ত থাকলে এর ইতিহাস হয়তো ভিন্নভাবে লিখিত হতো। কতকগুলি ভিন্ন ভাষার অধিকারী বিভিন্ন জাতি, এবং আলাদা সংস্কৃতির ধারক নানা জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি ভৌগোলিক অঞ্চল নিয়ে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্তার অধিকারী পূর্ববাংলার অধিবাসীরা মেনে নেয়নি। এ ধরনের রাষ্ট্রের ধারণা ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোতেই কেবল সম্ভব। সুতরাং অনিবার্য বাস্তবতার কারণেই ১৯৭১ সালে এ অঞ্চলের মানুষ মহান মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব, তুলনামূলক ভৌগোলিক অবস্থান এবং কৌশলগত

ভূ-রাজনৈতিক কারণে পূর্ববাংলায় অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশ তথা সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ অনিবার্য ছিল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গাঋদ্দি থেকে বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৬-১৭

২ ড. মুস্তফা নুরউল ইসলাম, "বাংলাদেশ, বাঙালি-ইতিবৃত্তের সন্ধানে" *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতামালা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৬, পৃ. ২১৩-২১৪

৩ মিনহাজ-ই-সিরাজ ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লী সালতানাতে প্রধান কাজীর দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ইতিহাসবিদও ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ তবকাত-ই-নাসিরী তেইশ খণ্ডে রচিত। এর মধ্যে চার খণ্ডে ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থে ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এ সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন নাসিরউদ্দিন মাহমুদ। মিনহাজ-ই-সিরাজ যেখানে শেষ করেন জিয়াউদ্দিন বারানী সেখান থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেন।

৪ জিয়াউদ্দিন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* (অনুবাদ, গোলাম সামদানী কোরায়শী), দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭৬

৫ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪

৬ ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫

৭ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫

৮ ড. মুস্তফা নুরউল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৪

৯ Nazrul Islam, (ed.), *National Atlas of Banglades, Asiatic Society of Bangladesh*, 2018, P.8

১০ *ঐ*, পৃ. ৯

১১ *Census of Pakistan*, 1951, Vol.3 East Bengal, Report and Table, P. 1

১২ Iftekhar Iqbal, *The Bengal Delta: Ecology, State and Social Change, 1840-1943*, England, palgrave macmillan, 2011, P.1

১৩ There are five distinct major geographical regions in`Bengal'- the deltic plain, the Tippera surface and the Sylhet basin, all of which are made up of recent alluvial deposit; and the Madhupur and the Verendra upland composed of ancient Pleistocene alluvium. See, B. M morison, *Political Centers and Cultural Regions in Early Bengal*, Tucson: University of Arizona Press, 1970, Reprint Rawat Oublications, Delhi, 1994

১৪ ভৌগোলিক গুরুত্বের বিবেচনায় মোগলরা ১৬১০ সালে ঢাকায় প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করে। কিন্তু তৎকালীন সুবাবাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খান এবং সুবাদহদার আজিমউস্সানের বিরোধকে কেন্দ্র করে ১৭০৭ সালে প্রথমে দিওয়ানী এবং পরবর্তীকালে ১৭১৭ সালে রাজধানী ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে স্থানান্তর করা হয়। মোগল আমলে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলে ঢাকায় পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী স্থাপন এ অঞ্চলের ভৌগোলিক গুরুত্ব নির্দেশ।

১৫ Br.Stallo A. M. *General principles of the philosophy of nature*, W.B Crosby, Boston, H.P nichols, Washington, 1848, p. 518

১৬ জিয়াউদ্দিন বরানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬

১৭ Fazal, A. Allami, (translated by Beveridge), *Akbar Nama*, Vol.III, Delhi, Low price Publication, Reprint 1989, P. 427

১৮ ড. আবদুল করিম, "বার-ভুঞা পরিচিতি", *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতামালা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৬, পৃ. পৃ. ১৭-৪৭

১৯ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, ১৫৮

২০ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলার ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, জেনারেল, কলকাতা, ১৯৯৮,পৃ. ২৮

২১ Ibn Batuta (Trnslated by Mahdi Husain), *The Rehla of Ibn Batuta (India, Maldives and Ceylon)*, Orient Institute of Baroda, 1953, P. 234-245

২২ Francois Barnier, Translated by Archibald Constable), *Travel in Mogul Empire AD 1656-1668*, Delhi, Low Price Publication, 1934, P.437, 442

২৩ P. C Choudhury, *The History of Civilization of the People of Assam*, Department of historical and Antiquarian Studies in Assan, Guahati, 1959, P. 50

২৪ Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bebgladesh, Dhaka, 2009, P.58

২৫ ননী গোপাল চৌধুরী, *বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত*, (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী-খ্রিষ্টীয়সপ্তদশ শতাব্দী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪, পৃ.৩৭

২৬ বিস্তারিত দেখার জন্য: ওয়াকিল আহমদ, *মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, নওরোজ কিতাব বিতান, ঢাকা, ১৯৬৮, সুখোময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস*, ১২০৪-১৫৭৬, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৫, পৃ. ৬০৮-৬২০

২৭ James J. Novak, *Bangladesh: Reflection on the water*, Dhaka, The University Press Ltd, 2008, P.22

২৮ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, আষাঢ় ১৪১১, পৃ. ১০৫

২৯ E.L. Hamza, *Pakistan: A Nation*, Lahore, Kashmiri Bazar, 1944, p.33

৩০ Maulana Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, Oriental Longmans, Calcutta, 1959,P. 207

৩১ Marta R. Nicholas, Philip Oldenburg,(ed.). *Bangladesh: the birth of a nation*, Madras, India, M. Seshachalam & co, 1972, p. 10

৩২ E.L. Hamza,*Op.cit*, p. 32-33

৩৩ অ্যান্থনী মাসকারেনহাস, *দ্যা রেপ অব বাংলাদেশ*, (বাংলা অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, ঢাকা, পপুলার পাবলিসার্স, ২০১৪, পৃ. ১৮

৩৪ *ঐ*, পৃ. ১৭

৩৫ Kabir U Ahmad, *Breakup of Pakistan: Background and prospects of Babgladesh*, London, The Social Science Publishers, 1972,P. 53

৩৬ ALi Tayyeb,*Pakistan : A Political Geography*, London, Oxford University Press, 1966, পৃ. ১৮৫-১৮৬

৩৭ Haroun Er Rashid, *Geography of Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka, 1991,P.18, Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and The Bengal Frontier, 1204-1760*, Delhi, Oxford University Press, 1994, p. 194

৩৮ Richard M. Eaton, Ibid, p. 198

৩৯ নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২

৪০ নজরুল ইসলাম, "*ভৌগোলিক বাস্তবতায় বাংলাদেশ*", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রয়োত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জুন, ২০১৫, পৃ. ১-১৯

৪১ Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims.1871-1906, A Quest for Identity*, Delhi, 1981,Details: Chapters III,& IV P.106 and 108

৪২ A. R Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal*, Dhaka, 1977, p, 3-10

৪৩ Rafiuddin Ahmed, *op,cit*. P. 109-112

৪৪ *The Morning News*, November. 6, 1961, Dacca, cited in-D. R. Mankekar, *Pak Colonialism in East Bengal*, Somaiya Publications Pvt. Ltd. Bombay, P. 158

৪৫ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, "*বাঙালার কথা*", *দেশবন্ধু রচনা সমগ্র ১৯২০*, দেখুন- রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পা.) *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮, পৃ. ১১

৪৬ Nitish Sengupta, *Land of Two Rivers,* New Delhi, Penguin Books, 2011, p. 296

৪৭ আসফাক হোসেন, "*১৮৭৪-১৯৪৭ কালপর্বে বাংলা-আসামের সীমান্তে অদলবদল এবং সিলেটের গণভোটের ইতিহাস*", *প্রতিচিন্তা*, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৮৪,৮৯,৯২,৯৩, ১১৪

৪৮ Archer K Blood, *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat*, Dhaka, The University Press limited, 2002, P. 2

৪৯ অ্যান্থনী মাসকারেনহাস,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

৫০ Richard M. Eaton,*Op.cit*,p.p.xxii-xxv

৫১ Maneck B. Pithalla D. Sc., F.G.s. *op. cit*. P. 24

৫২ *Ibid*. P. 9

৫৩ মো: হাবিবুল্লাহ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯): পার্লামেন্টের ভাষ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪১৯

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ববাংলায় পেশাভিত্তিক সমাজ কাঠামো

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ববাংলায় পেশাভিত্তিক সমাজ কাঠামো

পূর্ববাংলার সমাজ কাঠামো ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রথাগত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এর পরিবর্তনের গতি ছিল খুবই মন্থর। মানুষের দৈনন্দিন জীবন ছিল একটি ছকে বাঁধা। তবে আলোচ্য সময়ে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের শ্রেণিচরিত্রের পরিবর্তনের গতি ছিল লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে, দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তনের সূচনা করে তার প্রভাব পূর্ববাংলার সমাজ ব্যবস্থায়ও পড়েছিল। এসময়ে মধ্যযুগীয় সমাজকাঠামো ভেঙে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় সেই সাথে সৃজন হয় নতুন নতুন শ্রেণি ও পেশার। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাবে চিরাচরিত স্বয়ংসম্পন্ন গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থার স্থলে আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থা বিকশিত হয়। সনাতন গ্রামীণ অর্থনীতির স্থলে বাজার ভিত্তিক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কাজেই ঔপনিবেশিক শাসন পরবর্তী পাকিস্তানী শাসন কাঠামোয় পূর্ববাংলার সমাজকাঠামো মধ্যযুগীয় গদবাঁধা অবস্থা থেকে কিছুটা ভিন্নতর অবয়ব লাভ করে। এসময়ে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত শ্রেণি কাঠামোর স্থলে পেশাভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির জন্ম হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের পেশা, সামাজিক প্রভাব, অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং মর্যাদার ভিত্তিতে বিন্যস্ত করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসব সামাজিক শক্তির ভূমিকা নির্ণয় করা হয়েছে।

পূর্ববাংলার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় এ কে নাজমুল করিমের গবেষণা থেকে। তিনি তাঁর *Changing Society in India and Pakistan and Bangladesh* গ্রন্থে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে ভারত ও পাকিস্তানের (পূর্ববাংলার) সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক পরিবর্তনের একটি তাত্ত্বিক সমীক্ষা প্রদান করা হয়েছে। পূর্ববাংলা এখানে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। তিনি তাঁর গবেষণায় প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের সামাজিক স্তরের বৈশিষ্ট্য, পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ববাংলার মুসলিমদের সামাজিক শ্রেণি এবং বিশেষ

করে পূর্ববাংলার একটি গ্রামের সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রম গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।[১] একটি গ্রামের সমীক্ষার মাধ্যমে সমগ্র পূর্ববাংলার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো খুব একটা যৌক্তিক না হলেও তাঁর এ গবেষণা থেকে পুর্ববাংলার গ্রামীণ জীবনের একটি চিত্র পাওয়া যায় বটে। এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জীবনের তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের জন্য অধ্যাপক করিমের গ্রন্থ প্রাথমিক সূত্র হতে পারে। কেননা একরূপী ভৌগোলিক অঞ্চল হওয়ায় পূর্ববাংলার মানুষের জীবনধারা মোটামুটি একই ধরনের ছকে বাঁধা ছিল। পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থায় স্থান ভেদে পার্থক্য খুব একটা লক্ষ করা যায় না। উল্লেখ্য যে, ভারত বর্ষের জনজীবনের ইতিহাস রচনায় প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন কে এম আশরাফ। তিনি তাঁর *Life and Conditions of the People of Hindustan* গ্রন্থে মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজের যে চিত্র উপস্থাপন করেছেন তাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীন জীবন ব্যবস্থার ঈঙ্গিত মেলে। তাঁর গ্রন্থে স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত প্রদান করা সম্ভব ছিল না কেননা, তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা শুমারি চালু হয়নি। ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি করা হয়। আলোচ্য কালসীমায় পাকিস্তান শাসনামলে দুটি আদম শুমারি করা হয়। ১৯৫১ সালে প্রথম এবং ১৯৬১ সালে দ্বিতীয় আদম শুমারি করা হয়। আমরা এদুটি শুমারি থেকে জনসংখ্যার বিভাজন সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করেছি।

১৯৪৭ সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ববাংলার মোট আয়তন ৫৪,৫০১ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৪ কোটি ২১ লক্ষ যা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ।[২] ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ছিল ৯,৩৮,৩১,৯৮২ জন। পূর্ববাংলার মোট জনসংখ্যা ৫,০৮,৫৩,৭২১ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ৪, ২৯,৭৮,২৬১ জন। মোট জনসংখার ৫৪.২ শতাংশ পূর্বপাকিস্তানে এবং ৪৫.৮ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে বাস করতো। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানের মোট আয়তনের ৮৪.৯ শতাংশ এবং পূর্ববাংলার আয়তন মোট আয়তনের মাত্র ১৫.১ শতাংশ।[৩] এ তথ্যানুসারে পাকিস্তানের মোট আয়তনের মাত্র ১৫.১ শতাংশ অঞ্চলে ৫৬ শতাংশ মানুষ বাস করেন এবং ৮৪.৯ শতাংশ অঞ্চলে ৪৫.৮ শতাংশ মানুষ বাস করেন। তবে পূর্ববাংলা আয়তনে ছোট হলেও অধিকাংশ ভূমি উৎপাদনক্ষম। ভূমির উর্বরতা পূর্ববাংলাকে পৃথিবীর অন্যতম কৃষি উৎপাদন অঞ্চলে পরিণত করেছে। জনসংখ্যার অধিকাংশই কোন না কোনভাবে কৃষি কাজের সাথে যুক্ত।

সারণি-৩.১ : ১৯০১-১৯৫১ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাত

সন	পূর্ববাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯০১	৬৩.৬ %	৩৬.৪ %
১৯১১	৬১.৯ %	৩৮.১ %
১৯২১	৬১.২ %	৩৮.৮ %
১৯৩১	৬০.২ %	৩৯.৮ %
১৯৪১	৫৯.৮ %	৪০.২ %
১৯৫১	৫৫.৫ %	৪৪.৫ %

সূত্রঃ পাকিস্তান আদমশুমারি ১৯৫১, খণ্ড-২৬, পৃ. ২৭

উপরের সারণিতে ১৯০১ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাত দেখানো হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, ১৯০১ সালে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ববাংলায় জনসংখ্যার অনুপাত যথাক্রমে ৬৩.৬ ও ৩৬.৪ শতাংশ। কিন্তু পাকিস্তান আমলের প্রথম আদমশুমারিতে এই অনুপাত হয় যথাক্রমে ৫৫.৫ ও ৪৪.৫ শতাংশ।[৪] পূর্ববাংলা আয়তনে ছোট হলেও জনসংখ্যার অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করে। ১৯৫১ সালে পূর্ববাংলার জনসংখার ঘনত্ব ৭৭৭ জন কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক কম। তৎকালীন সময়ে পূর্ববাংলা ছিল পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল এবং দারিদ্র পিড়িত অঞ্চল।[৫]

সারণি-৩.২ : পাকিস্তানের প্রদেশ সমূহের মধ্যে জনসংখ্যার ঘনত্বের তুলনামলক চিত্র

প্রদেশ/রাজ্য	এরিয়া (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা (১০০০)			
		সর্বমোট	পুরুষ	মহিলা	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা
পাকিস্তান	৩,৬৪,৭৩৭	৭৫,৮৪২	৪০,২০৯	৩৫,৬৩৩	২০৮
বেলুচিস্তান স্টেট ইউনিয়ন	১,৩৪,০০২	১,১৭৪	৬৪৪	৫৩০	৮.৮
পূর্ববাংলা	৫৪,৫০১	৪২,০৬৩	২২,০৩৯	২০,০২৪	৭৭৭
ফেডারেল রাজধানী এলাকা	৮১২	১,১২৬	৬৪৬	৪৮০	১,৩৮৭
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩৯,২৫৯	৫,৯০০	৩,১১৩	২,৭৮৭	১৫০
পাঞ্জাব ও ভাওয়ালপুর স্টেট	৭৯,৭১৬	২০,৬৫১	১১,০৫৮	৯,৫৯৩	২৫৯
সিন্ধু ও খায়েরপুর স্টেট	৫৬,৪৪৭	৪,৯২৮	২,৭০৯	২,২১৯	৮৭

সূত্রঃ পাকিস্তান আদম শুমারি ১৯৫১, বুলেটিন-১, পৃ.১

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ফেডারেল রাজধানী করাচি ব্যতিরেকে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন প্রদেশেই পূর্ববাংলার মত জনবহুল নয়। পার্বত্যজেলা ব্যতিরেকে পূর্ববাংলার প্রায় সকল এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্বে ব্যাপক তারতম্য ছিল না। ১৯৫১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গমাইলে ১০৯ জন।[৬] পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে জনসংখ্যার ঘনত্বেও পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। পূর্ববাংলায় জনসংখ্যা বেশী থাকলেও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বরাদ্দের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী উন্নয়ন বাজেটে জনসংখ্যার অনুপাত বিবেচনায় নেওয়া হতো না। পাকিস্তানের উভয় অংশে ধর্মের ভিত্তিতে জনবিন্যাসেও পার্থক্য ছিল।

সারণি-৩.৩ : পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তুলনামূচিত্র[৭]

অঞ্চল	মুসলিম	বর্ণ হিন্দু	নিম্নবর্ণ হিন্দু	খ্রিস্টান	অন্যান্য
পাকিস্তান	৮৫.৯	০৫.৭	০৭.২	০০.৭	০০.৫
পশ্চিম পাকিস্তান	৯৭.১	০০.৫	০১.১	০১.৩	...
পূর্ববাংলা	৭৬.৮	১০.০	১২.০	০০.৩	০০.৯

উপরের সারণিতে ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যার অনুপাত দেখানো হয়েছে। পূর্ববাংলা যুগ যুগ ধরে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন জাতি বর্ণের মানুষকে ধারণ করেছে। বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের আগমণ নির্গমনের ফলে পূর্ববাংলায় নানা ধর্মের মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। এখানে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখার অনুপাতের একটি তুলনামূক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্ববাংলায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাস ৭৬.৮ শতাংশ, বর্ণহিন্দু ১০ শতাংশ, নিম্নবর্ণের হিন্দু ১২ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.৩ শতাংশ এবং অন্যান্য ০.৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম জনসংখ্যা ৯৭.১ শতাংশ, বর্ণ হিন্দু ০.৫ শতাংশ, নিম্নবর্ণ হিন্দু ১.১ শতাংশ এবং খ্রিস্টান ধর্মের জনসংখ্যার বাস ১.৩ শতাংশ। উল্লেখিত পরিসংখ্যান অনুসারে ধারণা করা যায় পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলিমদের আনুপাতিক হার বেশি ছিল। তবে অন্য একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পূর্ববাংলায় ধারাবহিকভাবে মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সমপ্রদায়ের জনসংখ্যা কমে গেছে।

সারণি-৩.৪ : নারী-পুরুষ ও ধর্মের ভিত্তিতে পূর্ববাংলার জনসংখ্যার অনুপাত

সন	মোট জনসংখ্যা	জেন্ডার		ধর্ম		অন্যান্য
		পুরুষ	নারী	মুসলিম	হিন্দু	
১৯০১	১০০	৫০.৮৬	৪৯.১৪	৬১.৩৪	৩১.৪৬	৭.২০
১৯১১	১০০	৫১.১৩	৪৮.৮৭	৬১.৬৭	৩১.২৯	৭.০৪
১৯২১	১০০	৫১.৩৩	৪৮.৬৭	৬৪.৪৯	৩১.৪৮	৪.০৩
১৯৩১	১০০	৫২.২৩	৪৭.৭৭	৬৮.৩৮	২৮.৮৬	২.৭৬
১৯৪১	১০০	৫১.৮১	৪৮.১৯	৭০.০৪	২৮.০০	১.৩৬
১৯৫১	১০০	৫২.৩১	৪৭.৬৯	৭৬.৮৫	২২.০৪	১.১১
১৯৬১	১০০	৫১.৮৩	৪৮.১৭	৮০.৪৩	১৮.৪৫	১.১২

সূত্র: M. Abdur Rahim, *An appraisal of census population of East Pakistan from 1901 to 1961*, Research monograph No. 2, P. 25

উপরের সারণিতে ১৯০১ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় জেন্ডার এবং ধর্মীয় সমপ্রদায়ের ভিত্তিতে জনসংখ্যার অনুপাত দেখানো হয়েছে। এই তথ্য উপাত্তে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ববাংলায় মুসলমান সম্প্রপ্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে কমে গেছে। কিন্তু মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।[৮] এর কারণ যাই থাক, এই চিত্র থেকে পূর্ববাংলার সমাজকাঠামোর ক্রমবিবর্তনের বিষয়টি লক্ষণীয়। এটি সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। কিন্তু একজন ইতিহাস গবেষক হিসেবে আমরা এ প্রশ্ন রাখতে পারি সময়ে থেকে পূর্ববাংলার সমাজে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা বহুত্ববাদী চরিত্রের কি পরিবর্তন হতে শুরু করে? পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সামাজিক চিত্রের পাশাপাশি অন্য একটি বিতর্কও প্রচলিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীকে কৃষিজীবি, শিক্ষ-দীক্ষায় অনগ্রসর হিসেবে অভিহিত করে প্রশাসনিক ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অক্ষম বলে তাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করত। কিন্তু মজার বিষয় হলো, শিক্ষার হারের দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ববাংলা কিছুটা এগিয়েই ছিল।

সারণি-৩.৫ : পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার হার(হাজারে)

এলাকা	মোট শিক্ষিত জনসংখ্যা	শিক্ষিত জনসংখ্যার শতকরা হার
পাঞ্জাব	১৯,২৮	১০.২
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২,৫১	৭.৮
সিন্ধু	৫,০২	১০.৮
বেলুচিস্তান	৫১	৮.২
ফেডারেল রাজধানী	৩,৫১	৩১.৩

সূত্র:পাকিস্তান আদম শুমারি ১৯৫১, বুলেটিন- ১, পৃ. ১

১৯৫১ সালে পূর্ববাংলার সাক্ষরতার হার ছিল ২১.১ শতাংশ যা ১৯৬১ সালে ২১.৫ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে সাক্ষরতার হার ছিল যথাক্রমে ১৬.৪ ও ১৬.৩ শতাংশ।[৯] ১৯৬১ সালে পূর্ববাংলায় সাক্ষরতার হার সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সাক্ষরতার হার কমে যায়। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে ফেডারেল রাজধানী করাচী ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের কোন প্রদেশে শিক্ষার হার পূর্ববাংলার চেয়ে বেশি নয়। তবে ঐ সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের শিক্ষার হার মুসলিমদের চেয়ে বেশী ছিল। হিন্দুদের সাক্ষরতার হার ২৫.২৮ শতাংশ এবং মুসলিমদের সাক্ষরতার হার ১৯.৯৩ শতাংশ। উচ্চশিক্ষায় মুসলিমদের অবস্থান খুবই নগণ্য ছিল। শিক্ষক, আইনজীবী, ডা. এবং পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা প্রভৃতি উচ্চ পদে আসীন নাগরিক সমাজ মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান্য ছিল।[১০] শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে না থাকলেও তারা পূর্ববাংলা সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করত। বস্তুত জাতিগত বিদ্বেষ থেকে পূর্ববাংলাকে দাবিয়ে রাখার জন্য তারা এসব প্রচারণা চালাত।

উপরে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের জনমিতিক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। প্রদত্ত তথ্য উপাত্তের আলোকে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। তবে কোন অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে এভাবে বিন্যস্ত করা একটি জটিল প্রক্রিয়া বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন। কেননা কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির কথা উল্লেখ করলে এক একজনের মনে আলাদা আলাদা চিত্র ভেসে উঠে। কার্ল মার্কস্ সামাজিক শ্রেণি সম্পর্কে বলেছেন, Class as being a phenomenon of any society where ownership of wealth and means of production , factories or land, gave an economic

basis for stratification.[১১] কাজেই অঞ্চলভেদে সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সামর্থের ভিত্তিতে এই চিত্র ভিন্ন হতে পারে। পূর্ববাংলার বাস্তবতায় এই বিন্যাস প্রদান করা হয়েছে।

নিচে সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে অধিবাসীদের বিন্যস্ত করে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁদের ভূমিকা নির্ণয় কর হয়েছে।

৩.১ উচ্চবিত্ত/অভিজাত শ্রেণি

কোন সমাজে কারা অভিজাত বা উচ্চ শ্রেণিভুক্ত তা নির্ধারণ করার মাপকাঠি কী? এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী ম্যানহাইমের বক্তব্য সমাধান সূত্র হতে পারে। তিনি বলেছেন,

> If one call to mind the essential methods of sellecting elites, which up to the present have appeared on the historical scene. Three principles can be distinguished: selection on the basis of *blood*, *property*, and *achievement*.[১২]

রক্তসম্পর্ক, কৌলিণ্যের পাশাপাশি আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির অবদান ও ধনসম্পত্তির মানদণ্ড যুক্ত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী টম বটমোর এর মতে, 'ভূ-স্বামী, ধনপতি এবং শ্রমিকরা আধুনিক সমাজে তিনটি বৃহত্তর শ্রেণির জন্ম দেয়'।[১৩] আমরা এই তত্ত্বের আলোকে ভু-স্বামী শ্রেণি ছাড়াও ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থান করতো তাদেরকে এই শ্রেণিভুক্ত করেছি। নিচে পূর্ববাংলার উচ্চবিত্তের শ্রেণি চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

৩.১.১ জমিদার শ্রেণি

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি এবং বাংলা বিভাগের সময় সমাজের উচ্চ শ্রেণিতে অবস্থান করছিল জমিদার শ্রেণির লোকেরা। অনেকের মতে পূর্ববাংলায় উচ্চবিত্তের অস্তিত্ব ছিল না। মওদুদ আহমদসহ কেই কেই বলার চেষ্টা করেছেন যে, পূর্ববাংলায় খুব কম সংখ্যক ভূ-স্বামী ছিলেন যাঁরা উচ্চবিত্তের কোনো শক্তিশালী শ্রেণি গঠন করতে পারেনি।[১৪] একথা একেবারে সরলভাবে বলা মুশকিল যে পূর্ববাংলায় কোন উচ্চবিত্ত শ্রেণি ছিল না। উচ্চবিত্ত না থাকলে সমাজ স্তর বিন্যস্ত হয় না, যা উদারনৈতিক সমাজের পরিচায়ক। পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় সামন্ত চরিত্রের উচ্চবিত্তের অস্তিত্ব পূর্ববাংলায় হয়তো ছিল না কিন্তু পূর্ববাংলার জমিদারগণ তৎকালীন সমাজের আপেক্ষিক বিচারে উচ্চশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তনের ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় শাসকদের সহায়ক শক্তি হিসেবে এই শ্রেণির জন্ম। পরবর্তীকালে এই শ্রেণি থেকেই বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির বিকাশ লাভ করে। কোন কোন গবেষক এদেরকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে আবার কেউ কেউ 'বাঙালি সমাজের অভিজাত শ্রেণির' লোক হিসেবে এ

চিহ্নিত করেছেন।[১৫] বড় বড় জমিদার থেকে সাধারণ তালুকদার এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এক সময় পূর্ববাংলার জমিদারগণ সাংগঠনিকভাবে সংগঠিত হয়েছিলেন। ঢাকার নবাব পরিবার পূর্ববঙ্গের জমিদার শ্রেণির নেতৃত্ব প্রদান করতেন। জমিদারদের এই সংগঠন 'পূর্ববঙ্গ জমিদার সভা' নামে পরিচিত ছিল। জমিদারগণ তাদের নানা রীতিনীতি এবং কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আহসান মঞ্জিলে মিলিত হয়ে বৈঠক করতেন।[১৬] খাজা পরিবার ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা শাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহ লাভ করেন। ১৯৩৭ সালের বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে খাজা নাজিমুদ্দিনসহ এই পরিবারের ১১ জন এমএলএ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হলে ছোট ভাই খাজা শাহবুদ্দিনকে মন্ত্রী করেন।[১৭] দেশভাগের পরেও তাঁরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্ণধারদের আস্থাভাজন হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে অনেক জমিদার কলকাতায় চলে যান। ১৯৫০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদে 'পূর্ববঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০' (The East Bengal Estate Acquisition and Tenancy Act 1950) পাশের মধ্য দিয়ে জমিদার প্রথার বিলুপ্ত হয়।[১৮] তবে ১৬ মে ১৯৫১ সালে গভর্নর জেনারেলের সম্মতি পাওয়ার পর বিলটি আইনে পরিণত হয়।[১৯] আইনের দ্বারা জমিদারি প্রথা রহিত হলেও জমিদারদের প্রতিনিধিদের প্রভাব প্রতিপত্তি কিন্তু অব্যাহত থাকে। ১৯৫০ সালের ভূমি সংস্কার আইনের মাধ্যমে একক ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৩৩.৩ একর পর্যন্ত জমি রাখার বিধান করা হয়েছিল। কিন্তু সামরিক সরকার আইয়ুব খান ১৯৬১ সালে সর্বোচ্চ সীমা ১২৫ একর পর্যন্ত বৃদ্ধি করে এক ক্ষুদ্র জমিদার শ্রেণি সৃষ্টি করেন।[২০] সামরিক শাসক আইয়ুব খান এ প্রক্রিয়ায় প্রভাবশালী ভূ-স্বামীদের সমর্থন আদায়ের মাধ্যমে তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তখনকার সমাজে যত বেশি জমি তত বেশি সম্পদ ও সম্মান এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল। পূর্ববাংলায় ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছিষ্টভোগী অনেক ভূস্বামী ছিলেন। ঢাকার নবাব পরিবার পূর্ববাংলার অন্যতম বড় জমিদার ছিলেন। তাঁদের প্রশাসনিক কোন ক্ষমতা ছিল না। তবে ঢাকার নবাব পরিবার পূর্ববাংলার মানুষের কল্যাণে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। পূর্ববাংলায় ব্যাংক, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, মিউনিসিপ্যালসহ জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে ঢাকার নবাব পরিবার এ অঞ্চলের মানুষের ব্যাপক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। পাকিস্তান আমলেও তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় ছিল। ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন এবং খাজা শাহাবুদ্দিন পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সক্ষম হন। ব্রিটিশ আমলের রাজভক্ত নীতির ন্যায় একই পথ অবলম্বন করে তাঁরা পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁরা মূলত পাকিস্তানী ভাবধারার রাজনৈতিক আদর্শই সব সময় লালন করতেন। পাকিস্তান শাসনামলে তাঁরা পূর্ববাংলার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে ব্যর্থ হন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর দুরভিসন্ধিমূলক সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে পূর্ববাংলার

মানুষের বিরাগভাজন হন।[২১] ফলে ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসা তাঁদের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা এবং সম্মানের সম্পর্কের জায়গটা পরিবর্তন হতে শুরু করে। ঢাকার নবাব পরিবার অবশ্য বাংলা ভাষাভাষী ছিলেন না। তাঁদের পূর্ব পুরুষ কাশ্মির থেকে এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তারা উর্দু এবং ফার্সি ভাষায় কথা বলতেন। আধুনিক ভাবধারা গ্রহণ করে অনেকেই ইংরেজি ভাষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীণ সমাজে যাঁরা নিজেদের অভিজাত ভাবতেন তাঁরা উর্দু-ফার্সী চর্চাকে আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করতেন। আগে থেকেই হিন্দু জমিদারগণ কলকাতায় অবস্থান করে প্রতিনিধির মাধ্যমে পূর্ববাংলার জমিদারী তদারকি করতেন। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা রহিত হওয়ার পর তাঁরা কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ফলে পাকিস্তান শাসনামলের শুরুতেই ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণির অবলুপ্তি ঘটে। এর মাধ্যমে পূর্ববাংলায় কলকাতা কেন্দ্রীক জমিদার অভিজাতদের যুগের অবসান ঘটে।

৩.১.২ রাজনৈতিক অভিজাত

ব্রিটিশ শাসনামলে অবিভক্ত বাংলার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রাণ কেন্দ্র ছিল কলকাতা। পক্ষান্তরে পূর্ববাংলা কলকাতার শিল্প-কলকারখানার কাঁচামালের যোগানদাতা অঞ্চলে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই দেশ বিভাগের সময় পূর্ববাংলা অনেকটা পশ্চাৎপদ অঞ্চল ছিল। এ অঞ্চলের মানুষ রাজনৈতিকভাবেও অনগ্রসর ছিল। কোচানেক নবসৃষ্ট পাকিস্তানে হাতেগোনা ২০ থেকে ২৫ জন রাজনৈতিক অভিজাতের কথা উল্লেখ করেছেন যাদের ১৭ জন পশ্চিম পাকিস্তানের এবং মাত্র ৮ জন পূর্ববাংলার। এসকল রাজনৈতিক অভিজাতরা ছিলেন ভূস্বামী, আইনজীবি, আমলাতন্ত্র এবং ব্যবসায়ী শ্রেণি থেকে আগত।[২২] এসকল অভিজাত সংখ্যায় বেশি না হলেও ধর্মীয় আনুগত্য, দীর্ঘদিনের চলে আসা ঐতিহ্যের জোরে অশিক্ষিত কৃষি নির্ভর সমাজের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর আনুগত্য আদায় করে নিতে তাঁদের খুব একটা বেগ পেতে হতো না। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক অভিজাতদের সাথে সাধারণ জনগণের সম্পর্ক ছিল পেট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক। প্রথম দিকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশ আমলের সুবিধাভোগী শ্রেণির হাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমানদের অধিকার আদায়ের জন্য জন্ম নেয়া মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিটিশদের প্রদত্ত খান সাহেব, খান বাহাদুর খেতাবধারীরা। তাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল জমিদার জোতদার শ্রেণির লোকেরা।[২৩] পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলে যায় রাজনৈতিক সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অংশ বুদ্ধিজীবী শ্রেণির হাতে। এসময় পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব, প্রকাশনা শিল্পের বিকাশ এবং সংবাদপত্র প্রকাশনার ফলে সমাজে এক নতুন জাগরণ সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে সমাজ সচেতন একটি নতুন শ্রেণির বিকাশ ঘটে। নতুন এই শিক্ষিত শ্রেণির লোকেরা

বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার নেতৃত্ব দেয়। এরা শ্রেণি হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পড়ে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই শ্রেণির উৎপত্তি বিকাশ এবং পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে তাঁদের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। প্রাক-পাকিস্তান সমাজে রাজনীতিতে কয়েক ধরনের মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। এক শ্রেণির লোক ছিল যারা ব্রিটিশ সৃষ্ট জমিদার পরিবার থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন যারা ব্রিটিশ শাসকদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত ছিলেন। ধনাঢ্য ব্যবসায়ী শ্রেণির লোক যারা রাজনীতিতে টাকা বিনিয়োগ করে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করত। তৃতীয়ত, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি যারা প্রকৃত পক্ষে সাধারণ মানুষের স্বার্থের পক্ষে কাজ করতেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পরে অবশ্য পূর্ববাংলার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চলে যায় শেষোক্ত শ্রেণির হাতে। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলে যায় সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে। শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত থেকে যায় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক অভিজাতদের হাতে। বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে শাসক শ্রেণির দ্বন্দ্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। এই নব্য রাজনৈতিক সচেতন লোকেরাই সাধারণ জনগণের শোষণ-বঞ্চনার অবসান কল্পে আন্দোলন সংগ্রামের সূচনা করে যা পরবর্তীকালে স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপ লাভ করে।

৩.১.৩ সামরিক-বেসামরিক আমলা

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতের ঐতিহ্যগত প্রশাসনিক পদক্রমে পরিবর্তন ঘটে। সুলতানী ও মোগল শাসনামলে খান, মালিক, আমির প্রভৃতি উপাধীধারী আমলারা প্রথম শ্রেণির অভিজাত ছিলেন। এঁদের জীবন প্রণালী ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। ব্রিটিশ শাসনামলে ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিক আমলাতন্ত্র সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় ১৫৭ জন আমলা পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। এঁরা ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) এবং ভারতীয় পলিটিক্যাল সার্ভিসের (আইপিএস) সদস্য ছিলেন। এসকল অফিসারের মধ্যে ৫০ জন ছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক যাঁরা চুক্তিতে কাজ করতে রাজী হয়েছিলেন। সামরিক আমলার মধ্যে পাকিস্তান অংশে এসেছিল ৪ জন লেফটেন্যান্ট, ৪২ জন মেজর এবং ১১৪ জন ক্যাপ্টেন।[২৪] এরা প্রায় সকলেই ছিলেন অবাঙালি এবং পশ্চিম পাকিস্তান নিবাসী।

নিচের সারণিতে পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে

সারণি-৩.৬ : পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য[২৫]

পদ (অফিসার)	পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	শতকরা	পূর্ববাংলা	শতকরা
আর্মি	৯০৩	৮৯৪	৯৯ (প্রায়)	১৪	০.৯৯ (প্রায়)
নেভি	৬০০	৫৯৩	৯৮.৮৩	৭	১.৬৭
বিমান বাহিনী	৭০০	৬৪০	৯১.৪৩	৬০	৮.৫৭
সচিব	১৯	১৯	১০০	০	০.০০
যুগ্ম-সচিব	৪১	৩৮	৯৫.০০	৩	৫.০০
উপ-সচিব	১৩৩	১২৩	৯২.৪৮	১০	৭.৫২
আন্ডার সেক্রেটারী	৫৪৮	৫১০	৯৩.০৭	৩৮	৬.৯৩

উপরের সারণিতে সামরিক বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয়ে বৈষম্যের যে চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তাতে বোঝা যায় কেন্দ্রীয় প্রশাসনে পূর্ববাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল অকিঞ্চিত। অন্য কথায়, একে ঔপনিবেশিক চরিত্রের প্রশাসন ছাড়া কিছু বলা যায় না। কেন্দ্রীয় প্রশাসনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব না থাকায় পূর্ববাংলায় প্রশাসনিক উচ্চবিত্তেরও তেমন বিকাশ ঘটেনি। Gustav F. Papanek এর মতে,

> ...the fact that East Pakistan was substantially underrepresented in the civil service and particularly unrepresented in the higher echelons. The civil service dominated the government, and West Pakistan dominent the civil service. It is inevitable that civil servants from a particular area are more concerned with its problems and are better able to deal with them. Evidence that this quite natural bias existed comes from the civil servants themselves.[২৬]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা সামরিক-বেসামরিক আমলাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। পাকিস্তানের প্রথম সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খান চার বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে কয়েক ধাপে লে. কর্ণেল থেকে জেনারেল পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আমলাতন্ত্রকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেও ১৯৪৮ সালে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আমলাদের দৌরাত্ম আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তান রাষ্ট্র শুরু থেকেই একটি আমলা নির্ভর রাষ্ট্রে পারণত হয়। এসকল আমলারা রাজনৈতিক নের্তৃত্বকে অবজ্ঞা করতেও দ্বিধা করতো না। সাবেক আমলা গোলাম মোহাম্মদ গভর্নরের ক্ষমতা গ্রহণের পর

আমলাদের দৌরাত্ম এতই বৃদ্ধি পায় যে, পাকিস্তান কনস্টিটিইয়েন্ট এসেম্বলীর সংখ্যাধিক্য সদস্যের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকারকে বরখাস্ত করা হয়।[২৭] বিশেষ করে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক শাসন জারির পর সামরিক আমলাদের দাপট আরও বৃদ্ধি পায়। আমলারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এক পর্যায়ে তাঁরা নিজেরা মন্ত্রী পরিষদে অংশ গ্রহণ, মন্ত্রী নিয়োগ বা বরখাস্তের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভূমিকা রাখতে শুরু করে।[২৮] ইয়াহিয়া খানের দ্বিতীয় সামরিক শাসনামলে প্রশাসনের সর্বত্র সামরিক আমলাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় পূর্ববাংলায় উচ্চ পর্যায়ে প্রশাসনিক অভিজাত শ্রেণির বিকাশ ঘটেনি। পূর্ববাংলার আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রশাসনেও শীর্ষ কর্তা ব্যক্তিরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়োগ পেতেন।

৩.১.৪ ব্যবসায়ী অভিজাত শ্রেণি

প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার খ্যাতি ছিল বিশ্বজুড়ে। পরবর্তীকালে ঢাকা রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে বিকাশ লাভ করে। মোগল শাসনামলে ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছিল। সেসময় ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে গতি লাভ করেছিল। নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী হলেও নায়েব নাজিমদের শাসন অব্যাহত থাকায় ঢাকার গুরুত্ব লোপ পায়নি। তবে ব্রিটিশ শাসনামলে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় কলকাতা। ফলে পূর্ববাংলা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ অবস্থানে চলে যায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আশার আলো দেখা যায়। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে আশাভঙ্গ হলেও ছোট লাটের নেতৃত্বে ঢাকা দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা অব্যাহত থাকে। তবে দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন এবং শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসরতার কারণে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল। এতদসত্ত্বেও পূর্ববাংলা যা কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তাতে তার বেশির ভাগের মালিকানা ছিল হিন্দুদের। প্রায় সকল বড় বড় উদ্যোক্তাই ছিল হিন্দু। ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, পূববাংলার অধিবাসীদের মধ্যে ২১ লক্ষ ৭০ হাজার ৮ শত ৭৩ জন মানুষ শিল্প ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিলেন। এর মধ্যে ১২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩শত ৩৮ জন হিন্দু সম্প্রদায়ের।[২৯] ঐ সময়ে পূববাংলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২২.০৪ শতাংশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। তবে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর হিন্দু ব্যবসায়ীদের বাস্তুত্যাগ করে ভারতে চলে যাওয়া অব্যাহত ছিল। যে সকল হিন্দু ব্যবসায়ীরা পূর্ববাংলায় তাঁদের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর শত্রু সম্পত্তি এ্যাক্ট-এর আওতায় তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এসময় হিন্দু মালিকানাধীন ৫২ টি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান, ২৫০টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত করে যার সম্পদের পরিমাণ ছিল ১০,০০০ মিলিয়ন রুপি।[৩০] হিন্দু ব্যবসায়ীদের বাস্তুত্যাগের

ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার স্থলাভিষিক্ত হয় অবাঙালি মুসলিম ব্যবসায়ীরা। ১৯৪৮ সালে জাপান বার্মা দখল করে নিলে ভারত বর্ষের অনেক অবাঙালি ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসা কেন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন । কলকাতা, রেঙ্গুন, বোম্বে প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যবসা কেন্দ্র থেকেও কিছু অবাঙালি ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবসা ঢাকায় স্থানান্তর করেন। অবাঙালি ব্যবসায়ী অভিজাতরা পূর্ব বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।[৩১] এসকল অবাঙালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে খোজা ইসমাইলী, মেমন, চিনোটী (Chinoti) ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সম্পদের পরিমাণ বেশি ছিল। মেমন গ্রুপের মধ্যে আদমজী, বাওয়ানী, করিম এবং দাউদ পরিবার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ছিল। পাকিস্তানের ব্যবসা-বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি ও পরিবারের হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। পঞ্চাশের দশকে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ৩০০০ এর বেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বাত্বাধিকারী ছিলেন ২৪ জন ব্যক্তি বা পরিবার, যা বেসরকারী বাণিজ্যি সম্পদের অর্ধেক।[৩২] ১৯৬২ সালে লরেন্স জে হোয়াইট অন্য একটি সমীক্ষায় দেখান যে, ৪৩ টি পরিবার পাকিস্তানের মোট সম্পদের ৭২.৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করেন। এই একই গোষ্ঠী পূর্ববাংলার প্রাইভেট সম্পদের ৪৩ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করেন। এই ৪৩ পরিবারের মধ্যে একমাত্র বাঙালি পরিবার ছিল চট্টগ্রামের এ কে খান পরিবার যাদের সম্পদের পরিমাণ ছিল উল্লেখিত সম্পদের মাত্র ১.২ শতাংশ বা ৭৪.৯ মিলিয়ন রুপি।[৩৩] কাজেই পূর্ববাংলা ব্যবসায় স্থানীয়দের অংশগ্রহণ ছিল অনুল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্তির সময় এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য কিছু ব্রিটিশ, আর্মেনীয়, হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, পাকিস্তানী ও অবাঙালি ব্যবসায়ী সমপ্রদায়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল।[৩৪] পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যবসায়ীদের উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। বিশেষ করে, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে এদের গুরুত্ব এতই বৃদ্ধি পায় যে তিনি তাঁর সাথে ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে জেনারেল হামিদকে নিয়োগ দান করেন।[৩৫] তবে এসকল ব্যবসায়িক গোষ্ঠী পাকিস্তানের সমাজে প্রভাবশালী শ্রেণি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়নি বরং জনগণের প্রতিনিধিত্বহীন সরকারের আমলাদের পদলেহন করে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলে মনোনিবেশ করে।[৩৬] পাকিস্তান আমলে মুসলিম বাঙালি ব্যবসায়ী ছিল হাতে গোনা কয়েকজন। সেসময়ে উদীয়মান বাঙালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে চট্টগ্রামের এ কে খান[৩৭], নারায়নগঞ্জের গুল বখশ ভূঁইয়া, রহমতগঞ্জের ফকির চাঁদ, আফিল গ্রুপ, আশরাফ গ্রুপ, ভান্ডারী, ইসলাম গ্রুপ, আনোয়ার গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৩৮] দেশভাগের রাজনীতিতেও ব্যবসায়ীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনীতিতে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব শুধু পাকিস্তান শাসনামলেই নয়, দেশ ভাগের পূর্বাপর তাদের তৎপরতা রাজনৈতিক নেতাদেরকে প্রভাবিত করেছিল। দেশভাগের সময় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলো লীগ ও কংগ্রেসের সমর্থনে বিভক্ত হয়ে পড়েন। কলকাতার মাড়োয়ারী ব্যবসায়িরা ভারতীয় কংগ্রেসকে জানায় যে, মুসলিম লীগ সরকারের অধীনে বাংলার ব্যবসা 'সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস' হয়ে গিয়েছে। তারা দেশভাগের

প্রচেষ্টাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে।[৩৯] অপর দিকে কলকাতার ইস্পাহানীরা ছিল মুসলিম লীগের সমর্থক ও অর্থের যোগানদাতা। মুসলিম লীগ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, বাংলায় কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা হলে ঐ সরকার মাড়োয়ারীদের পকেটে চলে যাবে।[৪০] কলকাতার জনজীবনে মাড়োয়ারী ব্যবসায়িদের তৎপরতা লক্ষণীয় ছিল। এসব ব্যবসায়িরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চড়াদামে বিক্রির উদ্দেশ্যে মালামাল গুদামজাতকরণ এবং কালোবাজারীতে কেনাবেচা শুরু করে। সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া শুরু করলে ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে মুসলিম লীগ সরকারের পতন হয়।[৪১] ব্যবসায়ী সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উদাসীন ছিলেন না। অনেকে সরাসরি রাজনৈতিক পদপদবী গ্রহণ করেছিলেন। স্যার আদমজী, হাজি দাউদ, মির্জা আহম্মদ ইস্পাহানী, হাসান ইস্পাহানী, প্রমূখ ব্যবসায়ীরা পর্যায়ক্রমে বাংলা মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৪২] বাঙালি মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল। পূর্ববাংলার শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী এ কে খান পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক মুহম্মদ আইয়ুব খানের শিল্প, বিদ্যুৎ এবং পূর্ত মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৪৩] পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সামরিক শাসক আইয়ুব খান ব্যবসায়ীক গোষ্ঠীর লোকদের সাথে যোগাযোগের জন্য একজন মন্ত্রীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। এভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক শাসকদের সাথে কোন কোন ব্যবসায়ির অসৎ মৈত্রী গড়ে ওঠেছিল। এছাড়া আরেকজন বড় বাঙালি ব্যবসায়ীও পাকিস্তান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন, তিনি হলেন তৎকালীন সময়ের খ্যাতিমান ব্যবসায়ী ফজলুর রহমান।[৪৪] পূর্ববাংলার বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন অবাঙালি ব্যবসায়ীরা। পূর্ববাংলার শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৮০ শতাংশ গুজরাটী ও উর্দু ভাষী পশ্চিম পাকিস্তানীদের মালিকানাধীন ছিল।[৪৫] ব্যবসায়ীক-গোষ্ঠী এবং সামরিক শাসকদের মধ্যে একধরনের অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা আমলাদের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি।

৩.২ মধ্যবিত্ত শ্রেণি

মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা জটিল বিষয়। বাংলায় 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি' পরিভাষা প্রথম ব্যবহার করেন *বঙ্গদূত* নামক একটি সাময়িক পত্রিকা। বঙ্গদূত পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> যে সকল লোক পূর্বে কোনো পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারাই উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা, হ্রস্বতাকে তাহাদিগের বাস্তবদিন প্রকাশ পাইয়াছে। এই মধ্যবিত্তদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল। তাহাদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাদের জনসমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত। অতএব দেশব্যবহার ও ধর্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক।[৪৬]

এ তথ্যে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ শাসনের আগে বাংলায় উচ্চ ও নিম্নবিত্তের মাঝখানে আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধারণা জন্ম হয়নি। ইংল্যান্ডের আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয়েছিল শিল্পবিপ্লবের ফলে। ভারতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কাজেই বলা যায়, উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয়নি।[৪৭] অন্য একজন গবেষক প্রায় একই ধরনের মত প্রকাশ করে বলেন বাংলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ শুরু হয় ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল থেকে।[৪৮] সমাজবিজ্ঞানীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। সাধারণভাবে বলা যায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই শ্রেণির লোকেরা প্রধানত সরকারী কর্মকর্তা, সাধারণ ব্যবসায়ী, আইনজীবি, সাংবাদিক ও শিক্ষক হয়ে থাকেন।[৪৯] এ কে নাজমুল করিমের মতে, দ্বিতীয় বাংলা বিভক্তিতে (১৯৪৭) বাংলার সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে। দেশভাগের ফলে হিন্দু ব্যবসায়ী, মহাজন ও বিভিন্ন পেশাজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাস্তু ত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে এ ধরনের নতুন মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয় যা পূর্বে ছিল না। প্রথম বাংলা বিভাগের (১৯০৫) ফলে পূর্ববঙ্গে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত হতে শুরু করেছিল যা এ পর্যায়ে এসে একটি নেতৃত্বদানকারী শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়। পূর্ববাংলার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি শক্তিশালী শ্রেণি রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে যা উচ্চ শ্রেণির চেয়েও অধিক শক্তিশালী। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের বেলায় তা ঘটেনি।[৫০] বিনয় ঘোষ বাংলার সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর মতে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা চাকুরিজীবি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত। আর গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ছিলেন জমিদারের উপস্বত্বভোগী যেমন, নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, কোর্টকাছারির কর্মচারী, দারোগাবাবু, সেপাই, কারুজীবি, অবস্থাসম্পন্ন চাষী ইত্যাদি।[৫১] এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আবার শিল্পনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণি, বাণিজ্য নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণি, এবং শিক্ষিত পেশাজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কার্ল মার্কস্ বলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির ওপর নির্ভরশীল থাকে এবং উচ্চবিত্তের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।[৫২] পূর্ববাংলা গ্রাম প্রধান এবং কৃষিনির্ভর এলাকা ছিল। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করত। গ্রামের লোকের প্রধান পেশা ছিল কৃষি। এখানে ভূমি নির্ভর কিছু মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক ছিল যা উল্লেখযোগ্য না। তবে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এ অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার লাভ করে। এখানে পূর্ববাংলার কৃষক পরিবারের সন্তানরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে প্রয়াসী হন। এভাবে একটি শিক্ষিত সচেতন শ্রেণির বিকাশ শুরু হয়। এরাই পূর্ববাংলার শিক্ষিত পেশাজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম দেয়। পরবর্তীকালে আমরা দেখবো এই শ্রেণির লোকেরাই পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে পূর্ববাংলার মুষ্টিমেয় যে সকল লোক কলকাতায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে তারাও দেশবিভাগের পরে পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক, ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়। যেমন বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে সফল

রাজনৈতিক নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এময়ের সৃষ্টি। কোলকাতাতে অধ্যয়নকালে তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে, পূর্ববাংলায় এসে তা পূর্ণতা পায়, পরিশেষে তিনিই হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যমণি ও রূপকার। এই বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির পূর্ববাংলার সমাজে প্রধান চালিকা শক্তিতে রূপান্তরিত হতে বেশি দিন লাগেনি।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে মধবিত্ত শ্রেণিই মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। অর্থাৎ আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি না হলে আধুনিক সমাজের বিকাশ সম্ভব হতো না। ঐতিহাসিক পোলার্ড (A F Pollard) মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন:

> ...feudalism contempleted, roughly, only two classes, the lords and their villeins. Now, the industrial and commercial system of modern history requires two factors which feudalism did not provide; it requires a middle class and requires an urban population. Without this two there would have been little to distinguish between modern from medieval history. Without commerce and industry there can be no middle class; where you had no middle class you had no Renaissance and no Reformation.[৫৩]

এই বক্তব্যই সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। আমাদের আলোচনাধীন পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অগ্রণী ভূমিকা ছিল। পূর্ববাংলার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল কৃষক। এই কৃষকের সন্তান যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থার সুফল গ্রহণ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তারা ঔপনিবেশিক ধাঁচের সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে থাকে। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিত্তি যেহেতু গ্রাম সেকারণে তারা সমাজের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাক্রম পর্যালোচনা করলে দেখ যাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং ছাত্রদের মিলিত শক্তি পূর্ববাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রধান কারকের ভূমিকায় থেকেছে। শিক্ষার প্রসারের সাথে মধ্যবিত্তের প্রসার অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। অধ্যাপক, আইনজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, স্থপতি, প্রকৌশলী, শিল্পী, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর সমন্বয়ে পূর্ববাংলায় একটি বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ লাভ করছিল।[৫৪] ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পূর্ববাংলায় ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতি ছিলেন মাত্র ১,১৮৫ জন।[৫৫] অন্যান্য পেশাজীবী যেমন– বিচারক, আইনজীবী, পরিসংখ্যানবিদ, অর্থনীতিবিদ, অডিটর এবং রসায়নবিদ ছিলেন ১২,৯৩৮ জন।[৫৬] মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্রমবর্ধমান বিকাশ পূর্ববাংলার রাজনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে। অবশেষে এই শ্রেণির মানুষই সাধারণ মানুষের স্বার্থের অনুকূলে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ক্রিয়াশীল করতে প্রেরণা জোগায়।

৩.৩ নিম্নবিত্ত শ্রেণি

নদীবহুল পূর্ববাংলা ভৌগোলিক কারণে পৃথিবীর অন্যতম কৃষি উৎপাদনশীল অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। পূর্ববাংলার জনজীবন সচল রেখেছে এর অসংখ্য নদ-নদী। নদীগুলিই পূর্ববাংলার মানুষের জীবন রেখা। নদীবাহিত পলিমাটিতে সৃষ্ট পলল ভূমি কৃষি উৎপাদনের জন্য সহায়ক। ফলে পূর্ববাংলায় মূলত গ্রাম ভিত্তিক কৃষি নির্ভর সমাজের বিকাশ লাভ করেছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে একটি স্মৃতিকথায় বলেছিলেন, "পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের অবনতির একটি প্রধান কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের অভাব। তাঁদের মধ্যে কিছু জমিদার আছেন; বাকী সবই কৃষক"।[৫৭] আমাদের আলোচ্য কালপর্বের সূচনা লগ্নে দেখা যায় পূর্ববাংলার মোট জনসংখ্যার ৯৫.৬১ শতাংশ গ্রামে বাস করে।[৫৮] মোট ৪,২০,৬২,৬১০ জন জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ১৮,৪৪,৩৪৫ জন বা শতকরা ৪.৩৯ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করে। অর্থাৎ এটি ছিল মূলত গ্রাম প্রধান অঞ্চল। এই বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই কোন না কোনভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এসকল অধিবাসীরা প্রথাগত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে উৎপাদক শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত। মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে এরা একই ছকে বাঁধা জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তবে আমাদের আলোচ্য কাল সীমায় গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ব্রিটিশ শাসনামলে রেল যোগাযোগের ফলে উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। এর ফল হলো যুগ যুগ ধরে প্রচলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন এক বাজার কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠতে শুরু করে। কার্ল মার্কস অনেক আগেই বলেছিলেন, রেলপথকে কেন্দ্র করেই ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য দৃঢ় হবে, রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটবে, আধুনিক কলকারখানা গড়ে উঠবে, স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামীণ ব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে যাবে, প্রাচীন বর্ণপ্রথা, সংস্কার ইত্যাদির অবসান হবে, আধুনিক শিক্ষিত মধ্যস্তরের উদ্ভব হবে।[৫৯] কার্ল মার্কস এর ধারণা অনুযায়ী ভারতবর্ষের সমাজ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিবর্তনের সূচনা হয় বটে কিন্তু পূর্ববাংলার অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান অনুল্লেখযোগ্যই থেকে যায়। প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থাই এখানকার জনজীবনকে সচল রেখেছিল। গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ তাদের জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনে নিরন্তর সংগ্রামের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখে।

পূর্ববাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যই এখানে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ববাংলার অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজ অথবা কৃষিভিত্তিক পেশার সাথে জড়িত। কর্মক্ষম জনসংখ্যার শতকরা ৮২.৩৪ শতাংশ কৃষিকাজের সাথে জড়িত। অন্যদিকে মোট জনসংখ্যার ৬৮.৯৬ শতাংশ ছিল নির্ভরশীল জনসংখ্যা যার বেশিরভাগই কৃষিনির্ভর পরিবারের সাথে যুক্ত। কৃষিভিত্তিক পেশার মধ্যে ছিল কৃষক, জেলে, পশুপালনকারী, শিকারী, গোয়ালা ইত্যাদি। কৃষকদের মধ্যেও আবার অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বিচারে ধনী কৃষক, মধ্যম কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষক অর্থাৎ যারা ধনী কৃষকের জমি বর্গা নিয়ে চাষ

করতেন, কৃষকদেরেকে এই তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। সমাজের একেবারে প্রান্তিক অবস্থানে ছিলেন শ্রেমিক শ্রেণির মানুষ। এই শ্রেণির মানুষরাই মূলত উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রেখেছিলেন। কৃষি ব্যবস্থা ছিল অনেকটা প্রকৃতি নির্ভর সে কারণে আবহাওয়া অনুকূল থাকলে কৃষকের মূখে হাসি থাকত অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে, যা পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঘটনা, কৃষকের ঘরেও দুর্যোগ নেমে আসত। এই সকল কৃষকের প্রতিদিনের জীবন ছিল একটি ছকে বাঁধা। প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে ফসলহানিকে তারা নিয়তি হিসেবে মেনে নিতেন। ধবংসের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁরা আবার নতুন স্বপ্নের বীজ বুনতেন। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা হয় তার একটি প্রভাব কৃষক পরিবারের ওপরও পড়তে শুরু করে। গ্রামের সাধারণ পরিবারের অনেক ছেলে-মেয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়। এই নব শিক্ষিত সন্তানদের মাধ্যমে তাদের বাবা-মা আত্মীয় স্বজন এমনকি প্রতিবেশীরা অধিকার স্বচেতন হতে শূরু করে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সূচিত বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের ঢেউ গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ত। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বিশেষ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ) এর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষও তাদের অধিকার সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হতে শুরু করে। গ্রামে কৃষক শ্রেণির পাশাপাশি গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য আরও বিভিন্ন পেশার মানুষ বাস করতেন। মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, গীর্জা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ যেমন- ইমাম, মোয়াজ্জিম, পন্ডিত, সাধু, ফকির, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, ভিক্ষু, পাদ্রী ইত্যাদি পেশার মানুষও পূর্ববাংলার অধিবাসীদের নৈতিকমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন। এরা সমাজ জীবনের ওপর গভীর প্রভাব রাখতেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রায় ৪৫,৭৫৮ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন। ধর্মীয় ও শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ সমাজের নৈতিক মান ধরে রাখতে যথাযোগ্য ভূমিকা রাখতেন। পূর্ববাংলার নিম্নবিত্তের মানুষের মধ্যে গৃহকর্মী, পাচক, বেয়ারা, খেদমতগার, আয়া, নার্স, ভিস্তিওয়ালা, নাপিত, মুটে, মজুর, কূলি, প্রহরী, কেয়ারটেকার, খনি শ্রমিক, পশুচালিত গাড়ির গাড়োয়ান, বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র চালিত গাড়ির ড্রাইভার, রিকশাওয়ালা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ লেখক, সম্পাদক, সাংবাদিক, শিল্পী, ভাস্কর, যাদুকর, অভিনেতা, গায়ক, নৃত্যশিল্পী, চিত্রগ্রাহক, ক্রীড়াবিদ ইত্যাদি পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। পাশাপাশি সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে ব্যবস্থাপক, প্রশাসনিক, করণিক ইত্যাদি পদ যেমন সরকারি কর্মকর্তা, অফিস কর্মী, কেরানী, টাইপিস্ট, গ্রন্থাগারিক এসকল পদে ২,০৮,০০১ লোক কর্মরত ছিলেন। সারা প্রদেশে সর্বমোট ৫,০২,৩৩১ জন লোক বিক্রয়কর্মী এবং দোকানদার পেশায় কর্মরত ছিল। শিল্প-কলকারখানার অভাবে পূর্ববাংলায় এখাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল না। ১৯৬৮ সালে পূর্ববাংলার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৪৬ জন।[৬০] পূর্ববাংলার স্থানীয় অধিবাসীদের পাশাপাশি দেশ ভাগের স্রোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক

ভারতীয় অবাঙালি উদ্বাস্তু পূর্ববাংলায় প্রবেশ করে পূর্ববাংলার বিভিন্ন কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয়েছিলেন। এই শ্রেণির লোকেরা সর্বদা পূর্ববাংলার মানুষের লালিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিপরীতে ক্রিয়াশীল ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির মাধ্যমে পূর্ববাংলার সম্মিলিত বিরোধী জোট যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করলে সরকার আদমজী পাটকল ও চন্দ্রঘোনার কাগজ কলে এই অবাঙালি শ্রমিকদের উস্কে দিয়ে বাঙালি অবাঙালি দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে ব্যর্থতার দায়ভার যুক্তফ্রন্ট সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এই সরকারকে বরখাস্ত করেন।

যেসকল মানুষ তাদের শ্রমে ঘামে উৎপাদন প্রক্রিয়া ঠিক রেখে সমাজ ব্যবস্থাকে সচল রেখেছে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়নে তাদের অবদান রাখার খুব একটা সুযোগ ছিল না। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সুযোগ তারা পায়নি কেননা সে সময়ে যেসব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে ভোটাধিকারের যে যোগত্যা নির্ধারিত ছিল সেই মাপকাঠিতে এই শ্রেণীর অধিকাংশই ভোটদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। পাকিস্তান প্রথম সর্বসাধারণ ভোটাধিকারের সুযোগ লাভ করে। এই সুযোগের পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার তারা করে। বিশেষ করে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে কৃষক শ্রমিক মজুররাই মূলত পূর্ববাংলার বিজয়ের নায়ক বলা যেতে পারে।

পূর্ববাংলার অধিবাসীদের সামাজিক মর্যাদা ও বিন্যাস পর্যালোচনা করলে এই সমাজের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। পূর্ববাংলা হলো একটি প্রথাগত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অংশ। প্রাচীনকাল থেকে এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এটি যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে প্রদেশ হিসেবে সংযুক্ত হয় সেই সময়কালটা ছিল ভারত বর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ। এটি রাজনৈতিক শক্তির একটি পালাবদলের কাল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ব্রিটিশ শাসনামলে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক সচেতনতার বিকাশ ঘটছিল এসময়ে। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ ভাবধারার রাজনৈতিক অভিজাতের স্থলে কৃষক পরিবার থেকে আগত নব শিক্ষিত রাজনৈতিক শ্রেণির দ্রুত বিকাশ হয়েছিল এসময়ে। প্রথাগতভাবে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা শাসকগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজা-প্রজার সম্পর্কের মনস্তত্ত্ব লালন করত। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা রোহিতকরণের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন উপকার হয়নি বটে কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রজাসূলভ মনোবৃত্তির স্থলে রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে নিজের মধ্যে মনোজাগতিক একটি পরিবর্তনের সূচনা হয়। ব্রিটিশ রাজভক্ত শ্রেণির যেসকল রাজনৈতিক অভিজাত পাকিস্তান আমলে নিজেদের প্রতিপত্তি ধরে রেখেছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিশেষ করে তাঁদের ভেতর থেকে উদীয়মান রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবে সমাজ ও রাজনীতিতে তাদের প্রভাব ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। এ ধরনের রাজনৈতিক অভিজাতের

পতনের সূচনা হয় পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই। আইন পরিষদ সদস্য প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী এ সংক্রান্ত একটি চমৎকার তথ্য প্রদান করেছেন। নঁওগা জেলার মান্দা থানার একটি বিল অঞ্চল সফরে গেলে একজন মুসলিম চাষী তাকে বলেন, "বাবু, ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের আগে জিন্নাহ সাহেব বলেছিলেন যে, তিনি নির্বাচনে কলাগাছকে দাঁড় করালে, সেই কলাগাছকেই মুসলমানদের ভোট দিতে হবে। আমরা দিয়েছিলামও ভেবেছিলেম কলাগাছকেই ভোট দিলেম। কিন্তু এখন দেখছি সেদিন কলাগাছকে ভোট দিইনি। কলাগাছকে ভোট দিলেও তো ৬ মাসে এককাঁধি কলা পেতেম কিন্তু আজ ছয় বছরেও কিছুই পেলাম না।[৬১] এই বক্তব্যের মধ্যে গ্রামের সহজ-সরল সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও অধিকারবোধ বিকাশের ইঙ্গিত মেলে। রাজনৈতিক অভিজাতদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের দিন শেষ হতে শুরু করে। তাঁদের পরাজয়ের সূচনা হয় ১৯৪৯ সালে। এবছর এপ্রিল মাসে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার খুররম খান পন্নী একজন নবীন রাজনৈতিক কর্মী শামসুল হকের কাছে বড় ব্যবধানে পরাজিত হন। এটি একটি আসনের উপনির্বাচন হলেও পূর্ববাংলা রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে এর প্রতীকি গুরুত্ব রয়েছে। বলা যেতে পারে এই নির্বাচনে পরাজয়ের মধ্যদিয়ে মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক পরাজয়ের সূচনা হয়।[৬২] এই নির্বাচনে পরাজয়ের পর আইন পরিষদে ৩৪ টি আসন খালি থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আর উপ-নির্বাচনের পথে পা বাড়ায়নি। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ষড়যন্ত্র ও সামরিক-বেসামরিক আমলাদের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবে ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট পরিত্যক্ত জমিদার, রাজভক্ত, আমলা ও কায়েমী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের পতন ঘটে সেই সাথে ব্রিটিশ আমলের জন্ম নেওয়া রাজনৈতিক অভিজাতের স্থলে গণসমর্থনপূষ্ট রাজনৈতিক শ্রেণির বিকাশ ঘটে।

পূর্ববাংলার রাজনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসে মধ্যবিত্তের বিকাশ এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে। পূর্ববাংলায় বিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি মূলত এসেছিল কৃষক পরিবার থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে শিক্ষা বলয় গড়ে উঠেছিল সেখানে গ্রামের সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তানরা শিক্ষা লাভের করার সুযোগ গ্রহণ করে। এরা ছাত্রজীবনে ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারবোধ বিকশিত হতে থাকে। এরা আবার কর্মজীবনে শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, প্রকৌশলী, শিল্পীসহ নানান সৃজনশীল পেশায় যুক্ত হয়ে তাঁদের ভাবধারার বিকাশ অব্যাহত রাখে। তাঁরা যেহেতু গ্রামের সন্তান সেহেতু গ্রামের মানুষের বঞ্চনা, অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এদের মাধ্যমে গ্রামের সাথে শহরে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এঁরা যেহেতু শিক্ষিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ এঁদের দারা গভীরভাবে প্রবাবিত হয়েছিল। ফলে এদের মধ্যে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিকাশের চেতনা তৈরি হয়। এই শ্রেণির লোকেরা সাধারণ মানুষকে তাঁদের

অধিকার সম্পর্কে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, যে কোন রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পূর্ববাংলার এই নব সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণি দুটি কাজ সফলভাবে করতে পেরেছিল। প্রথমত, তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক সহযোগী এদেশীয় দালাল চক্রের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে পেরেছিল। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষকে রাজনীতি সচেতন করতে পেরেছিল।

আমরা যাদেরকে সাধারণ জনগণ বলে আখ্যায়িত করেছি পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁরাই মূলত নায়কের ভূমিকা পালন করেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের পাশাপাশি কৃষক, শ্রমিক, মজুর, জেলে, তাঁতী প্রভুতি উৎপাদক শ্রেণির মানুষ যারা এতদিন ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে আসতে শুরু করে। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে এসব মানুষ পাদপ্রদীপের আলোয় আসার সুযোগ পায়। সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষমতায়নের এটি একটি প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বাংলার কৃষকদের সর্ব প্রথম সংগঠিত করেন পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত জননেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। তিনি মাটি ও মানুষের মাঝ থেকে উঠে এসেছিলেন। সে কারণে তিনি বাংলার কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি কৃষক সম্প্রদায়ের বঞ্চনা লাঘব করার জন্য কৃষক-প্রজা পার্টি গঠন করে ১৯৩৫ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়লাভ করেছিলেন। কৃষকদের অধিকার আদায়ে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানিক আন্দোলন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পাকিস্তান সৃষ্টির পর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে নতুন দল গঠন করলেন তা পূর্বের নাম কিছুটা পরিবর্তন করে কৃষক-শ্রমিক পার্টি নাম রাখলেন। শাসনতান্ত্রিক উন্নয়নের ইতিহাসে এটি এক মাইলফল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কেননা পূর্বোক্ত প্রজা শব্দের মধ্যে অন্ধ আনুগত্যসূচক যে অভিব্যক্তি ছিল কৃষক-শ্রমিক শব্দের মধ্যে মালিকানার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে। এছাড়া আওয়ামী লীগ নামক রাজনৈতিক দলটির অর্থও জনগণের মালিকানার ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ অর্থ বহন করে। এই দলটিও কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতাকে সংগঠিত করে তাঁদের দলকে তৃণমূল পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার আগেই শেখ মুজিবুর রহমানও কৃষকদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেন। কৃষক ও ছাত্রদের সংগঠিত করার ব্যাপারে তদানিন্তন সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা (আই.বি) কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে নিয়মিত রিপোর্ট প্রেরিত হতে থাকে।[৬৩] আওয়ামী মুসলিম লীগকে (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ) দলটির নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিকভাবে বিস্তৃত করতে সক্ষম হন। ফলে গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেও অধিকারবোধ এবং রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। এসব কারণে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগের তারকা প্রার্থীরা পরাজিত হয়। বিশেষ করে ময়মনসিংহের একটি আসনে জনাব খালেক নেওয়াজ নামক একজন অজ্ঞাত অখ্যাত তরুণ ছাত্র কর্মীর কাছে মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের মত একজন অভিজাত রাজনীতিকের পতন সাধারণের উত্থানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।[৬৪] ১৯৬১ সালের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি 'ফ্রান্সাইজ

কমিশনের' রিপোর্টে মুসলিমের শোচনীয় পরাজয়ের জন্য অশিক্ষিত জনগণের আবেগের বহিঃপ্রকাশ যা মুসলিম লীগ বিরোধীদের জ্বালাময়ী বক্তব্যের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৫] এই রিপোর্টের মাধ্যমে পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের ভোটাধিকারের সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা করা হলেও প্রকারন্তরে রাজনৈতিক চেতনার বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পূর্ববাংলার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের অনীহার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টাও লক্ষণীয়। সাধারণ জনগণকে ভয় পেয়ে আইয়ুব খান তার প্রভাবাধীন একটি 'ইলেকষ্টোরাল কলেজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ১৯৫৯ সালে 'মৌলিক গণতন্ত্র' আদেশ জারী করেন।[৬৬] এভাবে তিনি সাধারণ মানুষকে ভয় পেয়ে তাঁদেরকে প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো যায়নি। তাঁরা সরাসরি না হলেও আত্মিকভাবে তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সংযুক্ত হতে থাকে। বিশেষ করে, ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলন পুরো জাতিকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়। ৬-দফার প্রথম শহীদ সিলেট জেলার বিয়ানী বাজারের নয়াগ্রামের অধিবাসী মনু মিয়া একজন সাধারণ শ্রমিক।[৬৭] এই আত্ম-ত্যাগের ফলে পূর্ববাংলার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মনু মিয়া সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের প্রতীকে পরিণত হয়। ৬-দফার দাবীতে ৭ জুন হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে যে ১০ জন নিহত হন সকলেই সাধারণ শ্রমিক জনতা। বিভিন্ন মিল কারখানার শ্রমিকরাই এই হরতালে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৬৮] এভাবে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসের গতিধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজনীতিতে বৃটিশ আমলে সৃষ্ট অভিজাততন্ত্রের স্থলে এ সময়ে সাধারণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। ভাষা আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের যে নজীর সৃষ্টি হয়। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা এবং তা প্রচারে মাঠে ময়দানে গণসংযোগ করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে সাংবাদিক, পেশাজীবী, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীর পাশাপাশি মুটে, মজুর, শ্রমিক, কুলিসহ একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের মধ্যে একটি সুদৃঢ় ঐক্য সৃষ্টি হয়। ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা দিলে রাজনৈতিক কর্মীদের পাশাপাশি কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, মাঝি, গৃহিনী, সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, পুরোহিত, ইমাম, পাদ্রী, রাখাল, ভবঘুরে, 'টোকাই', আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সকলেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল। কাজেই পূর্ববাংলার রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধে শ্রেণি হিসেবে কোন শ্রেণির কী ভূমিকা সেটা নির্ণয় করতে গেলে এ কথা বলা যায় যে, উচ্চবিত্তের ভূমিকা ছিল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর সমর্থনকারী, কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগী হিসেবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি উপর্যুক্ত শ্রেণি এবং শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক শক্তির ভূমিকা পালন করে। শেষোক্ত শ্রেণি মধ্যবিত্ত শ্রেণি তথা জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জীবন রেখা হিসেবে কাজ

করে। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, এ দুই শ্রেণির সম্মিলিত শক্তিই বাংলাদেশ বিপ্লব সংঘটনের প্রধান নিয়ামক হিসেবে রাজনৈতিক অঙ্গনে ভূমিকা পালন করে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

---

১ A.k Nazmul Karim *Changing Society in India and Pakistan and Bangladesh,* Nawroz Kitab Bitan, second inpression, Dhaka, 1961 , P.xii-xiii

২ *Census of Pakistan,* 1951

৩ *Census of Pakistan,* 1961

৪ *Census of Pakistan* 1951, Vol.1, p.27

৫ S. A meenai বলেন, East Pakistan, though it occupies less than one-sixt of the total area , is one of the most densly populated regions in the world. According to the 1961 census, the density of population in East Pakistan was nearly seven times than that of West Pakistan... the average percapita income at about $60 per annum is among the lowest in tha world. cited in *Banking system of Pakistan*, State Bank of pakistan Press, Karachi, 1964, P.1, The Economy of Pakistan গ্রন্থে বলা হয়েছে, On Partition, the province of East Bengal (Including the sylhet district in Assam which was ceded in Pakistan) was found to have obtained more than two-thirds of the population of undivided Bengal but enjoy less than a thirds of its revenue. See, J Russel Andrus, PhD, Azizali F. Mohammad M. A, *The Economy of Pakistan*, oxford University Press, Karachi, 1958, P. 329

৬ Stanley A. Kochanek, *Interest Groups and Development: Business and Politics in Pakistan*, Oxford University Press, Delhi, 1983, p. 4

৭ *Census of Pakistan,* 1951, Bulletin-2 p.1

৮ M. Abdur Rahim, *An appraisal of census populations of East Pakistan from 1901 to 1961,Research monograph* No. 2, Instirute of Statistical Research and Traing, University of Dhaka, P. 25

৯ Stanley a Kochanak, পূর্বোক্ত, পৃ. P. 4, Table-1.1

১০ Delwar Hassan (Edited), *Commercial History of Dhaka,* Dhaka, Chember of Commerce and Industry, Dhaka, 2008, P. 86

১১ Jack Nobs, et.al. *Sociology*, Macmilan, London, first print 1975, P.26

১২ Karl Mannheim, *Man and Society in the age of Reconstruction: Studies in Modern Social Structure,* with a biographical Guide to the study of Modern Society, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1940,p. 89

১৩ T.B.Bottomore, et.al. *Selected writings in Sociology & Social Philosophy,* Penguin Book, Midlesex, 1961, p. 186

১৪ মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৭-৮

১৫ জয়া চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩

১৬ মো. আলমগীর, *বাংলার মুসলিমদের সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান*, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংযোজন নম্বর ৩৮২৩৭৪,পৃ. ৪৩

১৭ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২ পৃ.১৭

১৮ আইনটি East Bengal State Acquisition and Tenancy Act 1950 (EBSATA) নামে পরিচিত ছিল

১৯ কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা*, তৃতীয় খন্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৯৫

২০ Delwar Hassan (Edited), *পূর্বোক্ত*, পৃ. 86

২১ পাকিস্তানের প্রয়াত গভর্নর মোহম্মদ আলী জিন্নাহর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৬ শে জানুয়ারী পল্টনের জনসভায় জিন্নাহর ৪ বছর পূর্বেকার ঘোষণার পুনঃরাবৃতি করে বলেন,' 'কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। ৩ ফেব্রুয়ারী তিনি সংবাদ সম্মেলনে পুনরুল্লেখ করেন, ' আমি জিন্নাহর নীতিতে বিশ্বাসী'। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ ইত্তেফাক পত্রিকার প্রধান শিরেনাম ' নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসভঙ্গে বিক্ষোভের বিসুবিয়স পূর্ববঙ্গ'। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সারদেশে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়।

২২ Stanley A. Kochanek, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭

২৩ শেখ মুজিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫

২৪ Stanley A. Kochanek, *op. cit.* p. ৪৬

২৫ উল্লেখিত তথ্য রওনক জাহানের গ্রন্থ থেকে সম্পাদিত। দ্রষ্টব্য- Rounaq Jahan, *Pakistan Failure in National Integration,* The University Press Limited, Third Impression 2015, P. 25-26

২৬ Gustav Papanek, *Pakistan's Development: Social Goals and Private Incentives*, Harvard University Press, Cambridge, 1967, p.22

২৭ S.P. Varma, Virendra Narain, *Pakistan Political System in Crisis,* South Asian Studies Centre, University of Rajastan, Jaipur, India, 1972, P. 81-82

২৮ 'The government in Pakistan was dominated by the civil service. Until 1958, the political leadership changed frequently; even when leaders had the capacity, they had little opurtunity

to become familier with government operation. Civil servants participated frequently in the cabinet. After 1958 the civil service and the military were dominent even at the political level of government. Traditionally power, prestige and competency lay with the civil service, not with the political leadership. See- Gustav Papanek, *op.cit*. P. 76

২৯ *Census of Pakistan,* 1951, Volume-8, P. 4/48

৩০ Delwar Hassan (Edited), *পূর্বোক্ত*, পৃ. 87

৩১ ঐ. P. 280

৩২ Stanley A. Kochanek, op.cit, P. 92

৩৩ Delwar Hassan (Edited), op.cit P.97

৩৪ পূর্ববাংলায় পাঞ্জাবী, পাঠান, বেলুচ, সিন্ধি সকলেই পাকিস্তানী হিসেবে পরিচিত ছিল। অন্যদিকে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যে সকল ভারতীয় ব্যবসায়ী অভিবাসী হয়ে পাকিস্তানের করাচীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তারা মেমন, (Memons) বোহরা (Bohras) নামে পরিচিত ছিল। পূর্ববাংলায় এরাও পাকিস্তানী ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু যে সকল ব্যবসায়ী কলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পূর্ববাংলায় চলে আসে কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক থেকে পাকিস্তানের সাথে অধিক সাযুয্যপূর্ণ তারা অবাঙালি ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

৩৫ Stanley A. Kochanek, *op.cit*, P, 55

৩৬ অ্যান্থনী মাসকারেনহাস, *দ্যা রেপ অব বাংলাদেশ*, (বাংলা অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, ঢাকা, পপুলার পাবলিসার্স, ২০১৪, পৃ. ৩১-৩২

৩৭ আবুল কাশেম খান ১৯০৫ সালে চট্টগ্রামের মোহরায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে আইনে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে কলকাতা আইকোর্টে আইন পেশা শুরু করেন। ১৯৩৫ সালে মুন্সেফ নিযুক্ত হন। এ কে খানের শশুর আবদুল বারী চৌধুরী বার্মায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৯৪৩ সালে এ কে খান চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি ঠিকাদারী করে প্রচুর অর্থ আয় করেন। তিনি ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে পূর্ববাংলায় বহু সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগের মনোনয়নে ভারতে কনষ্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর সদস্য মনোনীত হন। তিনি ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের সামরিক শাসক মুহম্মদ আইয়ুব খান সরকারে শিল্প বিদ্যুৎ এবং পূর্ত মন্ত্রী ছিলেন।পূর্ববাংলার ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। বিস্তারিত: মাহবুব আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস: কতিপয় বিশিষ্ট পরিবার*, প্রথম খণ্ড, নয়ালোক প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৬৬,পৃ.ম-এক থেকে ম-ষোল

৩৮ Delwar Hassan (Edited), *op.cit* P. 286

৩৯ জয়া চ্যাটার্জী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯১

৪০ ঐ, পৃ. ২৯২

৪১ সরকার ব্যবসায়ীদের গুদামে তল্লাশির নির্দেশ দেন। মাড়োয়ারীরা তখন একজোট হয়ে চাঁদা তুলে একটি ফান্ড গঠন করেন। এই টাকা দিয়ে লীগ মন্ত্রীসভার পতন ঘটানোর জন্য বেশ কিছু এমএলএ কে কিনে নেয়। এক ভোটে লীগ মন্ত্রীসভা পরাজয় বরণ করে। দেখুন-শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৪২ Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936- 1947*, The University Press Limited, Dhaka,1987,

৪৩ মাহবুব আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. পনর, ।।ম।। পরিবার

৪৪ ঢাকার অদূরে শাইন পুকুরে জন্মগ্রহণকারী ফজলুর রহমান ১৯৪৬ সালে রাজস্ব বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তান শাসনামলে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা, বাণিজ্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর দায়িত্ব পান (১৯৪৮-১৯৫১), ১৯৫১-৫৩ সালে বাণিজ্য শিক্ষা ও আইন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে আই আই চুন্দ্রিগর সরকারের বাণিজ্য অর্থ ও আইন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

৪৫ Stanley A. Kochanek, *op.cit*, P, 158

৪৬ *বঙ্গদূত* পত্রিকা, ১৩ জুন ১৮২৯ উদ্ধৃত, বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, বুক ক্লাব, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৪৩

৪৭ বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯২

৪৮ *ঐ*, পৃ. ১৬৫

৪৯ গোলাম কিবরিয়া ভুঁইয়া, *বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪৬

৫০ A. K. Nazmul Karim, *Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh*, Nawroz Kitabistan,second impression, dhaka, 1961, p. 138

৫১ বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৫

৫২ T. B. Bottomore, Karl Marx, *Rubel Maximillien, Selected Writings in Sociology & Social Philosophy*, Penguin Books, Middles,England, 1961,P. 198

৫৩ A. .F Pollard, *Factors in Modern History*, G. P. Putnam's Sons, New Yeark,1907,p. 41

৫৪ রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৭৯

৫৫ *Census of Pakistan*, 1951, East Bengal, Volume-8 P. 2-2

৫৬ *Census of Pakistan*, 1951, East Bengal, Volume-8 P. 2-3

৫৭ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *স্মৃতিকথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৭-১৮

৫৮ *Census of Pakistan*, 1951, East Bengal, Report and Tables P. 1-3

৫৯ Karl Marx, *Notes on Indian History, The First Indian war of Independence*, 1857- 1859, 1978 উদ্ধৃত- ড. গোলাম কিবরিয়া ভুঁইয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৬০ রংগলাল সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮২

৬১ প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, *পাক-ভারতের রূপরেখা*, শ্যামা প্রকাশনী, চাকদহ, নদীয়া, ১৩৭৫ বাংলা, পৃ. ৩৫৯

৬২ Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, University Press Limited, Dhaha, 1986, p. 80

৬৩ ১৯৪৯ সালের ২৮ জানুয়ারী প্রেরিত একটি রিপোর্টে বলা হয়- On 28.1.49 the subject adress a gathering of about 350 paddy reapers of Faridpur, Dacca, and Comilla, at Khulna. He also Led them in a Procession to the D.M.'s bungalow for demanding permits for carrying their earned paddy to their house. as the D.M. did not issue such permits, he advised the reapers not to visit Khulna again for reaping paddy.

২৮ জানুয়ারী প্রেরিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে-... He urged the students to agitate against the government of East Bengal on the issue of acute food crisis, abolition of Zamindari system. Sheikh Hasina. Secret Documents on Inteligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman, 1948-71, Vol. I (1948-1950), Hakkani Publishers, Dhaka, 2018, P. 152-153.

৬৪ প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬১

৬৫ হাসান হাফিজুর রহমান, (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রথম প্রকাশ , ১৯৮২, পৃ. ১৯০

৬৬ ঐ, পৃ. ২৮

৬৭ মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগঃ উত্থানপর্ব, ১৮৪৮-১৯৭০*, প্রথমা, ঢাকা, ১০১৮, পৃ. ১৪২

৬৮ হাসান হাফিজুর রহমান, (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭০

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্ম সমাজ ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্ম সমাজ ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক

বিভিন্ন ধর্মীয় ও নৃগোষ্ঠীর মানুষের আগমনের ফলে পূর্ববাংলায় কালের ধারায় একটি বহুত্ববাদী সহাবস্থানমূলক সমাজ বিকশিত হয়েছে। স্থলপথে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হতে যেসব মানবগোষ্ঠী ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন ভৌগোলিক কারণে তাঁদের অগ্রযাত্রা পূর্ববাংলায় এসে থেমে যায়। আবার সমুদ্র পথেও অনেকে পূর্ববাংলায় প্রবেশ করেছেন। আগন্তুক নরগোষ্ঠীর অনেকেই ধীরে ধীরে স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে একীভূত হয়ে যায়। অকাতরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে গ্রহণের ফলে ধীরে ধীরে পূর্ববাংলার সমাজ ব্যবস্থা বহুত্ববাদী রূপ পরিগ্রহ করে। ধীরে ধীরে এই জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা বাঙালি জাতির সাথে বিলীন হয়ে যায়। খাদ্যের সহজ যোগান, শান্ত ও নির্মল পরিবেশ, জীবনধারণের অনকূল আবহাওয়া এবং জলবায়ু এখানকার অধিবাসীদের শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে পূর্ববাংলায় বহুত্ববাদী সমাজ বিকাশের ধারা এবং অধিবাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এর আর্থ-রাজনৈতিক গতিধারা পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই এসকল সামাজিক উপাদান বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কী ধরনের প্রভাব রেখেছিল তা অনুসন্ধান করাও বর্তমান অধ্যয়নের অন্যতম লক্ষ্য। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত গবেষণার কালপর্ব হলেও পূর্ববাংলার সমাজ বিকাশের ধারাকে বুঝতে হলে আরও পেছন ফিরে তাকাতে হবে। সে কারণে খুব সংক্ষেপে এবং ধারাবাহিকভাবে এই সামাজের গঠন প্রক্রিয়াটি নিরীক্ষা করা হয়েছে।

সম্প্রদায় বলতে সাধারণত কোন অঞ্চল, দেশ বা সমাজে বসবাসকারী মানব গোষ্ঠীকে বুঝায়। কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নিজস্বতা বিশেষত, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব চেতনাই সাম্প্রদায়িকতা। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র বলেন,

> Communalism is the belief that because a group of people follow a particular religion they have, as a result, common social, political and economic interests. It is the belief that in India Hindus, Muslims, Christians and Sikhs form different and distinct communities which are independently and separately structured or consolidated.[১]

এ বিষয়ে ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার প্রায় একই ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মীয় মতবাদের রাজনৈতিক শোষণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২] উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে সাম্প্রদায়িক মতবিরোধের জন্ম নেয় যা অনেক সময় সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়। সমাজ বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ হলো নিম্ন রূপ–

> Communal conflict is a struggle of values or claims to status, power and scare resources, in which the aims of the conflicting parties are not only to gain desired values but also to neutralise or injure or eliminate their rivals.[৩]

কাজেই সম্পদ্রদায়গত চেতনার পেছনে রাজনৈতিক ক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এসকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ধর্মকে হয়ত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে ভিন্ন। কেননা কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার সহজ উপায় হলো ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগানো।

পূর্ববাংলায় অব্যাহতভাবে বিভিন্ন জাতি এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের আগমন ঘটেছে। পূর্ববাংলার ভৌগোলিক আকার যেমন বিকাশমান তেমনই বহিরাগত বিভিন্ন জাতির আগমণের কারণে এর সমাজও সর্বদা বর্ধিষ্ণু। অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী আর্যদের আগমণের পূর্বে পূর্ববাংলায় এক ধরনের অনার্য জাতির বসবাস ছিল।[৪] খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শনতকের জৈন সাহিত্যে এই অনার্য অধিবাসীদেরকে বুনো, অসভ্য জাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫] বৈদিক ধর্মের অনুসারী অনুপ্রবেশকারী আর্যরা স্থানীয় অধিবাসীদেরকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। জানা যায়, পূর্ববাংলায় আগত আর্যরা স্থানীয় অধিবাসীদের 'অপবিত্র' বিবেচনা করে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে বসতি স্থাপন শুরু করেন। এটি এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের প্রাথমিক সূচনা বলে ধারণা করা যেতে পারে। সময়ের সাথে সাথে মনস্তাত্ত্বিক বিভাজন থাকা সত্ত্বেও পেশাগত কারণে উভয় সম্প্রদায় একে অপরের কাছাকাছি চলে এসেছে। এই দুই সংস্কৃতি মিলে একটি সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির জন্ম হয়। একই সাথে তখন থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদ সমাজে জাতপাত, উঁচু-নিচু ইত্যাদি স্তর ভিত্তিক সামাজিক শ্রেণিরও সূচনা করে। অনেকেই মনে করেন কট্টর বর্ণভিত্তিক সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব দুই হাজার বছর আগে থেকে।[৬] এই বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থার মূলে প্রথম আঘাত আসে বৌদ্ধ ধর্মের তরফ থেকে। খ্রিস্টপূর্বাব্দ তৃতীয় শতক থেকে ৮ম শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মমত এ

অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গৌতম বুদ্ধের অহিংস মানবতাবাদী দর্শন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করতে সহয়তা করে।

সর্বশেষ ধর্ম ইসলাম আরবভূমিতে আবির্ভাবের শুরুতেই আরব বণিকদের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করেছিল। কালক্রমে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে পূর্ববাংলার সমাজ গঠিত হয়। এসকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা আবার নানা উপ-শ্রেণিতে বিভাজিত হয়ে পড়ে। বিভেদের মধ্যেও পূর্ববাংলায় বহুত্ববাদী ধর্মীয় সংস্কৃতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনা বিকশিত হয়েছে। দীর্ঘ কালের হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসনের উত্থান-পতনের যুগেও ধর্মীয় বহুত্ববাদ এবং সহাবস্থানমূলক সমাজব্যস্থা বাধাগ্রস্ত হয়নি।[৭] সুলতানী আমলে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌র শাসানামলে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর শিষ্যগণ রাস্তায় রাস্তায় নামসংকীর্তন করে বেড়াতেন। এতে নবদ্বীপের কাজী ক্ষুব্ধ হয়ে সংকীর্তন বন্ধ করতে আদেশ দেন। শিষ্যরা চৈতন্যদেবকে এ ঘটনা জানালে তিনি কাজীর বাড়িতে যান। কাজী বৈষ্ণব প্রচারক শ্রীচৈতন্যকে বললেন, 'দেখ, তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম সম্পর্কে আমার চাচা। সেদিক থেকে তুমি হলে আমার ভাগিনা'। এর পর তাঁরা বেদ, পূরাণ, কোরআন ইত্যাদি ধর্মীয় শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন।[৮] এই ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তৎকালীন সময়ে ধর্মীয় পরিচয় সামাজিক সম্পর্ককে বাঁধাগ্রস্ত করেনি। হিন্দুদের সামাজিক অনুষ্ঠান, বিবাহের বরযাত্রা ইত্যাদিতে মুসলমানরাও অংশগ্রহণ করতো। বৈষ্ণব সংকীর্তন অনুষ্ঠানে মুসলমানদেরও অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়।[৯] সপ্তদশ শতকে মোগল শাসনামলে বাংলা ভ্রমণকালে ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ার জেসুইট অগাস্টাইন খ্রিস্টানদের বড় বড় গির্জা দেখেছেন। সেখানে তাঁরা স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করতে পারেন বলে তিনি জানিয়েছেন।[১০] সেসময়ে ধর্মাচার পালনে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছিল না বলে জানা যায়। এসকল তথ্য পূর্ববাংলায় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সাক্ষ্য দেয়।

উনবিংশ শতকের কয়েকজন হিন্দু কবি-সাহিত্যিক তাঁদের লেখায় মুসলিম বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।[১১] তবে এগুলি বুদ্ধিবৃত্তিক লেখালেখির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এসকল লেখালেখি সাধারণ মানুষকে সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা দিতে পারেনি। পূর্ববাংলার অনেক কবি সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিরোধিতা করেছেন। কবি কায়কোবাদ তাঁর মহাশ্মশানে লিখেছেন,

আমরা উভয়জাতি হিন্দু মুসলমান
ভারতের প্রিয়পুত্র, তুচ্ছ স্বার্থ তরে
অন্ধ হ'য়ে, না বুঝিয়া বৃথা রক্তপাতে
দিন দিন ধ্বংসিতেছি শক্তি আপনার।[১২]

পূর্ববাংলায় বহু কবি, সাহিত্যিক ও মরমী সাধকের জন্ম হয়েছে যাঁদের দর্শন অসাম্প্রদায়িক মানবিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করেছে। বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিম[১৩] মরমী সাধক বাউল কবি ফকির লালন সাঁই[১৪] তাঁদের লেখায় মানব ধর্মের জয়গান গেয়েছেন। পূর্ববাংলার অনেক স্থানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে একই ধরনের লোকজ ধর্মাচার পালন করেন। ভাওয়াল অঞ্চলে সিদ্ধি মাধব নামক একটি শিলাখণ্ডে জাতিধর্ম নির্বিশেষে শ্রদ্ধাঘ্র নিবেদন করেন। এখানে হিন্দুরা বলিদান করে এবং মুসলমানরা মুরগী জবাই করেন।[১৫] অনুরূপভাবে মুসলমানদের পীর খিজির খাজা ও পীর বদরকে হিন্দুরা শ্রদ্ধা করে নানা ধরনের পূজা দেয়।[১৬] পাকিস্তান শাসনামলে কবি তালিম হোসেন একটি গানে লিখেছেন,

মানুষের ঘর বেঁধেছি হেথায় মানুষের সন্তান,
মিলেছি সাম্য-মৈত্রির নীড়ে হিন্দু-মুসলমান;
হেথায় জীবনানন্দে দীপ্ত চির মানুষের প্রাণ।[১৭]

উল্লেখ্য, কবি তালিম হোসেন পাকিস্তানী ভাবধারার একজন প্রচারক ছিলেন। পূর্ববাংলার যে সকল কবি-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবিগণ 'পাক বাংলা' সাহিত্য রচনা এবং বাংলাভাষার সংস্কার করে ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন কবি তালিম হোসেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এরকম মনোভাবপন্ন একজন ব্যক্তিও এ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ এটাই ছিল এ অঞ্চলের আবহমান ধারা।

উল্লেখ্য যে, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সকল হিন্দু সংস্কারবাদী আধ্যাত্মিক গুরুর আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের ভাবনাতেও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের দিকটি লক্ষ্য করা যায়। রামকৃষ্ণের শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ইসলাম ধর্ম থেকে প্রেরণা লাভ করেন। তাঁর মতে, "ইসলামের সহায়তা ছাড়া বেদান্তের তত্ত্বসমূহ, তা যতই চমৎকার ও বিস্ময়কর হোক না কেন, বিশাল সমাজের কাছে পুরোপুরি নিরর্থক। আমাদের নিজ মাতৃভূমির জন্য হিন্দুত্ব ও ইসলাম এ দুই মহান ব্যবস্থার সংযোগ অর্থাৎ বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামিক শরীরই হচ্ছে একমাত্র আশা"।[১৮] হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ একে অন্যের জীবন ব্যবস্থার সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বাঁধনে বাধা পড়ে গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য জনমিতিক তথ্য সহায়ক হতে পারে।

ব্রিটিশ শাসনামলে যে আদমশুমারি করা হয় সেখানে অধিবাসীদেরকে ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে বিন্যস্ত করা হয়। ১৮৭২ সালের প্রথম আদমশুমারিতে জানা যায় যে, পূর্ববাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।[১৯] এই শুমারির তথ্য এ অঞ্চলে বিভেদ সৃষ্টির জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। পূর্বে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে এ ধরনের সংখ্যাতত্ত্ব এখানকার মানুষের ভাবনায় স্থান পায়নি। নিচের সারণিতে পূর্ববাংলার ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

সারণি-৪.১ : বিভিন্ন আদমশুমারির তথ্যানুযায়ী পূর্ববাংলায় বিভিন্ন ধর্মের জনসংখ্যার শতকরা অনুপাত[২০]

লোকগণনার সন	মুসলিম	হিন্দু	অন্যান্য
১৯০১	৬১.৩৪	৩১.৪৬	৭.২০
১৯১১	৬১.৬৭	৩১.২৯	৭.০৪
১৯২১	৬৪.৪৯	৩১.৪৮	৪.০৩
১৯৩১	৬৮.৩৮	২৮.৮৬	২.৭৬
১৯৪১	৭০.০৪	২৮.০০	১.৩৬
১৯৫১	৭৬.৮৫	২২.০৪	১.১১
১৯৬১	৮০.৪৩	১৮.৪৫	১.১২

উপরের সারণিতে দেখা যায়, হিন্দু জনসংখ্যা ১৯০১ সালের তুলনায় ১৯১১ সালে ০.১৭ শতাংশ কমেছে, ১৯১১ সালের তুলনায় ১৯২১ সালে ০.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯২১ সালের তুলনায় ১৯৩১ সালে২.৬২ শতাংশ, ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে .৮৬ শতাংশ, ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৫১ সালে ৫.৯৬ শতাংশ এবং ১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে ৩.৫৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ দেশভাগের পরবর্তী আদমশুমারিতে হিন্দু জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে। পাকিস্তান শাসনামলে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা সহাবস্তানমূলক সম্পর্কে চিড় ধরতে শুরু করে। সন্দেহ, অবিশ্বাস, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, একে অন্যের প্রতি আস্থাহীনতার কারণে হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে চলে যাওয়ার কারণে হিন্দুদের সংখ্যা কমে যায়। এ পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টকোণ থেকেও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মিথস্ক্রিয়ার প্রভাব সম্পর্কে জনাটাও জরুরি।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন আদিবাসী তথা নৃ-গোষ্ঠীর উপস্থিতি এই সমাজকে বৈচিত্র্যময় করেছে। এখানকার অধিকাংশ মানুষ বাঙালি। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে মগ, চাকমা, মং, বোমাং, মারমা, ত্রিপুরা, কুকি, খুমী, লুচি, বনযুগি, ওঁরাও, রিয়াং ইত্যাদি এবং আদিম জাতির মধ্যে, সাঁওতাল, কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চন্ডাল, মালো, উল্লেখযোগ্য।[২১] এভাবে বিভিন্ন ধর্ম ও নৃ-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে এখানে বহুত্ববাদী সমাজ বিকশিত হয়েছে।

তবে ভাষাগত দিক থেকে পূর্ববাংলার সমাজ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সমসত্ত্বতা (homogeneity)। ভাষা এ ধরনের সমাজ গঠনে প্রাথমিক সোপান হিসেবে কাজ করেছে। কিছু নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায় ছাড়া এ অঞ্চলের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী বাংলাভাষায় কথা বলে। ধর্ম মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। হেনরী বেভারিজ বরিশাল অঞ্চলের জনজীবন সম্পর্কে জরিপ করে দেখতে পান যে, ঐ অঞ্চলের মানুষেরা নৃ-তাত্ত্বিক ও জাতিগত পরিচয়কে ধর্মীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে লালন করেন।[২২] আসলে এটি সমগ্র পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। অনেকে মনে করেন, বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান উভয় ধর্মে একধরনের গূঢ় অর্থপূর্ণ ভক্তিমূলক ঐক্য নিহিত রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, ধর্মান্তরের মাধ্যমে পূর্ববাংলার সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের বিকাশ। যে সকল ভ্রাম্যমাণ সুফি সাধকগণ এই ধর্মান্তর প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক প্রথা ও ধর্মীয় সংস্কৃতির কিছু উপাদান গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এটা খুব একটা বিরল ছিল না যে, বাংলার গ্রামে হিন্দু-মুসলিম উভয়েই একই সাধুর আশ্রম অথবা পীরের মাজারে মনবাসনা পূরণের জন্য প্রার্থনায় অংশগ্রহণ অথবা মানত করছেন।[২৩] পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ সহনশীল এবং গোঁড়ামীমুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি রীতি পদ্ধতি ছিল প্রায় অভিন্ন। হিন্দু মুসলমান সকলেই শাড়ি, লুঙ্গি, ধূতি, পাঞ্জাবী ইত্যাদি পোশাক পরিধান করতেন। পোশাক ও খাবারের সংস্কৃতিও মানুষের মধ্যে একটি ঐক্যের সূত্র হিসেবে কাজ করে।

অধিবাসীদের ভৌগোলিক অবস্থানও পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বাপর আদমশুমারিতে অধিবাসীদের ভৌগোলিক বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায় পূর্ববাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ গ্রামীণ সমাজভুক্ত। শহরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই আবার হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী শহরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ৬৭ শতাংশই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।[২৪] গ্রামে বসবাসকারী মুসলিম এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক মর্যাদা এবং পেশা প্রায় অভিন্ন ছিল। শহরে বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিল বিত্তশালী। ভূমির মালিকানা, উচ্চপদের চাকুরী, বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অধিকারেই ছিল। মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী হলেও দেশের অর্থনীতির খুব সামান্যই মুসলমানদের অধিকারে ছিল।[২৫] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পূর্ববাংলা ভ্রমণ করে তৎকালীন সমাজের একটি চিত্র প্রদান করেন।[২৬] তৎকালীন সময়ে জেলা, মহকুমা, নগর প্রশাসন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। কমিশনার, প্রধান সদর আমিন, সদর আমিন, এডিশনাল প্রধান সদর আমিন, ডেপুটি কালেক্টর, সদর মুন্সেফ, এডিশনাল সদর মুন্সেফ, মুন্সেফ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রেট, আদালতের পেশকার, অনুবাদক, কালেক্টরি সেরেস্তাদার, সেরেস্তাদার, কালেক্টরী মহাফেজ, হেড কেরাণী, সিভিল ও সেসন জজ, এডিশনাল সিভিল ও সেসন জজ, জজ, উকিল, মোক্তার, সল্ট এজেন্ট, সল্ট সুপ্রেন্ট্যান্ট, সার্জন, সাব

এসিসষ্ট্যান্ট সার্জন, ডাক্তার, ডিস্পেন্সারী প্রধান, কম্পাউন্ডার, জেলার প্রধান ভূম্যধিকারী, এসব পেশা বা পদাধিকারীগণ প্রায় সকলেই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। কালে ভদ্রে এসব পদে মুসলমানদের দেখা মিলত। এছাড়া বিভিন্ন, আড়ং, হাট, বাজার ও নগরের ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররাও ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদক শ্রেণির লোকেরা ছিল মুসলমান অথবা নিম্ন বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এসকল পেশার কর্মপ্রকরণই একে অন্যের সাথে এক ধরনের নির্ভরতার সামাজিক সম্পর্ক তেরী করে যা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূমির গঠন, একই ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, প্রাকৃতিক সম্পদের অংশীদারীত্বমূলক চেতনা, গ্রামপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে সহাবস্থানের সংস্কৃতি গড়ে তোলে।[২৭] এখানে জাত-পাত, সম্প্রদায় ও শ্রেণিচরিত্রের উর্ধ্বে এমন একটি সম্পর্ক কাঠামো তৈরি হয় যা সমাজকে চলমান রাখতে অত্যাবশ্যকীয়। ধর্মীয় ভাবালুতা এখানে ছিলনা তা বলা যাবে না তবে তা কোনভাবেই আর্থ-সামাজিক চলমানতাকে বাঁধাগ্রস্ত করেনি। যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পূর্ববাংলা ভ্রমণকালে নিজ সম্প্রদায়ের মর্যাদার দিক এবং অন্য সম্প্রদায়ের নেতিবাচক দিকগুলি খুব উৎসাহ সহকারে উল্লেখ করেছেন।[২৮] এসব কথার মাধ্যমে নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরার এক ধরনের প্রবণতা ছিল বটে। তবে এর মধ্যে কোন প্রকার ধর্মীয় উস্কানী লক্ষ করা যায় না।

অনেকেই মনে করেন, ব্রিটিশ নীতিই ভারতবর্ষে সৌহার্দ্যপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের সংস্কৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে শুরু করে। ব্রিটিশ শাসনামলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।[২৯] সুভাসচন্দ্র বসু মনে করেন মুসলিমরা বহিরাগত হলেও তারা এদেশের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ শাসনামলে ভারতীয়রা প্রথম অনুভব করলেন যে, তারা বিদেশী শাসনাধীনে রয়েছে।[৩০] বিপান চন্দ্র মনে করেন, ব্রিটিশ শাসননীতিই মূলত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা উদ্ভবের জন্য দায়ী।[৩১] ব্রিটিশরা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলিম ঐক্য ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের প্রধান অন্তরায়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হিন্দু-মুসলিম বিরোধ দৃশ্যমান করে ফেলে। কোলকাতার হিন্দু নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা শুরু করেন কিন্তু পূর্ববাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করেন। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণায় বাংলার নেতৃবৃন্দ বিশেষত কলকাতাকেন্দ্রিক নেতারা প্রশাসনিক কারণে দেশ বিভাগ একান্তই প্রয়োজন হলে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে আনার দাবি জানান। হিন্দু নেতৃবৃন্দ মনে করেন দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলায় হিন্দুরা নিজ দেশে বিদেশী হিসেবে বিবেচিত হবে।[৩২] ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের দিন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী নেতৃবৃন্দ রাখিবন্ধন, অনশন দিবস, ধর্মঘট, নগ্নপদ যাত্রা, গঙ্গাস্নান ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহসহ অভিজাত মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিম মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হয়।[৩৩] পূর্ববাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে ময়মনসিংহের সুর্যকান্ত আচার্য, অনাথবন্ধু গুহ, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশ চন্দ্র চ্যাটার্জী, ঢাকার উকিল আনন্দচন্দ্র রায়, ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রমুখ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলাকালে সরকার মুসলমানদেরকে সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা দেয়। মুসলিম অভিজাতদের খুশি করার জন্য সাম্প্রদায়িক ভোটদানের ব্যবস্থা করে। ১৯০৯ সালে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রবর্তন হিন্দু-মুসলিম বিভাজন কাঠামোবদ্ধ হয়। এই প্রথা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনস্তত্ত্বে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে।[৩৪] লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে মূলত ঐক্যবদ্ধ বাঙালিকে শক্তিহীন করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করতে চেয়েছিল। অবশেষে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও হিন্দু এবং মুসলমান মানসে বিভেদের চিহ্ন থেকে যায়। এই প্রশাসনিক বিভাগকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মনে অবচেতনভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার জন্ম নেয়। বঙ্গবঙ্গের মাধ্যমে মানচিত্রের রদবদল জনগোষ্ঠীর মানসপটেও রেখাপাত করে যায়, যা পরবর্তী সাম্প্রদায়িক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। ব্রিটিশরা কৌশলে ধর্মকে সমাজ ও রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়ে দেয়।

ব্রিটিশ শাসননীতি বাংলার দীর্ঘদিনের ঐক্যবদ্ধ অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থার মূলে চিড় ধরিয়ে দেয়। সম্প্রদায়গত চেতনা সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হতে থাকে। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান এবং সহনশীলতার জায়গা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হতে থাকে। বাধাহীনভাবে ধর্মাচার পালনের যে সংস্কৃতি বাংলার মানুষ লালন করতো তা ঠুনকো অজুহাতে সহিংসতায় রূপলাভ করতে শুরু করে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক অনৈক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩২ সালে বাংলায় সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ (Communal Award in Bengal) সাম্প্রদায়িক বিভেদকে ত্বরান্বিত করে।[৩৫] বলা যেতে পারে এটি ছিল অধিবাসীদেরেকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করণের সরকারী দলিল। ব্রিটিশ সরকার এমনিতেই নানান কৌশলে হিন্দু-মুসলিম বিভেদকে উৎসাহিত করছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় তাঁদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। এভাবে সরকারের বিভিন্ন কূটচালে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ঠুনকো অজুহাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতে শুরু করে। যুগ যুগ ধরে লালিত একে অন্যের ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা কমে যেতে থাকে। ১৯২৫ সালে কোরবানীর ঈদকে কেন্দ্র করে খিদির পুরে এবং ১৯২৬ সালে 'গোরক্ষা' ও 'সুদ্ধি' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলকাতা শহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। কলকাতা দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় একই বছর পূর্ববাংলার পাবনার বিভিন্ন থানা, হিন্দু অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামে এবং ঢাকা,বরিশাল, পটুয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। ১৯২৭

সালে পিরোজপুরে দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এছাড়া একই বছর নোয়াখালী, বগুড়া, নদীয়া, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চলেও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগের 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন'[৩৬] দিবসে হঠাৎ করেই দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। ব্রিটিশ নথিতে দাঙ্গার জন্য হিন্দু মুসলিম উভয় পক্ষকে সমানভাবে দায়ী করা হয়। একই সাথে এই রিপোর্টে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দাঙ্গা সংগঠিত করার জন্য দায়ী করা হয়। এই রিপোর্টে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে'র কর্মসূচি প্রতিরোধে হিন্দুদের রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়াসহ বিভিন্ন কর্মতৎপরতার বিয়টি উঠে এসেছে। তবে দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায় সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।[৩৭] কলকাতার মহাদাঙ্গার পরে ভারতভাগ ত্বরান্বিত হয়েছিল। এই দঙ্গার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে বড় ধরনের চিড় ধরে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সৌহার্দপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঁধাগ্রস্থ হয়। একদিন আগেও বাঙালি পরিচয়ই যাঁর কাছে বড় ছিল হঠাৎ করেই তাঁর কাছে হিন্দু কিংবা মুসলিম পরিচয় মূখ্য হয়ে গেল। মানবতাই যার প্রধান ধর্ম ছিল সে-ই কিনা একদিন ভিন্নধর্মী হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠতে একটুও কুণ্ঠিত হলো না। পাড়ার যে ছেলেরা একসাথে সংঘ সমিতি অথবা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করে বেড়াত তাঁরাই হিন্দু, মুসলিম আলাদা হয়ে নাটক মঞ্চস্থ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। বহু ক্ষতের সৃষ্টি করে দাঙ্গা বন্ধ হলেও স্কুল খোলার পর অনেকে তাঁর দীর্ঘদিনের সহপাঠীকে খুঁজে পেল না। এ বি এম হোসেন লক্ষ্য করেছেন যে, পার্টিশনের পরপরই হিন্দু বন্ধুরা দেশ ছেড়ে চলে গেল। আশা ছিল হয়তো আবার কোন সময় দেখা হবে। অনিল যাবার সময় বলেছিল, 'হয় তো আবার কোন সময় দেখা হবে।' কিন্তু দেখা আর হয়নি।[৩৮] কলকাতা মহাদাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় বিহার এবং পূর্ববাংলার নোয়াখালীতেও ভয়াবহ দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশভাগ ত্বরান্বিত হলো।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি বরং তা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আরও নাজুক করে তোলে। হিন্দু-মুসলিম উভয়ই দেশভেদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হল। নিজের জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে ধর্মভিত্তিক আবাসভূমির সন্ধানে পাকিস্তান হতে হিন্দু সম্পদায়ের লোকেরা হিন্দুস্তান আর ভারত থেকে মুসলিমরা পাকিস্তানে পাড়ি জমাতে শুরু করে। দেশভাগকে কেন্দ্র করে মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘটে গেল এক অভূতপূর্ব ঘটনা যা আগে কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। অবশ্য স্বাধীনতা উদযাপনের দিনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রচেষ্টাও লক্ষ করা গেল। বন্দেমাতরম, জয়হিন্দ, আল্লাহো আকবর, স্বাধীন ভারত কি জয়, হিন্দু মুসলমান এক হোক, ভাইয়ে ভাইয়ে নেহি লড়েঙ্গে ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত হলো কলকাতা। ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে পূর্ববাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন হিন্দু-মুসলিম একতাবদ্ধ হওয়ার আহবান জানালেন।[৩৯] পূর্ববাংলার মফস্বল শহর, গ্রামগঞ্জ, হাটবাজার সর্বত্র আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। দৃশ্যত সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এ দিনটি উদযাপন করে।[৪০] তবে পূর্ববাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একটি চাপা দুঃখবোধ বিরাজ করছিল। দেশভাগের পর ১৯ আগস্ট ছিল

প্রথম ঈদের দিন। এই ঈদের দিনে ঢাকা মহানগরীতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মহামিলন ঘটে গেল। এদিন নগরীতে দীর্ঘ এক মাইলব্যাপী হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত ঈদ শোভাযাত্রা বের হয়। এই মিছিলে পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন, ঢাকার নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ বাহার, কংগ্রেস কমিটির ধীরেন্দ্র পোদ্দার, ফরোয়াড ব্লকের লীলা নাগ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।[৪১] বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে উভয় দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করার চেষ্টা থাকলেও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা থামানো যায়নি। ডা. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যয় পূর্বেই বিবৃতির মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তার বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।[৪২] হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও বিভক্ত বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান কারও মঙ্গল হবে না বলে মত প্রকাশ করেছিলেন।[৪৩] দেশভাগ সাম্প্রদায়িক হিংসা বাড়িয়ে দেয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ভারত থেকে মুসলমানদের পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের ভারতে গণঅভিবাসন হিন্দু-মুসলিম বিভাজনরেখা আরও স্পষ্ট করে তোলে। দেশভাগের ফলে ৭২,২৬,৫৮৪ জন (পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৮.৯ শতাংশ) মোহাজের পাকিস্তানে পাড়ি জমায় এদের মধ্যে পূর্ববাংলায় যায় ৬,৯৯,০৭৯ (পূর্ববাংলার মোট জনসংখ্যার ১.৭ শতাংশ) জন।[৪৪] অপরদিকে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ৩৫ লক্ষ উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বঙ্গে পাড়ি জমায়।[৪৫] বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পূর্ববাংলা থেকে যারা পশ্চিম বঙ্গে গিয়েছিল তারা প্রায় সকলেই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা পূর্ববাংলায় গিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মুসলিম। এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার শ্রেণি চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই হিন্দু-মুসলিম বিভেদের গভীরতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে জনবিন্যাসের শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলিম ফ্যাক্টরকে কাজে লাগিয়ে দেশভাগের ফলাফল হয়েছিল ভয়াবহ। দেশভাগের ফলে ১৯৪৭ সালে জাতিগত দাঙ্গায় কত প্রাণহানি ঘটে তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। অনেকেই মনে করেন সেসময় ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ লোকের প্রাণহানী ঘটেছিল। প্রায় ১ কোটি ৫০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।[৪৬] পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য এ অঞ্চলের মানুষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু পূর্ববাংলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা এবং আস্থাজনিত সংকট প্রবলভাবে দেখা দেয়। ফলে পূর্ববাংলার হিন্দুরা অব্যাহতভাবে নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চলে যেতে থাকে।

১৯৪৭ সালের ১১ আগষ্ট গণপরিষদের উদ্বোধনী ভাষণে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় ইত্যাদি মানসিক বিভেদ আর থাকবে না।[৪৭] এমন কি সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষের জন্য পার্টিকে উন্মুক্ত করার জন্য ১৯৪৭ সালে জিন্নাহ মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তন করে 'ন্যাশনাল লীগ' করার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন।[৪৮] ডন-এর সম্পাদকীয়তে জিন্নাহর এই উদ্যোগকে 'পলিটিক্যাল রিএ্যাডজাস্টমেন্ট' বলে আখ্যা

দেয় যা সংখ্যালঘুদের আস্থা ফেরাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতো বলে উল্লেখ করে।[৪৯] কিন্তু জিন্নাহর এই ভাবনা বাস্তব রূপ লাভ করেনি। সাম্প্রদায়িক ভাবনা থেকে যে রাষ্ট্রের জন্ম সেখানে অসাম্প্রদায়িকতার কথা লোক দেখানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না তা অচিরেই প্রকাশ পেয়ে যায়। মুসলমানদের আবাসভূমি হিসেবে যে রাষ্ট্রের জন্ম এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনাতেই শাসকগোষ্ঠীর যে রূপ প্রকাশ পেতে থাকে সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ জন্মভূমিকে আপন দেশ হিসেবে ভাবতে পারেনি। যে দেশে তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা সেটিকে কেন জানি হঠাৎ করে অচেনা মনে হতে লাগে। পূর্ববাংলায় শাসকগোষ্ঠীর নীতিও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শঙ্কার সৃষ্টি করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে নামমাত্র মূল্যে সহায় সম্পদ বিক্রি করে অথবা সব কিছু ফেলে রেখে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমায়। দেশভাগ কার্যকর হওয়ার আগে থেকেই তাদের সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ভারতের 'নিরাপদ স্থানে' স্থানান্তর করতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাস নাগাদ এর পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি টাকা। পূর্ববাংলা বা পাকিস্তান থেকে ভারতে যাওয়া অভিবাসীরা ছিল ধনী পক্ষান্তরে ভারত থেকে পাকিস্থান তথা পূর্ববাংলায় আগতরা ছিল অস্বচ্ছল।[৫০] ফলে পূর্ববাংলায় অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়।

১৯৪৮ সালের ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত 'ইস্টবেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলী'-র প্রথম অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন এবং সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগের বিষয়টি আলোচিত হয়। প্রাদেশিক আইন সভার কংগ্রেস দলীয় এম এল এ ড. প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়, জনাব প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, জনাব বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী, জনাব জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মিসেস আশালতা সেন, জনাব অমূল্য চন্দ্র অধিকারী, জনাব সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস প্রমূখ সদস্যগণ হিন্দুদের প্রতি নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের বর্ণনা তুলে ধরেন। আলোচনার শুরুতেই কংগ্রেস দলীয় সদস্য ড. প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায় উল্লেখ করেন,'আমরা ইংরেজ সরকারের কল্যাণে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এলেও কংগ্রেস হিন্দু মুসলিম পার্থক্য করে না'। তিনি উল্লেখ করেন, সরকারের গৃহীত নীতির ফলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। 'কায়েদে আজম ফান্ডের' নামে বিনা রশিদে প্রভাবশালীদের চাঁদা আদায়, বন্দুকের লাইন্সের জন্য খেয়ালখুশী মত অর্থদাবি, একই চাঁদা সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসার কর্তৃক একাধিকবার আদায় করা, নিয়মনীতি না মেনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর রিকুইজিসন করা ইত্যাদি কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা চৌদ্দ পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত বাস্তু ভিটা, বহু পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত শ্মশান ভূমি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বিনা কারণে সখ করে কেউ তার ভিটা মাটি ছেড়ে যায় না। স্থানীয় অফিসাররা মনে করেন, মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হয়েছে। হিন্দুরা অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকতে পারলে থাকুক না থাকতে পারলে চলে যাক। হিন্দুরা চলে গেলে বিনা পয়সায় ঐ জমি তারা পাবে। এটা ছিল অনেকের বিশ্বাস। তবে গুহ রায় মনে করেন, গ্রামের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বিরোধ বাধাচ্ছে অফিসার আর মন্ত্রী মন্ডলীর কর্মচারীরা। প্রভাষ চন্দ্র লাহিড়ী বলেন, "সরকার দুইটা, একটা নাজিম উদ্দিন সাহেবের

সরকার অন্যটা 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড' সরকার। এর মধ্যে 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড' সরকার অধিক শক্তিশালী। তাদের ইঙ্গিতে ঢাকায় জন্মাষ্টমী মিছিল হয়নি। রাজশাহী এবং নাটোরে সরস্বতী পূজার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, সংখ্যালঘুদের বন্দুক সিজ করা হচ্ছে"।[৫১]এই আলোচনায় অংশ নিয়ে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, অনেকে দেশ ত্যাগ করে সর্বস্বান্ত হচ্ছে, হাজার হাজার টাকার সম্পত্তি দুইশ/তিনশ টাকায় বিক্রি করছে। এমন ভুল কেউ করবেন না। আসুন, আমরা একত্রে মিলে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করি।...হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই মনে করুন, সমস্ত বিরোধ চুকিয়ে ফেলুন। কংগ্রেসের হিন্দু এম এল এ'র অভিযোগোর প্রতিবাদে অনেক মুসলিম সদস্য পাল্টা বক্তব্য রাখেন। জনাব আবদুস সবুর খান, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব মজিবুর রহমান প্রমুখ সদস্যরা বলার চেষ্টা করেন যে, কলকাতায় মুসলমানদের সাথে যেরূপ ব্যবহার করা হচ্ছে সে তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে কিছুই হয়নি। উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা পাল্টাপাল্টি তুমুল বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। হিন্দু মুসলিম বিতর্কের শেষ হয় না।

১৯৪৯ সালের প্রাদেশিক আইন সভার কার্যবিবরণীতেও সংখ্যালঘু বিতর্ক স্থান পায়। মি.জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, "একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি না।... হিন্দুদের কথা উঠলে গভর্নমেন্টের পক্ষে বলা হয় তাদের প্রতি উদার আচরণ করা হচ্ছে। কিন্তু কোন হিন্দু এই রাষ্ট্রে উদার আচরণ দাবী করে না, সমান আচরণ দাবী করে।... একদল লোক কথায় কথায় হিন্দুদের 'ফিপথ্ কলামিস্ট' বলে থাকে এবং অবিশ্বাস করে। এতে রাষ্ট্রের মঙ্গল হবে না"। জনাব মনোরঞ্জন ধর অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সমস্ত কিছু দেখার আবেদন জানান।[৫২] লক্ষণীয় যে, আইন সভার সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য তৈরি হয়। মুসলিম লীগের সমর্থকরা সরকারের পক্ষে অন্ধভাবে ছাফাই গাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। পছন্দক্রমের সুবিধা নিয়ে হিন্দু অফিসার গেল ভারতে আর মুসলিম অফিসাররা এলো পূর্ববাংলায়। এর ফলে তখনও যেসকল সাধারণ মানুষ জন্মভূমির মায়া আঁকড়ে শেষ পর্যন্ত থেকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সরকারি দপ্তরগুলোতে তাঁদেরকে দেখভাল করার মত যথেষ্ঠ পরিমাণ প্রতিনিধি রইল না।

সরকার ও মুসলিম লীগের নীতির বিরুদ্ধে নবগঠিত বিরোধী দলগুলো সোচ্ছার হতে শুরু করে। ১৯৫০ সালের শুরুতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান শাসনতন্ত্র রচনার যে মূলনীতি ঘোষণা করেন, তাতে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা হয় এবং পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের অতিরিক্ত মর্যাদা প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো হয়। কিন্তু পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দাবী করে। নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, যে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে তাতে পাকিস্তানে 'ফেডারেল' ব্যবস্থা, পূর্ণ গণতন্ত্র, পূর্ব ও পশ্চিম নিয়ে দুটি ইউনিট এবং পূর্ণ

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছিল। এছাড়াও সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছিল।[৫৩] পূর্ববাংলার ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন বানচাল এবং ঢাকার ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ অবাঙালিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো হয়। এই দাঙ্গা রোধে প্রগতিশীল ছাত্র, শিল্পী-সাহিত্যিকরা এগিয়ে আসেন। শান্তি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে এবং ধর্মান্ধতার বিপক্ষে জনমত গড়ে ওঠে। ১৯৬৪ সালের আগে ঢাকায় আর সম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। তবে ১৯৬৪ সালে যে দাঙ্গা হয় সেটির জন্য দায়ী ছিল অবাঙালীরা।[৫৪] পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কখনোই প্রশ্রয় দেয়নি। ১৯৬৪ সালেও দাঙ্গার সময়ও সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ মিলে দাঙ্গা প্রতিরোধে পাড়ায় মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।[৫৫] সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভূমিকা সব সময়ই ইতিবাচক ছিল। আসলে দেশভাগের পর আগত অবাঙালি মুসলিম এবং স্থানীয় মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করে হিন্দুদের বিতাড়ন করে তাদের সম্পদ হস্তগত করার জন্য এধরনের পরিস্থিতি তৈরি করত তার বহু নজীর রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ইন্ধনও পরিস্থিতি জটিল করে তুলতে ভূমিকা রেখেছিল বলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক নেতা মতামত প্রদান করেছেন।[৫৬] সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রশ্নে সরকারের রহস্যজনক নিরবতা স্থানীয় পর্যায়ে স্বার্থান্বেষী মহলকে হিন্দুদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন, আক্রমণ এবং সহায় সম্পদ কেড়ে নিতে উৎসাহিত করেছে। এসব কাজে স্থানীয় প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।

প্রাদেশিক আইন সভার ১৯৫০ সালে যে বিতর্ক হয় সেটি পর্যালোচনা করলে সরকারের সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রকাশিত হয়। সরকার দলীয় এমএলএ জনাব আবদুর রহমান বলেন, "আমাদের পাকিস্তান একটি ইসলামিক রাষ্ট্র। ইসলামের অনুশাসন অনুসারে এই রাষ্ট্র শাসিত হবে– Hindu should be true to Hindustan and Muslim Should be true to his religion. এখানে শুধু হ্যাট পরে ঘুরে বেড়ালে চলবে না। এ বিষয়ে হোম মিনিস্টারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইসলামের নীতি অনুসারে স্টেট চলবে"।[৫৭] ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যে খসড়া ম্যানিফেস্টো পেশ করা হয় সেখানেও ইসলামী জীবন দর্শনের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে গড়ে তোলার সংকল্প ঘোষণা করা হয়।[৫৮] কাজেই এসব ঘোষিত নীতি থেকে এ কথা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি সমান আচরণের পরিপন্থি। বরং সরকার কোন কোন মহল মুখে হিন্দুদের প্রতি সমান সুযোগ সুবিধার কথা বললেও ভিতরে ভিতরে হিন্দু বিদ্বেষী নীতি বাস্তবায়ন করতে থাকে তার অনেক নজীর রয়েছে।[৫৯] এভাবে সরকার সাম্প্রদায়িকীকরণের মাধ্যমে পূর্ববাংলায় দীর্ঘদিন

ধরে গড়ে ওঠা অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধ্বংস করার নীতি গ্রহণ করেছিল।

১৯৫০ সালের ২০ মার্চ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ববাংলায় এলে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। সেখানে হিন্দুদের প্রতি নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে। এই স্মারকলিপি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার, ধর্মান্তরকরণ, বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগ, লুটপাট, নরহত্যা, নারী ধর্ষণ ভীতি প্রদর্শন, নানা ধরনের গুজব সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে পূর্ববাংলার মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। স্মারকলিপির বর্ণনা মতে, দাঙ্গার ধরন ছিল হৃদয় বিদারক। হামলায় জীবন, সম্ভ্রম, সম্পদ, ধর্ম সব কিছুই আক্রান্ত হয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাড়ি ঘরে আক্রমণ, বাস, ট্রেন, স্টিমার, এবং বিমান যাত্রীদের ওপর আক্রমণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড, ভীতি প্রদর্শন, ধর্মান্তরকরণ ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এভাবে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বাড়ি-ঘর, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়ন করে সব কিছু দখল করে নেয়ার অভিযোগ আনা হয়। রাজশাহীর পুঠিয়া রাজবাড়ি, সাঁওতাল পল্লী, খুলনার বাগেরহাট, বরিশাল, ভান্ডারিয়া, হবিগঞ্জ, সিলেট, ঢাকা, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নারয়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি, সিতাকুন্ড, মুলাদী, বাকেরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা (কুমিল্লা), ইত্যাদি অঞ্চলের হামলার চিত্র স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়। কিছু কিছু জায়গায় পুলিশ, আর্মি এবং প্রশাসনের লোকেরাও হামলা, লুটপাট, নারী ধর্ষণে অংশ নেয় বলে সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়।[৬০]

স্বার্থান্বেষী মহল ঘোলা জলে মাছ শিকার করার জন্য কৌশলে বিভিন্ন মিথ্যা রটনা রটিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করে সহিংসতার সৃষ্টি করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন ঘটনার আংশিক সত্যতা থাকলেও সেটাকে অতিরঞ্জিত করে এবং কোন ক্ষেত্রে একেবারে মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে একে অপরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করত। পুরো ভারতবর্ষ জুড়েই এভাবে গুজবের রাজনীতি চলতে থাকে। 'ইস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেমব্লী'র সদস্য জনাব মজিবর রহমান বলেন, "আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে প্রতিদিন শতশত মুসলমান তাদের বাসস্থান ছেড়ে আসছেন। পূর্ববাংলার সরকার ও জনগণ শান্তি রক্ষার চেষ্টা করছেন। পূর্ববাংলা থেকে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে যাচ্ছেন তাঁরা যাওয়ার সময় একজন প্রতিনিধি রেখে যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা অপপ্রচার চালাচ্ছেন। স্টেটম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তারা স্লোগান দিচ্ছে, আমরা মরতে রাজি আছি, পূর্ববাংলা দখল করো, যুদ্ধের হুকুম দাও নেহেরু" ইত্যাদি।[৬১] অন্য দিকে ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে জানা যায় কয়েকজন যুবক ব্যান্ডেজ বাঁধা এক যুবকে নিয়ে বেলেঘাটায় মহাত্মা গান্ধিজীর বাসগৃহে উপস্থিত হয়ে ভীষণ চিৎকার শুরু করে। উত্তেজিত জনতা বাসায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে গোলযোগ শুরু করে। এর পর তথাকথিত আঘাত প্রাপ্ত লোকটির

ব্যান্ডেজ খুলে দেখা গেল যে তার শরীরে আঘাতের চিহ্নমাত্র নাই।[৬২] এভাবে অনেক স্বার্থান্বেষী মহল নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে হাঙ্গামা বাঁধানোর চেষ্টাও করে। এ বিষয়ে ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠি বিবরণে জানা যায়, "পূর্ববাংলার হিন্দুগণ অহেতুক কতকগুলি কারণে আতঙ্কিত হয়ে ক্রমাগত নানা অজুহাতে পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য স্থানে চলে যাচ্ছে। অবশ্য নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয়াবহ অবস্থার প্রতি লক্ষ করলে স্বভাবত একটি আতঙ্ক ও দুর্বলতা আসিয়া মানুষের মনকে বিচলিত করিয়া তোলে। অবশ্য অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্তনে এই সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। যাহারা পূর্ববাংলা হতে এসেছেন তাহাদের অধিকাংশই বিত্তশালী ও মধ্যবিত্ত। তাহাদের কল্পিত সন্দেহের আতিশায্যে তাহারা যখন বাস্তুভিটা ত্যাগ করে এসেছেন তখন তাহারা কি গরীব সর্ব্বহারাদের কথা ভেবেছেন? ...সুতরাং অতিরঞ্জিত মানসিক অশ্বস্তি, কাল্পনিক অত্যাচার কাহিনী প্রচার করিবার পূর্বে উভয় তরফেরই ভাবা উচিত তারা সত্যিই কি অতখানি বিপন্ন"?'[৬৩] সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বিনষ্টের মূলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। অবিশ্বাস সৃষ্টির পেছনেও একটি চক্র কাজ করছিল। ১৯৫১ সালে পূর্ববাংলার বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ইংরেজী, বাংলা ও উর্দু ভাষায় কিছু পোস্টার সাটানো হয়। একটি পোস্টারের পোশাকে একজনকে হিন্দু এবং অপরজনকে মুসলিম হিসাবে চিহ্নিত করে ক্যাপশনে মুসলিম ব্যক্তিকে হিন্দু ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে লেখা ছিল 'সাবধান! সে শত্রুর এজেন্ট হতে পারে। অন্য পোস্টারে একজন হিন্দু কান পেতে মুসলমানের কথা শোনার চেষ্টা করছেন। ক্যাপশনে লেখা রয়েছে 'সাবধানে কথা বলুন শত্রুরা শুনছে'।[৬৪] হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস একে অপর সম্প্রদায়ের থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। আর এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করে ঘোলা জলে মাছ শিকার করতে পাকিস্তান সরকারের মদদপুষ্ট একটি চক্র সক্রিয় ছিল।

১৯৫৫ সালে গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সরকারের দূরভিসন্ধির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "গত সাত বছর ধরে পাকিস্তান রাষ্ট্রে কি হয়েছে সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই। আমাদের নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দী ভারত ও পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য লড়াই করছিলেন। তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের একজন সদস্য। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রচারণার জন্য তিনি পূর্ব বাংলায় ভ্রমণে এলেন। আমরা ময়মনসিংহ জেলায় জনসভার আয়োজন করলাম। কিন্তু পূর্ববাংলার সরকার তাকে ঢাকায় আটকে রাখলেন এবং তাকে পূর্ববাংলা ছেড়ে চলে যেতে বলা হল"।[৬৫] হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মুসলীম লীগের সবচেয়ে জনবান্ধব নেতা যাঁর ছিল জনগণের সাথে গভীর সম্পর্ক। দুই বাংলার জনগণের উপর তাঁর ছিল গভীর প্রভাব। তিনি সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য জীবনের ঝুকি নিয়ে ভারতের দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চল ও পূর্ববাংলায় সফর করছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাঁর জনসম্পৃক্ততায় ভয় পেয়ে যান।[৬৬] পাকিস্তান সৃষ্টির পর গণবিচ্ছিন্ন তথাকথিত 'এলিট শ্রেণির'

লোকেরা ক্ষমতা দখল করে নেয় যারা চিন্তা চেতনায় ছিল সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। এরা মুখে যাই বলুন না কেন পাকিস্তানকে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বানাতে চেয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়।

পাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিতে কার্যকর এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রথম কার্যকর বিরোধী দল আওয়ামী-মুসলিম লীগ। নতুন রাষ্ট্রে ধর্মীয় উন্মাদনা এবং সরকারের দমন পীড়নের ভয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনা থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক নাম ধারণ করেই আওয়ামী লীগকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়।[৬৭] ১৯৪৯ সালে আওয়ামী-মুসলিম লীগের যে খসড়া ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করা হয় সেখানে অত্যন্ত সতর্কভাবে শব্দ চয়ন করতে হয়। ইসলামী ঐতিহ্য, রীতিনীতি, ইসলামের– আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপদান এবং পাকিস্তানকে 'দারুল ইসলাম' বা সত্যিকার মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে আওয়ামী-মুসলিম লীগ যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে বিষয়টি স্পষ্ট করতে হয়েছিল।[৬৮] এ থেকে ধারণা করতে অসুবিধা হয় না যে, অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার জন্য সময়টি অনুকূল ছিল না। সে কারণে সকল সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার সমান অধিকার শব্দগলো যুক্ত হলেও দলের গঠনতন্ত্রে সদস্যপদ শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।[৬৯] আওয়ামী লীগের ১৯৫৩ সালের কাউন্সিলে সংগঠনের অসাম্প্রদায়িকীকরণ প্রসঙ্গে বিতর্ক হয়। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার সংগঠনের সভাপতি আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ওপর ন্যস্ত করা হয়। অবশেষে ১৯৫৫ সালের কাউন্সিলে দলের অসাম্প্রদায়িকীকরণ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবীর অনুকূলে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উপস্থিত প্রায় সাতশ কাউন্সিলরের মধ্যে পাঁচজন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।[৭০] পরবর্তী সকল কাউন্সিল অধিবেশনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ছিল সুস্পষ্ট। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির পদ শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ করা হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি একমাত্র আওয়ামী লীগ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে।[৭১] উল্লেখ্য যে, ৮৬ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভোটে সংখ্যালঘু রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও 'পাকিস্তান মুসলিম মিল্লাতের' প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান জুম্মার নামাজে ইমামতি করবেন সে কারণে রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম হওয়া বাঞ্চনীয় এই যুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকে কোন রাষ্ট্রপ্রধান ইমামতির দায়িত্ব পালন করেননি। এ থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে অধিবাসীদের ধর্মীয় অনুভূতিকে হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিল। কেননা, সংবেদনশীল এই বিষয়ে বিরোধিতা করলেও তা সহজে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করা যায়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে জন্ম নেয়া ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে গণতান্ত্রিক যুবলীগ (১৯৪৭), পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ (১৯৫১), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (১৯৫২), পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতন্ত্রী দল (১৯৫৩) অসাম্প্রদায়িক চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেও খুব সামান্যই ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়।'মুসলিম' শব্দ যুক্ত থাকায় প্রথম দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের ব্যাপারে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ আগ্রহী ছিল না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী দল কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি (ইউপিপি), সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন (এসসিএফ) মিলে ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠন করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে বিরোধী জোট যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় পূর্ববাংলায় পরবর্তী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ইতিহাসকে প্রভাবিত করে। নতুন দেশে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আত্মপরিচয় এবং অস্তিত্ব সংকটে ভুগতে থাকে। রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের যে নীতিমালা ঘোষিত হয় সেখানে 'ইসলাম' 'মুসলিম' 'পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ' 'ইসলামী নীতি' রাষ্ট্রের প্রধান 'মুসলিম' 'জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব' ইত্যাদি শব্দ সন্নিবেশ করার উদ্যোগে হিন্দু সম্প্রদায়ের লেকেরা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ে। এছাড়া সংবিধানে হিন্দুগণ 'পৃথক নির্বাচন' ব্যবস্থার পরিবর্তে যুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা, চাকুরিতে ২৩ শতাংশ সংখালঘু কোটা বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে দেনদরবার করে যাচ্ছিলেন। এই নির্বাচনে সংখ্যালঘু দলগুলো পৃথকভাবে অংশ গ্রহণ করে। তাদের জন্য সংরক্ষিত ৭২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৪টি, ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি (ইউপিপি) ১৩টি এবং সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন (এসসিএফ) ২৭টি আসনে জয় লাভ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করতে গিয়ে মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়ে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হলেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মাত্র ৫৬ দিনের ব্যবধানে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সরকার রাজনৈতিক কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। এ ধরণের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সংখ্যালঘু দলগুলো 'ঘোলা জলে' মাছ শিকারে নেমে পড়ে। অস্তিত্বের সংকটে পড়া সংখ্যলঘু সম্প্রদায় এবার সরকার গঠন এবং সরকার পতনের খেলায় ভূমিকা রাখতে শুরু করে। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল অবধি কেন্দ্রে ৫টি এবং পূর্ববাংলায় ৭টি প্রাদেশিক সরকারের উত্থান-পতন হয়। সকল ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু দলগুলোর ভূমিকা ছিল। পূর্ববাংলা আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, কেন্দ্রে মুসলিম লীগ, রিপাবলিকান পার্টি সকলের কাছে সংখ্যালঘু দলগুলোর গুরুত্ব বেড়ে যায়। এসময়ে তাঁরা আবু হোসেন সরকারের কেবিনেটে ৩টি এবং আতাউর রহমান খানের কেবিনেটে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণায়ের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। নতুন সংবিধানে যুক্ত নির্বাচন, সরকারী চাকুরিতে ২৩ শতাংশ সংখ্যালঘু কোটা সংযুক্ত করার দাবী বাস্তবায়নে তারা সফল হন। আওয়ামী মুসলিম লীগ সংখ্যালঘুদের সমর্থন আদায়ের গুরুত্ব স্বীকার করে অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে দলের নাম থেকে মুসলিম

শব্দটি বাদ দেয়। অস্তিত্বের সংকটে থাকা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রাজনীতির মাঠে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কংগ্রেস নেতা প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময়কে পাকিস্তানের ইতিহাসে সংখ্যালঘুদের জন্য সবচেয়ে ভাল সময় বলে উল্লেখ করেছেন। এসময়ে হিন্দুদের দেশত্যাগের প্রবণতা কমে যায়। বস্তুত রাজনৈতিক শক্তিসমূহের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পূর্বশর্ত তা এ সময়ের পরিস্থিতি থেকে বোঝা যায়। রাজনৈতিক শক্তির পালাবদলের সাথে সাথে পূর্ববাংলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির পাশাপাশি জনজীবনেও পরিবর্তন আসে।

১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে সংখ্যালঘুদের জীবনে নতুন করে দুর্ভোগ নেমে আসে। জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন সভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানদের পশ্চাদপসারণ শুরু হয়, বিশেষ করে হিন্দুদের জীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ। পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাবেক প্রেসিডেন্ট সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত, কংগ্রেস নেতা এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য বসন্ত কুমার দাস, গণপরিষদ সদস্য ও প্রাদেশিক মন্ত্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, প্রাদেশিক মন্ত্রী প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, সাবেক আইন পরিষদ সদস্য ত্রৈলক্য নাথ চক্রবর্তী, সাবেক আইন পরিষদ সদস্য বিজয় চন্দ্র রায়সহ বহু হিন্দু নেতার ওপর জেল জুলুম অত্যাচার নেমে আসে। 'ইলেক্টিভ বডিস্ ডিসকোয়ালিফিকেশান অর্ডার' (EBDO) এর মাধ্যমে হিন্দু নেতৃবৃন্দ রাজনীতিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। অনেককে 'স্মাগ্লিং' এবং 'পাকিস্তান বিরোধী' কর্মকাণ্ডের অভিযোগে বিচারের আওতায় আনা হয়। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে নানান প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়। ধীরে ধীরে হিন্দুরা নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। বহু নেতৃবৃন্দ দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারি, হাইকোর্টের বিচারপতি, আইনজীবি শিক্ষকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী লোকেরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেন। অনেকে আত্মগোপনে চলে যান।

হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে সেই স্থানে নব্য এক এলিট শ্রেণীর জন্ম হয়। জেনারেল আইয়ুব খান হিন্দু এলিট শ্রেণির শূন্যস্থান পূরণের জন্য এই নতুন শ্রেণি সৃষ্টি করে। মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে গ্রামে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই নতুন এলিট শ্রেণি সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ছিল মাত্র ৪৯৬৫ জন।

১৯৬২ সালে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোন সংখ্যালঘু দল অংশ গ্রহণ করেনি। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং মুসলিম লীগ 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের' ব্যানারে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় সরকার পূনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন যা ৯ নেতার বিবৃতি নামে পরিচিত। এই বিবৃতিতে কোন হিন্দু নেতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। সংখ্যালঘু দলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। অনেকগুলি কারণে

হিন্দুরা অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। প্রথমত: দেশভাগের মূল দর্শনই ছিল মুসলমানদের পৃথক আবাস ভূমি গঠন। ফলে দেশভাগের সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার আগে থেকে হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রীয় নীতি, সংবিধান, সরকারী কর্মকর্তাদের বৈষম্যমূলক আচরণ ইত্যাদি অনেককে দেশ ত্যাগে উৎসাহিত করেছে। তৃতীয়ত: ধন-সম্পদ সম্ভ্রমহানীর আশঙ্কায় নেতৃস্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দেশত্যাগে সাধারণ হিন্দুদের দেখার কেই ছিল না। আইয়ুব খানের সামরিক সরকারের সময় রাজনৈতিক দল ও শীর্ষ স্থানীয় রাজনীতিকরা কালো তালিকাভূক্ত এবং জেল-জুলুমের শিকার হয়ে হতদ্যম হয়ে পড়ে। ফলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেও অনেকেই রাজনীতিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

এরকম একটি পরিস্থিতিতে ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরে হযরতবাল মসজিদে রক্ষিত হযরত মুহম্মদের (স.) পবিত্র চুল হারিয়ে গেলে ১৯৬৪ সালে ঢাকা, খুলনাসহ পূর্ববাংলার কয়েকটি এলাকায় দাঙ্গা শুরু হয়। আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগের নেতারা এই দাঙ্গায় প্ররোচনা দেয়। তবে পূর্ববাংলার বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মাওলা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান প্রমূখ নেতৃবৃন্দ শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্ট গ্রহণ করেন। পত্রিকাগুলো দাঙ্গাবিরোধী প্রচারণা চালায়। আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন এর নেতৃত্বে দাঙ্গাবিরোধী সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয়। এই জোট 'পূর্ববাংলার অবস্থান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে' শীর্ষক একটি বিবৃতি প্রকাশ করে।[৭২] এই দাঙ্গা সৃষ্টির পেছনে সরকারী মদদ ছিল সেটি স্পষ্ট। প্রথমে হিন্দু-মুসলিম পরে বাঙালি-বিহারী দাঙ্গা সৃষ্টি করে পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চেয়েছিল। ১৯৬৪ সালের ১৫ জানুয়ারী দাঙ্গা প্রতিরোধ মিছিলে অংশ গ্রহনকারী আমির হোসেনকে বিহারী গুন্ডাদের দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হন।[৭৩] এই ঘটনা প্রমাণ করে এই দাঙ্গা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। প্রতিরোধে সকলের প্রচেষ্টায় অবশেষে শান্তি ফিরে আসে। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে পূর্ববাংলার হিন্দুদের উপর আবার জেল জুলুম অত্যাচার নেমে আসে। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের আবার দেশত্যাগ শুরু হয়। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর 'এনিমি এ্যাক্ট' তৈরি করে হিন্দুরদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ যাত্রায় আবার বহু সংখ্যক হিন্দু ভারতে পাড়ি জমায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন হিন্দুদের সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করার রাষ্ট্রীয় আইনই বলে দেয় শাসকদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল।

হিন্দু সম্প্রদায়ের পরেই পূর্ববাংলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্থান। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ এবং হিন্দু সম্প্রদায় একে অপরের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিল। সময়ের পরিক্রমায় বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষ থেকে প্রায় উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের

অনুসারীগণ অনেকটা পূর্ববাংলার চট্টগ্রাম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশভাগের পর পাকিস্তানে ৩,১৯,০০০ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বেশীরভাগই চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাস করত। পূর্ববাংলার মহাস্থানগড় (পুণ্ডবর্ধন), পাহাড়পুর, ময়নামতি প্রভৃতি অঞ্চল সমৃদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহ্যে কৃষ্টি ও সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে। অতীশ দীপঙ্করের মত বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং প্রচারক পূর্ববাংলায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। পাকিস্তান সরকার 'সংখ্যালঘু অধিকার উপদেষ্টা' (Minority right advisory committee) কমিটিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সংযুক্ত করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ট্রাইবাল বৌদ্ধদের ভোটাধিকার ছিল না। পাকিস্তান সরকার ট্রাইবাল বৌদ্ধদের ভোটাধিকার প্রদান করে। ট্রাইবাল বৌদ্ধদের মধ্যে চাকমা, মং এবং বোমাং সম্প্রদায় যথেষ্ট প্রশাসনিক স্বায়ত্বশাসন ভোগ করত। চট্টগ্রাম জেলায় ৩৭৩ টা এবং পার্বত্যাঞ্চলে ১৬৮ টি বৌদ্ধ মন্দির ও আশ্রমের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রচার প্রসার ও চর্চা করা হত। পবিত্র কোরআন, পবিত্র গীতা, পবিত্র বাইবেলের পাশাপাশি রেডিওতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম গ্রন্থ পবিত্র ত্রিপিটক থেকে নিয়মিত পাঠ করা হত। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বৈশাখী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা ইত্যাদি উপলক্ষে মেলা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে অন্য সম্প্রদায়ের অধিবাসীরাও অংশ গ্রহণ করত।

পূর্ববাংলায় কিছু সংখ্যক রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করত। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা মূলত শিক্ষা, চিকিৎসা, দুস্থদের সেবামূলক কাজে নিয়োজিত ছিল। দেশের প্রায় সব বড় জেলায় খ্রিস্টানদের গির্জা ছিল। খ্রিস্টান এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ নবুয়ত এবং বিশ্ব ভাতৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। পূর্ববাংলায় Young men's Christian Association (YMCA) এবং Young Women"s Christian Association (YWCA) এবং মিশনারি কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা শিক্ষা চিকিৎসা এবং সেবামূলক কাজ করে যেতেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে পূর্ববাংলার অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক বজায় ছিল। বড় দিন, ইস্টার সানডেসহ তাঁদের ধর্মীয় উৎসবে অন্যদের অংশ গ্রহণের সাক্ষ্য মেলে। চিকিৎসা, শিক্ষা, নার্সিং এবং প্রকৌশল কাজের মাধ্যমে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা সকলের আস্থা অর্জন করেছিল। এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যসহ ছোট বড় শিল্প স্থাপনে তাদের অংশ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের সাম্প্রদায়িক পীড়ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অঙ্গনের পাশাপাশি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনও সংক্রমিত করেছিল। অভিজ্ঞ হিন্দু শিক্ষদের দেশ ত্যাগের ফলে দেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।[৭৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষাঙ্গনে যদি এমন পরিস্থির জন্ম হয় তবে সমাজের অন্যান্য অঙ্গনের মানুষের মধ্যে আরও বেশী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাঁসা বেধেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এবং সাহিত্য চর্চার

ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে বাংলা ভাষায় আরবী, ফার্সী, উর্দু শব্দের ব্যবহার বেড়ে চলল। উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষার জন্ম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী থেকে এবং ব্রাহ্মী লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দ বাদ দিয়ে আরবী, ফার্সী, উর্দু শব্দের ব্যবহার এবং লিপির ক্ষেত্রে বাংলার পরিবর্তে আরবি হরফের ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দকে হিন্দুয়ানী শব্দ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। ঐ সময়ের কবিতা, গান প্রবন্ধ ইত্যাদিতে আরবি, উর্দু ফার্সি শব্দের প্রয়োগ বেড়ে গেল। বই পুস্তক গল্প কবিতা প্রকাশনার ক্ষেত্রে উর্দু ব্যবহারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। সাচ্চা মুসলিমদের সুবিধার্থে সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ 'মুসলমানী বেঙ্গলী-ইংলিশ' অভিধানই বের করে ফেলল। এই অভিধানে আরবী, ফার্সী, উর্দু এবং হিন্দি থেকে বাংলা ভাষায় আগত শব্দ স্থান পায়। এই অভিধানের একটি রিভিউ পাকিস্তান অবজারভারে প্রকাশিত হয়। সেখানে 'হিন্দুয়ানী বাংলার' সমালোচনা করা হয়।[৭৫] পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর ভাষার ইসলামী করণের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

১৯৫৮ সালের ৪ এপ্রিল চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে 'পাক বাংলা' ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ গ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মাওলা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন।[৭৬] পূর্ববাংলার একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন 'রওনক' এর বিশেষ সাহিত্য অধিবেশনে কবি গোলাম মোস্তফা 'পাক-বাংলা-ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি 'পাক বাংলা' ভাষায় অধিকতর আরবী, ফার্সী, উর্দু শব্দ গ্রহণের উপর জোর দেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন বলেন, আমরা এখন যে ভাষায় কথা বলি এবং লিখি তা 'পাক বাংলা' নয়। আমাদের কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যে অধিকতর আরবী, ফার্সী ও উর্দু শব্দ থাকলে নতুন একটা ভাষার জন্ম নিবে এবং তা হবে 'পাক বাংলা' ভাষা। সৈয়দ আলী নূর সভাপতির ভাষণে বলেন, অতীতের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রজাল বাংলাভাষা হইতে হিন্দু ভাবধারার বাহক সংস্কৃত শব্দগুলি বর্জন করিয়া আমাদের রাষ্ট্রগত আদর্শের ভিত্তিতে ইহার সংস্কার সাধন সময় সাপেক্ষ হইলেও 'পাক বাংলা' ভাষার রূপান্তর অবধারিত।[৭৭] এছাড়া এসময়ে প্রচুর ইসলামী গান, কবিতা, গজল এবং অন্যান্য সাহিত্য রচিত হতে থাকে। রাষ্ট্রের সর্বত্র ইসলামীকরণের এই প্রবণতা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রে তাঁদের নাগরিক অবস্থান নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই সঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল।

পূর্ববাংলার সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। এই বিভক্তিকে ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে বিভাজন না বলে বরং একে বাঙালিত্ব ও পাকিস্তানী ভাবধারার বিভাজন বলাই শ্রেয়। পাকিস্তানী ভাবধারার সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষার সংস্কার, ভাষার সাম্প্রদায়িকীকরণ ইত্যাতি কর্মপ্রয়াস নিয়ে এগিয়ে এলেন। এসবের মধ্যে একটি ছিল আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রয়াস। পূর্ববাংলা সরকারের শিক্ষা সচিব ও শিক্ষামন্ত্রী এই প্রষাসের সমর্থক ছিলেন। এছাড়া পূর্ববাংলার বেতার, টেলিভিশনও সাম্প্রদায়িকী করণের

প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক উদযাপন উপলক্ষে পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গন বিভক্ত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে মুসলিম বিদ্বেষী এবং হিন্দু সংস্কৃতির ধারক বলে প্রচার করা হয়। এরই ধারবাহিকতায় ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দিন জাতীয় সংসদে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথের গান প্রচারিত হবে না বলে ঘোষণা করেন।[৭৮] পাকিস্তান সরকারের হিন্দু বিদ্বেষী নীতির চরম প্রকাশ লক্ষ করা যায় পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। পূর্ববাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন চলাকালে পাকিস্তান সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে হিন্দুদের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ থেকে প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত শরণার্থী ভারতে পাড়ি জমিয়েছিল তাঁদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। পাকিস্তানী আক্রমণে পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল যা পূর্ববাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যকেই পুনর্বার সকলের সামনে নিয়ে আসে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭৯]

পূর্ববাংলায় রাজনৈতিক অঙ্গন কখনো কখনো সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছাদিত হলেও এর সাংস্কৃতিক অঙ্গন ছিল পরিস্কারভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনার চর্চা কেন্দ্র। পাকিস্তানপন্থী কিছু কবি-সাহিত্যিক সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িকীকরণের চেষ্টা করলেও অবশেষে সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির কাছে তাঁরা পরাজিত হয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা ধর্মীয় জীবনকে একান্ত নিজস্ব, ধর্মীয় ও পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সে কারণে ধর্মকে কেন্দ্র করে উৎসব আয়োজনে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সার্বজনীন উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন, মেলা পৌষ-পার্বন, নবান্ন উৎসব, পেশাগত ঐক্য ইত্যাদি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি পূর্ববাংলায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানমূলক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে সহায়ক হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ের সহাবস্থান, প্রার্থনার আহ্বান আজান কিংবা শঙ্খধ্বনি, শশ্মান এবং গোরস্থানের সংলগ্ন অবস্থান অথবা পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম শবযাত্রায় কোন বিরোধ সৃষ্টি করেনি কখনোই। এসবই ছিল বাঙালির অসাম্প্রদায়িকতার চিরচেনা রূপ। বিরোধের কারণ রাজনৈতিক।

যুগ যুগ ধরে পূর্ববাংলায় একটি সমন্বয়বাদী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে। ভৌগোলিক বাস্তবতাই মূলত এখানে এরূপ সমাজ গঠনে সহায়ক হয়েছিল। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী এবং প্রধান প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণভাবে এখানে বসবাস করেছে। এখানে কখনো বৌদ্ধ, কখনো হিন্দু সবশেষে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। তবে গ্রাম প্রধান ব্যবস্থা পূর্ববাংলায় আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির সাক্ষ্য মেলে। গ্রামের সহজ সরল মানুষের চিন্তায় ধর্মীয় বিভেদ খুব একটা স্থান পায়নি। এখানে সেন

আমল থেকে মুসলিমদের আগমণ শুরু হয়। সেময় থেকে মোগল আমলের শেষ অবধি পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন গোলযোগের খবর পাওয়া যায় না। হিন্দুত্ববাদ ও বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের মাটিতে বিকাশ লাভ করেছে। ইসলাম ধর্ম বিদেশাগত হলেও ভারতের সমাজ ব্যবস্থার সাথে মুসলমানরা একাত্ম হয়ে যায়। পূর্ববাংলার মুসলমানদের অধিকাংশ ছিল ধর্মান্তরিত। অধিবাসীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল প্রায় অভিন্ন। এ অঞ্চলের মানুষ বুদ্ধের অহিংস নীতি, বেদান্ত ও সুফিবাদের মানবতাবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এখানকার মাটির উর্বরতার ন্যায় ধর্মীয় বহুত্ববাদ বিকাশের জন্য মানুষের মনও ছিল ঠিক একই রকম উর্বর ও উদার। ফলে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় হিংসা-বিদ্বেষ খুব একটা প্রকটভাবে দেখা দেয়নি। তবে পূর্ববাংলায় পাকিস্তান শাসনামলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও কখনও সাম্প্রদায়িক দঙ্গার ঘটনা ঘটলেও অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের সেরকম হিংসা-বিদ্বেষমূলক ঘটনার খবর পাওয়া যায় না। এসকল দাঙ্গার পেছনে রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনামলে প্রচ্ছন্নভাবে চর্চিত 'ভাগ কর শাসন কর' নীতিই এতদাঞ্চলে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়। এ সময়ে সূচিত ধর্মীয় বিভাজনের সাথে পাকিস্তান শাসনামলে যুক্ত হয় জাতিগত বিভাজনের নীতি। তারা বাঙালিকে হিন্দু-মুসলমানের ভিত্তিতে বিভাজিত করার পাশাশাশি বাঙালি মুসলমান এবং অবাঙালি মুসলমান বিভাজন করে পূর্ববাংলার সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে। ভাষাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশদের একটি রাজনীতি ছিল, পাকিস্তান শাসকরাও ভাষার রাজনীতি দিয়েই পূর্ববাংলায় শোষণ প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিল। এই বিভাজন নীতি পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত সচেতনভাবেই করেছিল তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কাজেই ১৯৪৭ সালের পরেও বৃটিশদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতি ভিন্ন রূপে চালু ছিল তা বলা যায়। ব্রিটিশরা ভারতের দুটি বড় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কৌশলে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী করে। এছাড়া তাদের শাসন সংস্কার এবং আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া অবচেতন মনে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ববাংলার সাম্প্রদায়িক সম্পর্কও নির্ধারিত হয়েছে ভারত পাকিস্তান পররাষ্ট্রনীতির উপর। পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য পূর্ববাংলায় বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানদেরকে বিভাজিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। পাকিস্তান শাসনামল বিশ্লেষণ করলে পূরো সমাজ ব্যবস্থার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী হিন্দু বিদ্বেষী নীতি গ্রহণ করে। সরকারের গৃহিত নীতি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তি বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। তবে পূর্ববাংলার সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি সকল বাঁধাকে উপেক্ষা করে সমাজকে গতিশীল রাখে। পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ সর্বদা ঐতিহাসিকভাবেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক ও বাহক। এখানকার বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, ছাত্র-সমাজ, কবি-সাহিত্যিক, বাউলসাধক, চারণ কবি এবং গ্রামের সাধারণ

মানুষ অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করে। পূর্ববাংলার হিন্দু ও মুসলমানরা ছিলেন নিজস্ব এক ধরনের লোকজ ধর্মের অনুসারী যার ভিত্তি ছিল বাঙালিত্ব। এই বাঙালিত্বের চেতনা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রচেষ্টা প্রতিহত করে। পূর্ববাংলার মুসলমানদের নিজস্ব রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যেমন অনেক হিন্দু সংস্কতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ঠিক তেমনি হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিও ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।[৮০] এ কারণে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের সামাজিক উৎসব পালনের রীতিনীতি প্রায় অভিন্ন।

পরিশেষে বলা যায় যে যুগ যুগ ধরে পূর্ববাংলার মানুষ সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং সহাবস্থানমূলক সাম্প্রদায়িক পরিবেশে বসবাস করেছে। অধিবাসীগণের প্রথম পরিচয় তাঁরা বাঙালি অতঃপর হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ অথবা খ্রিস্টান। পূর্ববাংলার মানুষ যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন তাঁদের মধ্যে একধরণের মানবতাবাদী ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে এক ধরনের ভক্তিমূলক ঐক্যের সূত্র নিহিত আছে। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন ব্যবস্থা, মেলা পৌষ-পার্বন, নবান্ন উৎসব, পেশাগত সাদৃশ্য ইত্যাদি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি পূর্ববাংলায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানমূলক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমে সহায়ক হয়েছে। সময়ের স্রোতধারায় পাল সেন এবং মুসলিম শাসনামলে পূর্ববাংলায় ধর্মীয় বহুত্ববাদ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সহাবস্থানের যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছিল ব্রিটিশ শাসনামলে এসে তা ব্যাহত হয়। ব্রিটিশ ভেদনীতি গ্রহণ করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলিমদের বিভক্ত করে শাসন করার কৌশল অবলম্বন করেছিল। কিন্তু তার ফলে বাঙালির ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়। সংখ্যালঘুদের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসূলভ ও নিপিড়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং পূর্ববাংলার প্রতি তাদের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি হিন্দু-মুসলিমসহ অন্যান্য সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে। ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টির প্রচেষ্টা পূর্ববাংলা অধিবাসীদেরকে সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিকভাবে আরও বেশী ঐক্যবদ্ধ করেছে। কেননা এখানকার অধিবাসীদের জীবন-দর্শনের মূল ভিত্তিই ছিল সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্প্রীতির সম্পর্ক। 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও'- এই আদর্শকে সামনে রেখে এ অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্ম এবং নৃাত্বিক সম্প্রদায়ের মানুষ একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার অধীনে যুগ যুগ ধরে একত্রে বসবাস করছে। নিকট অতীতে পাকিস্তান শাসনামলে এখানে যে সকল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, নীপিড়ন নির্যাতন বাস্তুভূমি থেকে উৎখাতের যে ঘটনা ঘটেছে তা ধর্মীয় অনুপ্রেরণা থেকে নয়, বরং তার পেছনে রাজনীতিই ছিল মুখ্য। আর এ রাজনীতির রূপকার ছিল বাঙালি নয়, অবাঙালি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। রাজনৈতিক বিভেদের ধ্বংসস্তুপে জন্ম নিয়েছে বাঙালি জাতিসত্তা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদ যা স্বাধীন সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্র গঠনের প্রেক্ষাপট তৈরিতে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ Bipan Chandra, *Communalism in Modern India*, Vani Educational books, New Delhi, 1984, p. 1

২ Romila Thapar, *The Past as Present: Forgiving Contemporary Indentities Through history*, Aleph Book Company, New Delhi, 2012, pp.116-117

৩ S.Gokilvani, S. Suba, *Communal Riots and Women Victims*, Regal Publications, New Delhi, 2009, p. 5

৪ বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী মালপাহাড়ী বা মাল কিংবা মালো, হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত, ইত্যাদি জাতিকে অনার্য জাতি হিসেবে চিহ্নত করা হয়েছে। দেখুন, *বঙ্গালীর উৎপত্তি, বঙ্গদর্শন*, ১ম সংখ্যা, ৮ম খন্ড বৈশাখ ১২৮৮, পৃ. ১৩-১৫

৫ Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760*, University of California Press, Berkley, Los Angeles, London, 1993, p. 8

৬ Bhabagrahi Misra, James Preston (ed.), *Community, self, and Identity*, Mouton Publishers, paris,1978, p.38

৭ Abdul Monin Chowdhury, *Religious Pluralism in ancient Bengal*, Dr. Anwar Dil and Dr. Afia Dil Trust Fund Lecture 2016, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 20017. p.11

৮ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *পরামৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য-চরিতামৃত*, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ১৯৯৩ পৃ. ৭৫

৯ মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেনশাহী আমলে বাংলা ১৪৯৪-১৫৩৮: একটি সামাজিক রাজনৈতিক পর্যেষণা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৬৯

১০ Francois Bernier, *Travel in Mogul Empire 1656-1658 AD*, S.Chand & co. (Pvt). LTD. New Delhi, third edition, 1972, p. 439

১১ ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কবিতায় মুসলমানদের 'যবন', 'নেড়ে' বলে সম্বোধন করেছেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুসলিমবিদ্বেষী শব্দ ব্যবহার করেছেন। হেমচন্দ্র লিখেছেন, মাগো ওমা জন্মভূমি/ আরো কতকাল তুমি/ এ বয়সে পরাধীন হয়ে কাল যপিবে/ পাষাণ যবন দল আর কত কাল/ নির্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে, নবীনচন্দ্র সেন এর লেখাতেও মুসলিম বিদ্বেষ লক্ষ করা যায়, নিরাশ্রয়ী অনাথিনী, যবনের করে/ সহি কত শতবর্ষ অশেষ যন্ত্রণা

১২ কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ২৯৯

১৩ বাউল সম্রাট শাহ্ আব্দুল করিম বাংলার সকল ধর্মের মানুষের সৌহার্দ্য সম্প্রীতির কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম/ গ্রামের নও জোয়ান হিন্দু-মুসলমান/ মিলিয়া বাউলা গান, ঘাটু গান গইতাম/... হিন্দু বাড়ীত যাত্রাগান হইত/ নিমন্ত্রণ দিত, আমরা যাইতাম, বিস্তারিত দেখুন- শাহ্ আব্দুল করিম, *কালনীর ঢেউ*, সমতা প্রেস, সিলেট, ১৯৮১, পৃ. ৭৬

১৪ লালন সাঁই লিখেছেন, এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে/ যেদিন হিন্দু মুসলমান/ বৌদ্ধ, খ্রীস্টান/ জাতিগোত্র নাহি রবে। বিস্তারিত দেখুন- ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাউল কবি লালন ও তাঁর গান*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪০

১৫ জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, (অনুবাদ ফজলুল করিম) দ্বিতীয় ভাগ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৮

১৬ ঐ, পৃ. ৪২

১৭ আসকারইবনে সাইখ, *নব জীবনের গান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৬ বাংলা, পৃ. ১৩৫

১৮ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭০

১৯ *Cencus of Bengal 1872*, General Statement 1B,pp xxxii-xxxiii.

২০ Md. Abdur Rahim, *Research Monograph No. 2, An Aprisal of census populations of East Pakistan from 1901 to 1961,* Institute of Statistical Research and traing, University of Dhaka, p. 25

২১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩

২২ Certainly I do not think, in looking at the Bakerganj people, that it would be correct to say that the most important thing about the majority of them is whether they were Hindus or Mahhomedans; as regards the world in general, the most important fact about them is that they belong to the Bengali race; and regards Bengal, See- H. Beveridge, B. C. S. *The District of Bakarganj: Its History and Statistics*, Trubner & co. Ludgate Hill, London, 1876, p. 190

২৩ Marta R. Nichollas, Philip Oldenburg, *Bangladesh: the birth of a nation*, M. Seshachalam & Co, Madras, 1972, p. 9

২৪ *Cencus of India, 1901*. VIA: II Table V. p. p. 20-23

২৫ বিপান চন্দ্র, *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কোলকাতা, ২০১১, পৃ. ৫১

২৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬১ বঙ্গাব্দের ১২ পৌষ থেকে ২৮ চৈত্র পর্যন্ত পূর্ব বাংলা ভ্রমণ করেছিলেন। এসময় তিনি রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, বিক্রমপুর, রাজনগর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, জাফরগঞ্জ, ঢাকা, রায়পুর, দালালবাজার, লক্ষীপুর, শান্তিমিতা, ভুলুয়া, সুধারাম, চন্দ্রশেখর, শম্ভুনাথ, সীতাকুন্ড, বাড়বকুন্ড, কুমারীকুন্ড, নবলাখ্যা, চট্টগ্রাম ত্রিপুরা বরিশাল, নলছিটি, ঝালকাঠি, মহারাজগঞ্জ, গুরুধাম, তুসখালি, মেয়ামতি, সাহেবের হাট, সুন্দরবন, বাদাবন, প্রণাসায়ের, টাকী, শ্রীপুর, বাগুন্ডী, পুঁড়া, ঘোরগাছি, বাদুড়ে ইত্যাদি অঞ্চল তিনি নিবিড়ভাবে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর এ ভ্রমণকাহিনী সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি পূর্ববাংলার সমাজজীবনকে জানার গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বিস্তারিত- মুনতাসির মামুন (সম্পা.), *আত্মস্মৃতিতে পূর্ববঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একভাডেমী, ২০১৮

২৭ রাফি উদ্দিন আহমেদ প্রদত্ত তথ্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক: In Bengal a Mussulman worshipping one god...lives in the same village with a Hindu, who keeps an idol in his house. The women go to fetch water from the same tank; the children play together in the village street; the men shoulder their polughs and march out side by side to the same fields, and there parhaps work within a few yards of one another season after season; watch together their ripe crops by night; go to market together; pay rent to the same landlord; and sit together in the same *Punchayet* [village council] to determine a dispute among neighbors. But they may not eat together, or intermarry...See- Rafiuddin Ahmed. *The Bengal Muslim1871-1906: A Quest for Identity*, Oxford University Press, Delhi, p.5

২৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা ভ্রমণকালে কয়েকটি বিষয় অতি উৎসাহের সাথে উল্লেখ করেছেন যা সাম্প্রদায়িক চিন্তা প্রসূত। যেমন, চট্টগ্রামের কারাগারে এইক্ষণে ৩৫২ জন দোষী ব্যক্তি আবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান, অন্যত্র তিনি বলছেন, এখানে হিন্দু জাতিতে ভিখারী প্রায় কেহই নাই, ব্রাহ্মণেরাও ভিক্ষা করে না... মুসলমান জাতিরাই ভিক্ষা করিয়া থাকে এবং তাহরা বিস্তর দুষ্কর্ম করে। ...এই এক সুখের বিষয় যে চট্টগ্রাম জিলার ভিতরে হিন্দু জাতিতে প্রায় বেশ্যা নাই, এই বিষয় কত আনন্দকর তাহা কথনাতীত। দেখুন-মুনতাসির মামুন (সম্পা.), *আত্মস্মৃতিতে পূর্ববঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একভাডেমী, ২০১৮, পৃ.পৃ. ২৩৯, ২৪২

২৯ শ্রী ভবশঙ্কর দত্ত, *"বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক আগ্রহের অভাব"*, *বঙ্গশ্রী*, ১ম বর্ষ, ২য় খন্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪০ পৃ. ৪৯৭

৩০ *শ্রী সুভাসচন্দ্র বসু রচনাবলী*, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ২

৩১ বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৮৫-১৯৪৭*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ.পৃ. ৩৪১-৩৪২, Bipan Chandra, *Communalism in Modern India*,Vani Educational Books, New Delhi 1984, p.337

৩২ Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal, 1884-1912,* Asiatic Press, Dacca, 1974, p. 247

৩৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৬, পৃ.৭০৮

৩৪ *প্রবাসী*, ৪৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৫০, পৃ.৩৪৩

৩৫ ১৯৩২ সালের রোয়েদান অনুযায়ী প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা 'সাধারণ হিন্দু', অনুন্নত সম্প্রদায়, মুসলিম আসন, শিখ, জমিদারদের বিশেষ নিযর্বাচনী এলাকা, শ্রমিক, মহিলা, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, ইউরোপীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। তবে এই বিভাজন জনসংখ্যার অনুপাতে নয়, প্রত্যেক গ্রুপের গুরুত্ব অনুযায়ী করা হয়। এই রোয়েদান অনুযায়ী 'লেজিসলেটিভ এসেমব্লি'-তে হিন্দু ভোটাররা হিন্দু প্রতিনিধি, মুসলিম ভোটাররা মুসলিম প্রতিনিধি, ইউরোপীয়রা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। এভাবে সাম্প্রদায়িকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করার আইন মূলত অধিবাসীদের সাম্প্রদায়িক বিভক্তকরণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। এই রোয়েদাদ সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। এর প্রতিক্রিয়া হয় ব্যাপক। বিস্তারিত দেখুন- Joya Chatterji, *Bengal Devided, Hindu communalism and partition, 1932-1947*, Cambridge University Press, Delhi, 1994, pp. 18-33

৩৬ ব্রিটিশ সারকারের প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলি ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯৪৬ সালে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি ডেলিগেশন প্রেরণ করেন যা ইতিহাসে 'মন্ত্রী মিশন' নামে পরিচিত। কোয়ালিশন সরকার গঠন প্রশ্নে বড় দুটি দলের মধ্যে ঐক্যমত্য তৈরীতে অনেক পেতে হয়। অবশেষে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সাথে ন্যূনতম ঐমত্যের ভিত্তিতে মন্ত্রী মিশন ১৯৪৬ সালের ১৬ মে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে তাঁদের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। কেন্দ্র, 'প্রদেশ', এবং 'প্রদেশসমূহ' এই তিনটি গুচ্ছে সরকার গঠিত হবে এবং সরকারে ক্ষমতার ভারসাম্য, অংশগ্রহণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত হলেও ১০ জুলাই বোম্বেতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, 'কংগ্রেস কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীতে' যোগদান করলেও তারা মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা 'পরিবর্তন' (modify) করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এমতাবস্থায় ২৯ জুলাই ১৯৪৬ মুসলিম লীগ 'ওয়ার্কিং কমিটি' সরকার গঠনে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে এবং ১৬ আগস্ট পুরো ভারত জুড়ে 'ডাইরেক্ট একশন' (Direct Action Day) পালনের ঘোষণা দেয়। এই দিন পালনকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ব্যাপী কলকাতায় হিন্দু-

মুসলিম দাঙ্গা বেঁধে যায় যা ইতিহাসে 'Great killing of Calcutta' নামে পরিচিত। বিস্তারিত- R.C. Majumdar, M.A. Ph.D., *History of the Freedom Movement in India*, Volume-III, FIRMA,KLM LIMITED, Kolkata P. 623-645, Latif Ahmed Sherwani, Pkistan Resolution to Pakistan 1940-1947, Daya Publishing House, Delhi, Reprint 1985, p. 93-137

৩৭ D.o. Secret & Personal No. 5705/3/GSI(b), HQ. Eastern Command, Calcutta, 12 A.P.O Dated 24 Aug. 46 দ্রষ্টব্য. www.nationalarchieves.gov.uk/wp-content/uploads/2014/03/wo216-6621.jpg

৩৮ এ বি এম হোসেন, *পড়ন্ত বেলার গল্প*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৬৫

৩৯ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ আগষ্ট, ১৮শ সংখ্যা, ১৯৪৭

৪০ Ahmed Kamal, *State Against the Nation, the decline of the Muslim League in pre- independence Bangladesh, 1947-1954*, The University Press Limited, Dhaka,2009, p.p.11-12

৪১ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪শে আগষ্ট, ১৯শ সংখ্যা, ১৯৪৭

৪২ ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেন, '১৫ আগষ্ট হইতে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান এক নবযুগের সূচনা করিতেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি অনন্ত সম্ভাবনা এই নবযুগের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই আগষ্ট অবিমিশ্র আনন্দের দিন নহে। যে অখন্ড ভারত বর্ষের স্বপ্নে আমাদের সমস্ত জীবন কাটিয়াছে, সেই ভারতবর্ষ ঐদিন হইতে দিখন্ডিত হইতেছে। বাঙালী হিসাবে আমাদের এই বেদনাই মনে গভীর হইয়া আসিতেছে যে আমদের ভাই বোন প্রায় এক কোটি বাঙ্গালী-হিন্দু নিজেদের অনিচ্ছায় পররাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন হইতেছে। দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ জুলাই, ১৫শ সংখ্যা, ১৯৪৭

৪৩ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আমি বিভক্ত ভারতে অখন্ড বাংলা সমর্থন করি। কারণ বিভক্ত ভারত সুনিশ্চিতভাবে প্রদেশসমূহের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবে। কিন্তু বিভক্ত বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের অধিবাসীর মঙ্গল হইবে না। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিভক্ত বাংলায় হিন্দু মুসলমান কাহারও সুবিধা হইবে না। এমতাবস্থায় তিনি বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন বন্ধ রাখিয়া স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে মুসলমান নেতাদের সহিত গোল টেবিল বৈঠক একত্রে বসিয়া আলোচনার জন্য হিন্দু নেতাদের আহবান জানান। দেখুন, *আজাদ*, ২৯ এপ্রিল ১৯৪৭

৪৪ *Censu of Pakistan 1951*, Census Bulletin No. 4, p. 6

৪৫ Dr. Manisha Deb Sarkar (ed.) *Geo-political Implications of partition in Bengal,* K P Bagchi & Company, Kolkata, 2009, p. 179

৪৬ *Ibid*, p.49

৪৭ জি অ্যালানা, *পাকিস্তান আন্দোলন:ঐতিহাসিক দাললপত্র*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩২৭

৪৮ Muhammad Ghulam Kabir, *Minority Politics in Bangladesh,* Vikash Publishing House Pvt. Limited, New Delhi, 1980, p. 22

৪৯ *The Dawn,*27 November, 1947

৫০ Muhammad Ghulam Kabir, *Ibid.* p. 21

৫১ *Assembly Proceedings, Official report, East Bengal Legislative Asembly*, Third Session, 26th March, 1949, Vol. III-No.1, p.21

৫২ *Assembly Proceedings, Official report, East Bengal Legislative Asembly,*First Session, 23 March, 1948, Vol. 1-No.2, p.5-24

৫৩ হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, বাংলা একাডেমী, ২০১৭, পৃ. ৫

৫৪ পূর্ববাংলা প্রাদেশিক আইন সভার প্রথম অধিবেশন বিতর্ক, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, (সম্পা.). *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন,ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১০৮

৫৫ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ জানুয়ারী ১৯৬৪, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫৮-১৯৭১)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ২১৫

৫৬ এমন কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি ২২ বছর জেলে অতিবাহিত করেছেন, নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বহুবার আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিষয়ে অনেক অঞ্চলে তদন্ত করেছিলেন। তিনি বহু ঘটনার বর্ণনা করেছেন। ১৯৫০ এর দাঙ্গার ঘটনা তদন্ত করতে যেয়ে যে অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তুলে ধরছি–

ঘটনা-১ "দাঙ্গার সময় এই সব হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করেননি। দঙ্গার পরে ফার্সি পাড়ার বড় জোতদার জনাব মহম্মদ মুজাফফর রহমান চৌধুরী সাহেব তাঁর নিজস্ব হাতীর উপর তিনি নিজে ও ধামুরহাট থানার বড় দারোগা সরকারী পোষাক পরে ঐ অঞ্চলের প্রত্যেক হিন্দুর বাড়িতে বাড়িতে গো-মাংস উপহার (!) স্বরূপ দিয়ে তাদের খেতে বলেন এবং জানান যে, পাকিস্তানে থাকতে হলে তাদের ঐ মাংসও খেতে হবে এবং তাদের ধর্মও বদল করে ইসলাম-'কবুল' করতে হবে! দাঙ্গাও যেসব হিন্দুদের দেশত্যাগ করতে পারে নি, পোষাক পরা সরকারী কর্মচারী দারোগার ও চৌধুরী সাহেবের নির্দেশেই তা সমাধা করলো!" উল্লেখ্য যে, জনাব মহম্মদ মুজাফফর রহমান চৌধুরী ছিলেন মুসলিম লীগের 'পান্ডা' এবং পূর্ববঙ্গ বিধান সভার সদস্য।

ঘটনা-২, তৎকালীন চাঁপাই-নবাবগঞ্জ মহকুমার রোহনপুর ষ্টেশনের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম। সে গ্রামের কয়েকজন লোক তাঁকে জানান- "তাঁরা তো আর গ্রামে গ্রামে বাস করতে পারেছেন না একটি মুসলমান ভদ্র লোকের অমানুষিক অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে বহু হিন্দুই দেশ ছেড়ে যে যেদিক পেরেছেন চলে গিয়েছেন। তাঁরও আর থাকতে পারছেন না। ঐ মুসলমান ভদ্রলোকটি হচ্ছেন একজন হাতুড়ে হোমিওপ্যাথিক গ্রাম্য ডাক্তার এবং মুসলিম লীগের একজন মহাশক্তিশালী নেতা। তিনি বলে বেড়ান যে তিনি হচ্ছেন ঐ ছয়টি থানার (মহকুমার) ভারপ্রাপ্ত লাট সাহেব। সেখানে তিনি যা করবেন তাই হবে।... এমন কি পুলিশও তাকে অত্যন্ত ভয় করে চলেন। এমতাবস্থায়... আমাদের দেশত্যাগ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই"। বিস্তারিত- প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, *পাক-ভারতের রূপরেখা*, শ্যামা প্রকাশনী, চাকদহ, নদীয়া, ১৩৭৫ বাংলা, পৃ. ২৩৪-২৩৫ এবং ২৩৮-২৩৯

৫৭ *Assembly Proceedings, Official report, East Bengal Legislative Asembly*,Fourth Session, 1950, Vol.IV-No.8, p. 164-165

৫৮ *আজাদ*, ২৪ এপ্রিল ১৯৫৬

৫৯ ব্রিটিশ আমলের বিপ্লবী সংস্থা যুগান্তর দলের প্রবীন নেতা, পাকিস্তান পার্লামেন্ট এবং পরবর্তীকালে পূর্বপাকিস্তান বিধান সভার সদস্য শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত ভারত সরকার কর্তৃক পূর্ববাংলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগের কারণ অনুসন্ধানে গঠিত 'কাপুর কমিশনে'-এর কাছে লিখিতভাবে জানান যে,

...I could not do better than referring here to some inking of official policy, pursued in East Bengal since partition. About 1951, I became exceptionally intimate with one of the Cabinet Minister. He thoroughly disaproved of policies pursued but was helpless. I cannot divulge his identy. I am quoting him almost word for word to say the first (or only) Secretary General of Pakistan, supported by the – then Prime Minister was responsible for the two policies:

i). Sooner or later, East Pakistan is going to walkout of Pakistan. It is therefore, useless straining to develop East Pakistan beyond a national routine measure. It would be wiser to develop that West, where necessary and possible without arousing suspicion, at the cost of the East.

ii). The minorities, particularly those of the middle classes can never prove friendly to Pakistan. Every means should, therefore, be sought to get rid of them. But, for obvious reasons, the process must be gradual and circumspect. The political leaders have mostly left. Others will find little support if their immediate followers coming from the middle classes are squeezed out of employment-prospects. This should be effectuated in the name of poorer Muslim community. The process must be slow. But if there are upheavals in any area on the part of the masses, the process must not be allowed to get out of the control. But no serious notice need to be taken of the subsequent hue and cry, nor of complaints by the minorities of their representatives. দ্রষ্টব্য- প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, *পাক-ভারতের রূপরেখা*, শ্যামা প্রকাশনী, চাকদহ নদীয়া, ভাদ্র ১৩৭৫, পৃ. ২৪০-২৪২

৬০ এই স্মারক লিপিতে সাক্ষর করেন Basanta Kumer Dass, Ganendra Nath Bhattacharjee, Munindra Nath Bhattacharjee, Haran Chandra Ghosh, Monoranjan Dhar প্রমূখ নেতৃবৃন্দ, বিস্তারিত দেখুন. Muhammad Ghulam Kabir, *op. cit,* pp.106-124

৬১ *Assembly Proceedings, Official report, East Bengal Legislative Asembly*,Fourth Session, 9th March, 1950, Vol. IV-No. 8, p. 169-170

৬২ *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ সেপ্টেম্বর, ২১শ সংখ্যা, ১৯৪৭

৬৩ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ ডিসেম্বর, ৩১শ সংখ্যা, ১৯৪৭

৬৪ File no. 4L-B/1950, B Proceedings 142-5, Home Political, September 1951, BNA, Cited in Haimanti Roy. *Partitioned Lives, Migrants, Refugees, Citizens in India and Pakistan, 1947-1965,* oxford University Press, New Delhi, 2012, p.151

৬৫ *Constituent Assembly of Pakistan Debates, official Report*, 13th July 1955, p. 127

৬৬ দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের কোন কোন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। পূর্ববাংলায় তার প্রতিক্রিয়ায় দাঙ্গা শুরু হয়। পূর্ববাংলার হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে পশ্চিম-বঙ্গের মুসলমানরা বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হবে। এর পরিণাম হত ভয়াবহ। পূর্ববাংলার দাঙ্গারোধে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ববাংলায় বেশ কয়েকটি জেলা সফর করেন। তিনি ঢাকা, বরিশাল, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ইত্যাদি অঞ্চল সফর করলেন। এর ফলে হিন্দুদের দেশত্যগের প্রবণতা কমে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে মুসলমানদের আসাও কমে যায়। ১৯৪৮ সালে

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আবার ঢাকা এলে টাঙ্গাইলে সফরের আয়োজন করা হয়। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে সরকার তাঁর উপর ঢাকা ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। বিস্তারিত দেখুন- শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, পৃ.পৃ. ৮৬, ১০২, ১০৮

৬৭ আওয়ামী লীগের সাথে 'মুসলিম' শব্দ যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে জেলে বন্দী বঙ্গবন্দু শেখ মুজিবর রহমান বলেন, 'আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা সুষ্ঠ মেনিফেস্টো থাকবে। ভাবলাম, সময় এখনও আসে নাই। তাই যারা বাইরে আছেন তারা চিন্তাভাবনা করেই করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *ঐ*. পৃ. ১২১

৬৮ *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া ম্যানিফেষ্টো* ২৩ ও ২৪ জুন ১৯৪৯, নূহ-উল-আলম লেনিন, (সম্পা.), *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৩৫

৬৯ Draft constitution and Rules of The the East Pakistan Awami Muslim League, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, প্রথম খন্ড, (১৯০৫-১৯৫৮)* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২ পৃ. ১২১

৭০ হারুন-অর-রশিদ, *পূর্বোক্ত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৯

৭১ Dr. Hasan Zaman. (Ed.), *Current News, Journal of contemporary Events & Ideas*, Bureau of National Reconstruction, Govt. of East Pakistan, Dacca, 1970, p. 8

৭২ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ ও ১৬ জানুয়ারী, ১৯৬৪ (গোলাম কবীর ৭৫)

৭৩ আমিনুর রহমান সুলতান, *দাঙ্গায় শহিদ আমির হোসেন চৌধুরী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২১

৭৪ এ সংক্রান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অফিসিয়াল বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, Immediate upon the partition of the sub-continent it was faced with the threat of almost a close-down owing to resignations and voluntary retirements of considerable number of its teaching, administrative and ministrial staff. As a direct resul of the creation of Pakistan as many as 18 senior teachers resigned or retired in 1946-47 and the exodus continued the next session. দ্রষ্টব্য- The University of Dacca : a review of changes and developments during the decade 1958-68, Dacca, 1968, p. 6

৭৫ Dr. Hasan Zaman, (Ed.), *op.cit*, p.76

৭৬ *আজাদ* ৫ মে ১৯৫৮

৭৭ *আজাদ* ১৩ মে, ১৯৫৮

৭৮ ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৫৫

৭৯ যে সকল গান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিয়েছিল সেখানেও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সূর নিহিত রয়েছে। ঐসকল গানে পূর্ববাংলার বাঙালিকে একটি ঐক্যবদ্ধজাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান/ আমরা সবাই বাঙালি, ইত্যাদি গান পূর্ববাংলার সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিল। দেখুন- লিয়াকত আলী লাকী, (সম্পা.), *দ্রোহ ও মুক্তির গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬৫

৮০ জেমস ওয়াইজ, *পূর্বোক্ত*, *পৃ.* পৃ. ২৮-২৯

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্ববাংলার রাজনীতি ও রাজনৈতিক ঘটনা: পরিপ্রেক্ষিত পাকিস্তান রাষ্ট্র

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্ববাংলার রাজনীতি ও রাজনৈতিক ঘটনা: পরিপ্রেক্ষিত পাকিস্তান রাষ্ট্র

ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালে প্রত্যাশিত স্বাধীনতা পেল কিন্তু, ভারত ভেঙ্গে দু'ভাগ হল। স্বাধীনতাপ্রিয় পূর্ববাংলার অধিবাসীরা কার্যত পরাধীনতার জালে নতুন করে আটকে গেল। যে রাষ্ট্র পেল সেটি বাঙালির প্রত্যাশিত রাষ্ট্র ছিল না। ১৯৪০ সালের লাহোর 'রেজুল্যুশনে' মুসলমানদের জন্য প্রস্তাবিত একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতের 'পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চল' নিয়ে যে রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল সেটি ছিল পূর্ববাংলার অধিবাসীদের রাষ্ট্র ভাবনা। বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন যুক্ত-বাংলা গঠনের প্রচেষ্টাও বাঙালি নেতৃবৃন্দের ছিল। বাঙালি পাকিস্তান আন্দোলনকে বস্তুগত অর্থে নয়, ভাবার্থে গ্রহণ করেছিল। লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান বলে কোন শব্দ ছিল না। তথাপি শীর্ষস্থানীয় অবাঙালি হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ক্ষমতা ভাগাভাগির দ্বন্দ্বের বলি হলো পূর্ববাংলার শান্তিপ্রিয় ও অসাম্প্রদায়িকতার পূজারী অধিবাসীগণ। ধর্মকে ভিত্তি করে মুসলমানদের জন্য যে রাষ্ট্র গঠন করা হলো তার উভয় অংশের জনগোষ্ঠীর কাছে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যবধান ছিল দৃশ্যমান। যে দর্শনের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল সেটিও রাষ্ট্রের ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত কোন মতবাদ সমর্থিত নয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে জাতীয়তাবাদী সম্পর্কের উপাদান অনুপস্থিত ছিল। শুধুমাত্র ধর্মীয় মিল জাতীয়তাবাদের জন্য যথেষ্ট নয়। জাতীয়তাবাদী সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক অভিন্নতা বা ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা দীর্ঘকালীন বোঝা-পড়ার সম্পর্ক, আবেগ-অনুভূতি, দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না অথবা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বমূলক চেতনা বিদ্যমান থাকা বাঞ্চনীয়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবাঙালি মুসলমানদের সাথে বাঙালি মুসলমানদের বিশেষ প্রেক্ষিতে একটি ন্যূনতম সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তা ছিল সাময়িক। পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিত পর দুই

অঞ্চলের বিভেদ দৃশ্যমান হয়। সাংস্কৃতিক বিভেদ থেকেই মূলত রাজনৈতিক সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। আলোচ্য অধ্যায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক বৈষম্যের মাধ্যমে পূর্ববাংলাকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বানানোর পাকিস্তানী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি প্রতিক্রিয়ার রাজনৈতিক প্রকাশকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঘটনা পরম্পরায় পূর্ববাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ণয় করাই এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

পূর্ববাংলা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগ স্থলে অবস্থিত হওয়ায় ভৌগোলিক কারণেই এর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম ভারতের অপরাপর অঞ্চল থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। দীর্ঘ ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একটি অভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ঐক্যবদ্ধভাবে বাস করেছে। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধেও ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছে। তবে ব্রিটিশ শাসনের শেষ লগ্নে এসে মুসলমানদের মধ্যে পৃথক স্বাধীন আবাসভূমি গঠনের ধারণা জন্ম লাভ করে। এ ধারণা গড়ে ওঠার জন্য ব্রিটিশ নীতি অনেকটা দায়ী। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পেছনে ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। এর পেছনে তাঁদের প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক অভিপ্রায়ও ছিল বটে। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫জন ভারতীয় মুসলিম অভিজাত, ব্যবসায়ী, জমিদার, আইনজীবীর সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে দেখা করে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রণয়নের দাবি জানান।[১] এই সাক্ষাতের ২ মাসের মাথায় ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার নবাবের বাগানবাড়িতে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কারে (Morley-Minto reform 1909) পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থাও প্রবর্তন করা হয়। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯০৬ সালের মুসলিমদের ঔ ডেলিগেশনকে 'commanded act' বলে অভিহিত করেছিলেন।[২] মাওলানা আজাদের বক্তব্যে মুসলিম লীগ গঠনে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত মেলে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘটনায় বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়া জানায়। এই ঘটনা অধিবাসীদের মনে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম দেয়। পূর্বে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে কৌম চেতনা লক্ষ করা গেলেও ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়নি। কেননা হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরীণ যে কাঠামো সেটিও ঐক্যবদ্ধ চেতনার পরিপন্থী। আর মুসলমানদের মধ্যেও কিছু অভ্যন্তরীণ শ্রেণিগত ধারণা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে এসব

অন্তধর্মীয় (Intra-Religious) ভেদাভেদ ভুলে নিজ নিজ ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়গত ঐক্য লক্ষ করা যায়।

উনিশ শতকের বিশের দশকের পর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃবর্গের চিন্তাভাবনায়ও পরিবর্তন ঘটছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশরাও দ্রুত ভারতে উপনিবেশ শাসনের অবসান ঘটানোর পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। কবি-সাহিত্যিক এবং দার্শনিকরাও নানা ধরনের দার্শনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটান। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের কথা ভেবেছেন। এই শতকের ত্রিশের দশকের আগে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির ধারণা প্রকাশিত হয়নি। মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের ধারণা প্রথম ওঠে আসে ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সম্মেলনে দার্শনিক কবি স্যার ইকবাল কর্তৃক প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে।[৩] তবে ইববালের বক্তব্যে সুনির্দিষ্টভাবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ, সিন্ধু, এবং বেলুচিস্তান একত্রীকরণের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হলেও পূর্ববাংলা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। পরবর্তীকালে লন্ডনে অধ্যয়নরত চৌধুরী রহমত আলী এবং অপর তিনজন ছাত্র ১৯৩৩ সালে অক্সফোর্ড প্রেস থেকে "now or never" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যেখানে সর্বপ্রথম 'পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। উর্দু ও ফার্সিতে যার অর্থ আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র এবং নির্মল স্থান। এখানেও পূর্ববাংলা বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তান শব্দ ছিল না। কথিত পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানদের যোগদানের কারণ হিন্দু জমিদার ও শোষক শ্রেণির হাত থেকে মুক্তির আশা। বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় জমিদার উচ্ছেদ এবং প্রস্তাবিত পাকিস্তানে অধিবাসীদের সব দুঃখ-দুর্দশার অবসানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়।[৪] এভাবে পাকিস্তান শব্দটি বাঙালিরা ভাবার্থে গ্রহণ করেছিল।

১৯২৩ সালে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' পরবর্তী নির্বাচনে মুসলমানরা স্বরাজ্য পার্টিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিল একই আশায়।[৫] এ থেকে বোঝা যায় বাঙালি মুসলমানরা বঞ্চনা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছিল। লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দ না থাকলেও ১৯৪৬ সালে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনীতে পাকিস্তান শব্দ সংযুক্ত করা হয়।[৬] ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকে দেশভাগ সংক্রান্ত বিষয়ে গণভোট হিসাবে দেখা হয়। এই নির্বাচনে বাংলা ছাড়া অন্যকোন প্রদেশে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। বাংলায় ভোটের ফলাফলকে যুক্তি হিসেবে দেখিয়ে কৌশলে পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়।[৭] প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো একমত পোষণ করতে ব্যর্থ হলে ১৯৪৬ সালের মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা বাতিল করে ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা বাতিল হওয়ায় ১০ জুন নয়াদিল্লীতে মুসলীম লীগ কাউন্সিলে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৮] অবাঙালি মুসলিম লীগের নেতারা হয়তো এমন

কিছুই প্রত্যাশা করেছিল। অবাঙালি মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ, হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং গুজরাটী-মাড়োয়ারী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মিলিত চক্রান্তে বাঙালিরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল।

১৯৪৭ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হাউজ অব কমন্স-এ ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ করার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন।[৯] রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বিধাবিভক্তি ব্রিটিশ সরকারের জন্য ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতিগত বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেয়। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দেশভাগে মাধ্যমে পাকিস্তান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।[১০] ১১ জুন বড় লাটের সভাপতিত্বে সংসদীয় সভায় দেশ বিভাগ সংক্রান্ত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠিত হয়।[১১] ৪ জুলাই হাইজ অব কমন্স-এ ভারতের স্বাধীনতার বিল উত্থাপিত হয়। ১৫ জুলাই হাইজ অব কমন্স-এ এবং পরের দিন হাউজ অব লর্ডস্-এ সর্বসম্মতিক্রমে দেশভাগ সংক্রান্ত বিলটি পাশ হয়। ১৮ জুলাই বিলটি রাজকীয় সম্মতি লাভ করে।[১২] তবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বিভক্ত ভারতের ধারণায় সন্তুষ্ট ছিলেন না।[১৩] ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষণার মাত্র ৫ মাস ২৫ দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। তড়িঘড়ি এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় ন্যায়সঙ্গত অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায়। এত বড় একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো অথচ সেখানে পূর্ববাংলার জনগণের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। রাজনৈতিক বঞ্চনার মাধ্যমেই পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ববাংলার যাত্রা শুরু হয়, যা ধীরে ধীরে আঞ্চলিক বিরোধের সূচনা করে।

দেশবিভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পূর্বেই আঞ্চলিকতার রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১২ জুন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বড় লাটের সাথে দেখা করে করাচীকে পাকিস্তানের অস্থায়ী রাজধানী করার প্রস্তাব প্রদান করেন।[১৪] ১৯৪৭ সালের ২৩ এপ্রিল বড় লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার কাছে যে সুপারিশ প্রদান করেছিলেন সেখানে ভারতকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান অঞ্চলে বিভক্তিকরণ এবং বাংলা বিভাগ হলে কলকাতা মহানগরীকে উভয় অংশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।[১৫] বাউন্ডারী কমিশনও বাংলার আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু কলকাতার প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কমিশনের সাথে যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে কলকাতাকে পূর্ববাংলার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হতো। সে ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিচারে কলকাতা পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ার দাবীদার হতো। এছাড়া ঢাকা মোগল আমলে সুবা বাংলার রাজধানী ছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরেও আসাম বেঙ্গল প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল ঢাকা। ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিচারে ঢাকাও রাজধানীর মর্যাদা পেতে পারতো। পূর্ববাংলার জনসংখ্যাও পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি। এবিষয়টিও বিবেচনাযোগ্য ছিল। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এমটাই হওয়া বাঞ্চনীয় ছিল। লীগ ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অবহেলার কারণে বাংলার হিন্দু-

মুসলিম নেতাদের ঐক্যমত্য থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন যুক্তবাংলা গঠনের বিষয়টিও উপেক্ষিত থেকে যায়। বাংলা বিভাগ সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন, "স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পশ্চাদেশে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছে। আমরা এক ভাষাভাষী ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র পাইলেই সন্তুষ্ট হইতাম এবং সেক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের সহায় সম্পদ লইয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ জাতি গড়িয়া তুলিতে পারিতাম, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ জয়যাত্রা আমাদের ভাগ্যে নাই"।[১৬] যুগ যুগ ধরে যে জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে বাংলা ভাগের মাধ্যমে সেই জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করা হলো। ব্রিটিশরা ঐক্যবদ্ধ ভারতকে ভয় পেয়েছিল তাই তারা ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয়দের বিভক্ত করেছিল। একইভাবে পাকিস্তানীরা ঐক্যবদ্ধ বাঙালিকে ব্রিটিশদের অনুসৃত পথে হিন্দু-মুসলমান অভিধায় বিভক্ত করার অপচেষ্টা চালায়। সাথে যুক্ত হয় অবাঙালি মুসলমানদের ষড়যন্ত্র।

১৯৪৭ সালের ১০ জুলাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. এটলী কমন্স সভায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পদে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং হিন্দুস্তানের গভর্নর জেনারেল পদে ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন বড় লাট লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেনের নাম ঘোষণা করেন।[১৭] এর মাধ্যমে শেষ সময়ে বসু-সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন যুক্তবাংলা গঠনের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। শরৎ বসু সহ অন্যান্য বাঙালি হিন্দু নেতৃবৃন্দও যুক্তবাংলা গঠনের পক্ষপাতি ছিলেন।[১৮] বাংলাভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাংলার নেতৃবৃন্দের মতামত উপেক্ষিত হলো। বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রণীত যুক্তবাংলা গঠনের প্রস্তাবে বাংলার তৎতকালীন গভর্নর ফ্রেডারিক বারোজেরও সম্মতি ছিল।[১৯] ১৪ আগষ্ট শুক্রবার পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় এবং একই দিন দিবাগত রাত ১টায় ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। ১৫ আগস্ট সকালে কার্জন হলে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মি. আক্রাম পূর্ববাংলার প্রথম গভর্ণর হিসেবে স্যার ফ্রেডারিক চামাস বোর্ণকে শপথ বাক্য পাঠ করান। এর পর গভর্নর পূর্বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খাজা নাজিমুদ্দিনকে শপথ বাক্য পাঠ করান।[২০] খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মধ্যদিয়ে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা অবাঙালিদের হাতে কুক্ষিগত হওয়ার ভিত্তি রচিত হলো। বাঙালিত্বের চেতনা এবং ঐতিহ্যের ধারক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার বলয় থেকে নির্বাসিত হলেন।

এভাবে ষড়যন্ত্র আর অস্বচ্ছ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়। ভারত ও বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে কোথায় যেন অপূর্ণতা রয়েই গেল এবং '৪৭ পরবর্তী রাজনীতিতেও ষড়যন্ত্রের ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ভিত্তিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক চক্রান্তের কারণে পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন না। খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মধ্যদিয়ে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে ব্রিটিশ রাজভক্তদের নবউত্থান শুরু হলো। ষড়যন্ত্রের রাজনৈকি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানের রাজনীতি শুরু হল।[২১] এই দিন কলকাতা ও ঢাকায় প্রায়

একইভাবে স্বাধীনতা উৎসব উদযাপিত হয়। বন্দেমাতরম, জয়হিন্দ, আল্লাহু আকবর, স্বাধীন ভারত কি জয়, হিন্দু মুসলমান এক হোক, ভাইয়ে ভাইয়ে নেহি লড়েঙ্গে প্রভৃতি ধ্বনিতে কলকাতা মুখরিত হয়, অনুরূপভাবে ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের স্বাধীনতা উৎসবে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে যোগদান করেন।[২২] পূর্ববাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর কাছে কিন্তু এই উৎসবের মিছিলে যোগদান রাষ্ট্রের শবযাত্রার মিছিলে যোগ দেওয়ারই শামিল ছিল। কেননা তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল তাদের হাত থেকে মুক্তির জন্য। কিন্তু যে রাষ্ট্র পেল তাতে কি মুক্তি এল? এই রাষ্ট্রের প্রতি হিন্দুরা কতটুকু অনুগত তা প্রমাণ দেওয়ার জন্য তাদেরকে এই উৎসবের মিছিলে বেশী সরব হতে হয়েছিল তা কারও কারও স্মৃতি কথায় উঠে এসেছে।[২৩] নতুন রাষ্ট্র, নব চেতনা, বহুদিনের লালিত স্বপ্ন নতুন সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করবে সেটাই প্রত্যাশিত ছিল। কতকগুলি অমিমাংসিত রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সেখান থেকেই পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর সাথে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক বিরোধের সূচনা হয়।

৫.১ রাজনীতির ভাষা

পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমর্থন এবং এর নৈতিক ও আইনী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও কিছু দিনের মধ্যেই এই রাষ্ট্রের কর্ণধার পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর আসল চেহারা প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাঁদের রাজনীতির ভাষা থেকে। বাঙালির কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞাসূলভ এবং জাতিগতগত বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অচিরেই প্রকাশ পেয়ে যায়। বাঙালির জাতিগত পরিচয়ের মূল ভিত্তি বাংলা ভাষাকে তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। হিন্দু-মুসলিমদের নৃতাত্ত্বিক ঐক্যকে বিভক্ত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় তাঁদের রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একদিকে তাঁরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়াস চালায় অন্যদিকে বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে বাংলাভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দকে বাদ দিয়ে আরবি ও উর্দু শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে 'পাক বাংলা' ভাষা সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। একই উদ্দেশ্যে আরবি হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগও তাঁরা গ্রহণ করে। এ বিষয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তরিত আলোচনা করা হয়েছে। এভাবে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে রাজনৈতিক পরিকল্পনা থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যত রাজনীতির চিত্র দৃশ্যমান হতে থাকে। অর্থাৎ ভাষা প্রশ্নে তাদের চিন্তা-ভাবনা থেকে তাদের রাজনীতির ভাষা পরিস্কার হয়ে যায়। ভাষা নিয়ে কৌশলী রাজনীতি করেছিল ব্রিটিশ সরকার, কেউ বুঝেনি। একই পথে হাঁটতে শুরু করে নব গঠিত পাকিস্তান সরকারও। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুভূতিকে ব্যবহার করে ভাষার ধর্মীয়করণ শুরু করে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলায় তাদের ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করার জন্য বাঙালি জাতিসত্তা এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা সূচতুরভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের মত ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়। উর্দু ভাষাকে ধর্মীয় আবরণ দিয়ে

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির উপর অপেক্ষাকৃত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির মুখের ভাষাকে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার' নামে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। যোগাযোগের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে একটি ভাষা গ্রহণ করতে হলে তা অবশ্যই অধিকাংশের ভাষা হওয়া বাঞ্চনীয়।

আমরা ১৯৫১ সালের আদম শুমারীতে দেখতে পাই পূর্ববাংলার ৪ কোটি ১১ লক্ষ ৬০ হাজার ৩ শত ১০ জন (৯৮ শতাংশ) মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। বিপরীতে পূর্ববাংলায় মাতৃভাষা উর্দু এরূপ জনসংখ্যা মাত্র ৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৬শ ৩৬ জন।[২৪] এছাড়া পাকিস্তানের প্রধান নয়টি ভাষার মধ্যেও বাংলা ভাষার স্থান ছিল এক নম্বরে। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫.৪৮ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা।[২৫] মাতৃভাষা হিসেবে উর্দুর অবস্থান ছিল ৫ নম্বরে।[২৬] এসব উর্দুভাষী মানুষের একটি বড় অংশ ভারতের উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাব থেকে আগত অভিবাসী মোহাজের। পূর্ববাংলায় উর্দুভাষা বিকাশের সম্ভাবনাও ছিল না। কেননা পূবাংলার অধিবাসীরা এ ধরনের পরিকল্পনার চরম বিরোধিতা করে আসছিল। এমন কি ভাষা প্রশ্নে যখন বিতর্ক চলছিল সেরকম একটি প্রেক্ষাপটে ১৯৫১ সালের আদমশুমারি চলাকালে পূর্ববাংলা অনেক অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আদমশুমারীতে উর্দুভাষাকে রেকর্ডভুক্ত না করতে অনুরোধ করা হয়েছিল।[২৭] এ থেকে উর্দুভাষা সম্পর্কে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের অনাগ্রহের দিকটি প্রকাশিত হয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা নিয়ে এতসব কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর পূর্ববাংলায় ১৯৬১ সালের আদম শুমারিতে দেখা যায় মাতৃভাষা হিসেবে উর্দুভাষী জনসংখ্যা .০৩ শতাংশ কমে যায়।[২৮] বাঙালির উপর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে পারলে এ অঞ্চলের ওপর তাদের পরিকল্পিত অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশবাদ চিরস্থায়ী রূপ দিতে সক্ষম হতো। কেননা বাঙালি একদিকে ভাষা ভিত্তিক উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে একটি হতোদ্যম জাতিতে পরিণত হতো অন্য দিকে তারা চাকুরি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তো। উর্দুকে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসকে তারা কাজে লাগায়।

উর্দু যে কোন ধর্মীয় ভাষা নয় সেটি বোঝার জন্য এর বিকাশের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। 'উর্দু' তার্তার শব্দ যার অর্থ রাজকীয় শিবির (royal encampment)। মোঙ্গল যাযাবরদের মাধ্যমে এটি বিভিন্ন শব্দভান্ডারে যুক্ত হয়। উর্দুর সাথে পাঞ্জাবী ভাষার বাক্যগঠন ও ধ্বনির এত মিল যে, ভারতবর্ষে উর্দু ভাষা বিকাশের প্রথম পর্যায়ে একে এর জমজ ভাষা মনে হত।[২৯] উর্দু ভাষা ভারতের গর্ভজাত একটি নবীন ভাষা যার শব্দ ভান্ডারের উৎস হিন্দি, ফার্সি ও আরবি এবং লেখার বর্ণ ফার্সি। একাদশ শতকের প্রারম্ভে ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে পারস্য থেকে আগত মুসলিমদের সাথে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের মিথস্ক্রিয়ার ফলে কথ্য ভাষা হিসেবে উর্দু ভাষার বিকাশ শুরু হয়।[৩০] হিন্দি এবং ফার্সি ভাষী মানুষের মিলনের ফলে নতুন একটি ভাষার রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। অর্থাৎ হিন্দিভাষী ভারতবর্ষে পারসিকদের আগমন এবং স্থানীয়দের সাথে তাদের সংমিশ্রনের মাধ্যমে অবচেতনভাবেই

একটি নতুন ভাষার রূপ লাভ করে। ফার্সি লিপি এবং হিন্দি শব্দজাত ভাষাই পরবর্তীকালে উর্দু ভাষা হিসেবে পরিচিতি পায়। হিন্দি ও উর্দুর মৌলিক পার্থক্য হলো, উর্দু হলো আরবি-ফার্সি শব্দবহুল আরবি হরফে ডান দিক থেকে বাঁমে এবং হিন্দি সংস্কৃত শব্দ বহুল বাম থেকে ডানে দেবনাগরি লিপিতে লিখিত। তবে কথ্য ভাষায় হিন্দি ও উর্দুর মধ্যে তেমন কোন তফাত নেই।[৩১] বরং উভয় ভাষার শব্দভান্ডারে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। উর্দু ভাষা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে উর্দু ও হিন্দির মধ্যে খুব একটা পার্থক্য করা যেত না। সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনীর সদস্যরা উর্দু ভাষাকে যোগাযোগের (লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা) মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিল। পরবর্তীকালে উর্দু ও হিন্দি ভাষার পার্থক্য দৃশ্যমান হলে উর্দুভাষা 'রেখতি' (Rekhti) নামে পরিচিতি পায়। সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে 'রেখতির' পরিবর্তে উর্দু শব্দটি প্রচলিত হয়।[৩২] এটি মোগল সেনাবাহিনীর মধ্যে জনপ্রিয়তা পায়। সেনাসদস্যদের মাধ্যমে এটি তাঁদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ভারতের সংস্কৃতিতে নতুন একটি ভাষা যুক্ত হয়। বস্তুত, ভারতবর্ষ বহু ভাষার জন্মস্থান। উর্দুও একটি অঞ্চলের মানুষের উপভাষা হিসেবে জন্ম লাভ করে। আকবরের শাসনামলে হিন্দিভাষী হিন্দু এবং ফার্সি ভাষী মুসলমানদের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি হয়। অনেক হিন্দি ভাষী হিন্দু ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে মোগল সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন যারা উর্দু ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

ধর্মপ্রচারক সুফি-সাধকগণ উর্দু ভাষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। এঁরা লক্ষ করলেন যে, বহু ভাষার পীঠস্থান ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সকলের কাছেই উর্দুভাষা বোধগম্য। তাঁরা ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে উর্দু ভাষা ব্যবহার শুরু করলেন। এভাবে উর্দু ভাষা সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা পায়। দীর্ঘ মোগল শাসনামলে ফার্সিই রাষ্ট্রের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ব্রিটিশরা শাসন ক্ষমতা দখলের পর দীর্ঘদিন ফার্সি দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল। ফার্সি ভাষার দীর্ঘ ব্যবহারিক ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও এটি 'লিঙ্গুয়া-ফ্রাঙ্কা' হতে পারেনি। এটি রাজভাষা এবং দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল মাত্র। অথচ অপেক্ষাকৃত নবীন এবং স্বল্প সংখ্যক মানুষের ব্যবহৃত ভাষাকে পাকিস্তানীরা 'লিঙ্গুয়া-ফ্রঙ্কা' করতে চেয়েছিল বড় ধরনের রাজনৈতিক মতলবে।

ধারণা করা হয়, ব্রিটিশ শাসকরা 'ভাগ কর শাসন কর', নীতি বাস্তবায়নের জন্য এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষাভিত্তিক এবং ধর্মীয় বিভেদ তৈরি করে। H. M Matin মনে করেন, ব্রিটিশরা ভারতে তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বল করেছিলেন ভাষাভিত্তিক বিভক্তিকরণ ছিল অন্যতম কৌশল।[৩৩] ফার্সি ভাষাকে দুর্বল করে দীর্ঘ প্রায় ছয়শ বছরে গড়ে ওঠা মুসলিম সংস্কৃতিকে দুর্বল করা তাঁদের একটা উদ্দেশ্য ছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া ব্রিটিশ শাসকদের উর্দু ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করার আর কোন কারণ থাকতে পারে না। ব্রিটিশ শাসনামলে কলকাতা উর্দু ভাষা বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ

কেন্দ্রে পরিণত হয়। দীর্ঘ প্রায় ছয়শ বছর ধরে ফার্সি ভারতের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার মাধ্যমে ভারতের হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ভাষিক বন্ধনে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। এই ভাষাকে দুর্বল করার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিমদের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে বিনষ্ট করাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। ব্রিটিশ শাসকরা ভালভাবেই উপলব্দি করতে পেরেছিল যে, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে তারা তাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী করতে সক্ষম হবে।[৩৪] সম্ভবত ব্রিটিশদের আরও একটি লক্ষ্য ছিল। সেটি হলো ফার্সির গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে ইংরেজী ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করা। ভাষা ভিত্তিক রাজনৈতিক চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটানোর পেছনে ইংরেজদের একটি সূদুরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল। এ ছাড়াও ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে তাঁরা প্রশাসনে নিম্নপদস্থ জনবল তৈরি করার প্রয়াস পায়। ভাষা সংক্রান্ত ব্রিটিশ নীতি ছিল খুবই সূক্ষ্ম কিন্তু পাকিস্তানী কর্মপন্থা ছিল দৃশ্যমান দৃষ্টিকটুও বটে।

ইংরেজ কর্তৃক উর্দু ভাষার পৃষ্ঠপোষকতার আসল উদ্দেশ্য মুসলমানরা উপলব্ধি করতে পারেনি।[৩৫] ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশরা ফার্সিকে দাপ্তরিক ভাষার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিলে উর্দুর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও সেটিকে দাপ্তরিক ভাষা করেনি। ইংরেজীকে দাপ্তরিক ভাষা করা হয়। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উর্দু ভাষাতত্ব, ধ্বনিবিজ্ঞান এবং শব্দতত্ব নিয়ে প্রথম বিজ্ঞান ভিত্তিক অধ্যয়ন শুরু হয়।[৩৬] ১৮৩৫ সালে দিল্লীতে উর্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরবর্তীকালে দিল্লী কলেজ নামে পরিচিত পায়। এই কলেজের লেখাপড়ার মাধ্যম ছিল উর্দু।[৩৭] ব্রিটিশদের ভাষানীতির ফলে অবচেতন মনে হিন্দুরা হিন্দিভাষা এবং মুসলিমরা উর্দুভাষার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। এভাবে ভাষাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিভাজন হতে থাকে।

ব্রিটিশদের সুক্ষ্ম রাজনৈতিক চালে উর্দু , ফার্সি এবং হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে অবচেতনভাবেই ভাষাভিত্তিক স্বতন্ত্র চেতনার জন্ম লাভ করে। অন্যদিকে তাঁরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিমলীগ সৃষ্টির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক বিভক্তির বীজ বপন করে। ন্যাশনাল কংগ্রেস হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এবং মুসলিম লীগ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। এই বিভক্তির পেছনে ব্রিটিশদের অদৃশ্য হাত ক্রিয়াশীল ছিল।

ভারত বিভক্তির পর ভাষা প্রশ্নে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী একই ধরনের রাজনীতি শুরু করে। দেশ ভাগের পূর্বেই ভাষার প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে যখন ভারত বিভাগ নিশ্চিত হয় তখন তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে অনেকটা সিদ্ধান্ত করে ফেলেন। কিন্তু পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে এ নিয়ে তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৭ সালে মোহম্মদীতে ''পূর্ব পাকিস্তানের জবান'' শীর্ষক প্রবন্ধে আবুল মনসুর আহমদ বলেন,

> উর্দু নিয়া ধস্তাধস্তি না করিয়া আমরা সোজাসুজি বাংলাকেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে গ্রহন করি। তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মুসলিম বাঙালার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত রূপায়নে হাত দিতে পারিব। জাতির যে অর্থ, শক্তি ও উদ্যম উর্দু প্রবর্তনে অপব্যয় হইবে তাহা যদি আমরা শিক্ষা সাহিত্যে নিয়োজিত করি তবে পূর্ব পাকিস্তানকে আমরা শুধু ভারতে নয়, সমগ্র জগতের এমনকি গোটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করিতে পারিব।[৩৮]

উপরের বক্তব্যই ছিল চিরাচরিত বাঙালি চেতনার মূর্ত প্রকাশ। এতদসত্বেও মুসলিম লীগের তথাকথিত অভিজাত নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা এবং হিন্দু সংস্কৃতি ও পৌত্তলিকতার ভাষা বলে বর্জন করার জন্য মত প্রকাশ করেন।[৩৯] পাকিস্তানের এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য উর্দুকে ধর্মীয় আবরণ দেয়া হয়। এই হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা হাজার বছরে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধশালী বাংলা ভাষাকে হিন্দুত্ববাদী আখ্যা দিয়ে তাদের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কুৎসিত রূপের বহিঃপ্রকাশই ঘটালেন।

পাকিস্তানী এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অবাঙালি বুদ্ধিজীবিরা প্রচারণায় নেমে যায়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জিয়াউদ্দিন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, হিন্দিকে যেহেতু ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা হচ্ছে, উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত।[৪০] অথচ বাংলা যদি হিন্দুয়ানী ভাষা হয় তবে উর্দুও একই দোষে দুষ্ট। কেননা শুধুমাত্র ফার্সি হরফে লিখিত হওয়ায় এটি মুসলমানদের ভাষা হতে পারে না। উর্দু ভাষার শব্দ ভান্ডারের একটি বড় অংশ হিন্দি ভাষা থেকে গৃহীত। এছাড়া উর্দু ভাষার জন্ম ও বিকাশ ভারতের মাটিতে। ড. জিয়ার এই অভিমতের পরে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক বাংলার ভাষার পক্ষে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রচেষ্টা ছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর চরম অবিবেচনা প্রসূত এবং নিপীড়নমূলক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। কেননা উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করা হলে পূর্ববাংলা মানুষ ভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন হত। বাক্যগঠন, ধ্বনিতত্ব এবং ব্যাকরণগত দিক থেকে উর্দুর সাথে পাঞ্জাবী, মুলতানী, সিন্ধি ইত্যাদি ভাষার অনেকটা মিল থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের কোন সমস্যা হত না।[৪১]

পাকিস্তানের মহান নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নিজের ঘোষিত নীতিকেই প্রত্যাখ্যান করলেন, যা তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্বোধনী ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন।[৪২] এই নীতি গ্রহণের মাধ্যমে একদিকে একটি জাতিসত্তার প্রতি চরম বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, তেমনি উর্দুকে ধর্মীয় আবরণে প্রচার করার মাধ্যমে একটি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিফলিত হয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য বিভিন্ন যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হলেও এটি আসলে কোন ধর্মীয় ভাষা ছিল না। আবার এটি কোন অঞ্চলের মানুষের মাতৃভাষা হিসেবও প্রচলিত নয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই আজাদ পত্রিকায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 'সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লেখেন। সেখানে তিনি বলেন,

> উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেরই মাতৃভাষারূপে চালু নয়। উপরোক্ত ভাষা সমূহের মধ্যে বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছে। যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই।[৪৩]

অবশ্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্যের পরবর্তী অংশের কিছু বিষয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বাংলা, আরবি উর্দু এবং ইংরেজীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেন। তবে ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ শুধুমাত্র উর্দুকে ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীকে সমর্থন করেননি। তিনি বাঙালির আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেন।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের বহুপূর্বেই ভাষা সংক্রান্ত বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এতে একদিকে ভারতীয় ইউনিয়নের ভাষা হিসেবে হিন্দি ভাষাকে প্রস্তাব করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। পাকিস্তানের রাষ্টভাষা হিসেবে উর্দুকে প্রস্তাব করেন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ। তবে বাঙালি নেতৃবৃন্দ বাংলাকে ভারত ও পাকিস্তান উভয় অংশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। এর স্বপক্ষে কিছু কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনও দাবি উত্থাপন করে। এরকম একটি দাবি উত্থাপন করা হয় কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত এক সভায়। এই সভায় ভারতীয় ইউনিয়নের গনপরিষদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ কমিটিকে অনুরোধ করেন। সেই সাথে বাংলাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের যে দাবী পূর্ববাংলার জনগন করেছে তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।[৪৪]

দীর্ঘদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণ যখন নতুন দিনের প্রতীক্ষায় স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করে, পূর্বদিগন্তে ভোরের সোনালী সূর্য উদিত হওয়ার জন্য অধীর অপেক্ষা করতে থাকে ঠিক সেই মুহূর্তে পুর্ববাংলার জনগণ আশাভঙ্গের আওয়াজ শুনতে পান। পূর্ববাংলার জনগণের সমস্ত দাবি উপেক্ষা করে সদম্ভে ঘোষণা করা হয় উর্দুই হবে পাকিস্তানের এক মাত্র রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাদেরকে বাক প্রতিবন্ধী জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিল। যাতে করে বাঙালি তাদের সকল অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হয়। এই আঘাত ছিল একটি জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যকে বিনষ্টের চক্রান্ত।

পূর্ববাংলার ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক বৈষম্যনীতির প্রতিবাদে বাঙালিরা প্রতিবাদে শামিল হয়। কিন্তু সংখ্যালঘুদের প্রতি পাকিস্তানীদের গৃহীত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং পূর্বাপর কিছু ঘটনাবলি হিন্দুদেরকে এমনি ভীতসন্ত্রস্ত করেছিল যে ভাষা প্রশ্নে তাঁদের ভূমিকা কি হবে সে প্রশ্নে খানিকটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। পাকিস্তানে হিন্দুদের জন্য পরিস্থিতি এত প্রতিকূল ছিল রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ঘোষণার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ছাত্র ধর্মঘট এবং ঢাকার রাজপথে প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশি এ্যাকশন ও জেলজুলুম-

নির্যাতন শুরু হলে হিন্দু নেতারা বিবৃতি দিয়ে জানাতে বাধ্য হয়েছিল যে তাঁরা এ আন্দোলনে নেই। পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে ১৩ মার্চের অধিবেশনে বিরোধী দলীয় নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতিতে থেকে সেরকমই ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

> ঢাকায় গত বৃহস্পতিবারের লঠি চালানো সম্পর্কে আমি পুরো বিবরণ পাই নাই। কিন্তু আমি জানি, ঢাকায় ভাষার প্রশ্ন লইয়া বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা চলিতেছিল। কিছুদিন পূর্বে যখন বাঙ্গালী মুসলমানরা সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে আসিয়া তাহাদের দাবি জানায়, তখন এক ঘটনা ঘটে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, আন্দোলনে বাঙ্গালী হিন্দুরা অংশ গ্রহণ করে নাই।[৪৫]

এই বক্তব্য পাকিস্তানে হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কিছুটা চিত্র প্রদান করে মাত্র। এর পূর্বেও স্বাধীনতা উদযাপনের প্রথম দিনেও হিন্দুদের মুসলিমদের তুলনায় বেশি তৎপরতার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে, তাঁরা পাকিস্তানের প্রতি কতবেশি অনুগত। ভাষার মত মৌলিক অধিকারের প্রশ্নেও তাঁদেরকে এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে পাকিস্তানের প্রতি গভীর আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়েছিল।

এতদসত্ত্বেও পূর্ববাংলার জনগণ চুপ করে বসে থাকেনি। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট পালনের ঘোষণা ছিল পাকিস্তানীদের প্রতি সতর্কবার্তা। পূর্ববাংলার মানুষের জন্যও এটি ছিল একটি অগ্নি পরীক্ষা। পাকিস্তানীদের এই পরিকল্পনা সফল হলে রাজনৈতিক অঙ্গনে পূর্ববাংলার অবস্থান হতো অকিঞ্চতকর। পূর্ববাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তি রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার যে সূচনা হয় তা পরবর্তীতে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আরও বেগবান হয়। ভাষা আন্দোলনই ভবিষ্যৎ রাজনীতির প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক, শ্রমিক নারী-পুরুষসহ সর্বস্তরের মানুষ অধিকার আদায়ের মিছিলে একত্রিত হয়। এই আন্দোলনে নারীদের অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে প্রথমবারের মত পূর্ববাংলার ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলো। ভবিষ্যৎ স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ কর্মসূচি ভাষা আন্দোলনের এই মিছিল থেকেই গ্রেফতার হন। এভাবেই তাঁর ওপর জেল-জুলুমের সূচনা হয় যা পূরো পাকিস্তান শাসনামল জুড়ে অব্যাহত থাকে। ভবিতব্যের বাঙালির মুক্তির দিশারী যুবক শেখ মুজিব বাঙালির আত্মজাগরণের এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি। এরপর তিনি বারে বারেই গ্রেফতার হয়েছেন। ১৯৪৯ সালে তিনি কারান্তরীণ অবস্থায় পূর্ববাংলা আওয়ামী-মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে জেলে বন্দী অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান ২১ ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনই পূর্ববাংলার পরবর্তী রাজনৈতিক গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। ভাষা আন্দোলনের অভিঘাত পূরো বাঙালি জাতিকে আলোড়িত করে। যাঁরা সরাসরি ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়নি তাঁরও আত্মিকভাবে যুক্ত ছিলেন এর সাথে। এই আত্মিক সংযুক্তিই পরবর্তী সকল রাজনৈতিক আন্দোলনকে

বেগবান করেছিল। সাংস্কৃতিক জাগরণে বাঙালির এই সম্পৃক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে শেখ মুজিবুর রহমান ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছেন তাঁর অভিষ্ঠ লক্ষ্যে। কাজেই ভাষা আন্দোলন ছিল পূর্ববাংলার সুপ্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিকে জাগ্রত করার এক মোক্ষম হাতিয়ার। সুতরাং পূর্ববাংলার রাজনৈতিক উত্থানের প্রাথমিক ভিত্তি হলো ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক জাগরণ।

৫.২ পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫১-৫২ সালে ভারতে প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেনি। ১৯৫৪ সালে পূর্বাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যা পাকিস্তান সৃষ্টির পর জনগণের সরাসরি ভোটে প্রথম কোন নির্বাচন। এটি 'যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন' নামেই অধিক পরিচিত। এ নির্বাচনে আওয়ামী-মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি[৪৬], নেজামে ইসলাম এবং গণতান্ত্রিক দল নির্বাচনী মোর্চা গঠন করে যা যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিত। এই নির্বাচন পাকিস্তানের ভবিষ্যত রাজনৈতিক গতিপথ নির্ধারনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণ আশা করেছিল এই নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশিত শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিকাশের পথ সুগম হবে। আওয়ামী-মুসলিম লীগের কিছু নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এককভাবে এই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। পূর্ববাংলার অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে আওয়ামী লীগে যোগদানের অনুরোধ করা হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে তাকে সম্মানজনক পদ প্রদান এবং দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তাকে পূর্ববাংলার মূখ্যমন্ত্রী করা হবে বলেও আওয়ামী লীগের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর অদৃশ্য তৎপরতা এবং মুসলীমলীগের পরিত্যক্ত কিছু নেতার অপতৎরতার কারণে এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যেমন শেরে বাংলাকে মুসলীম লীগে ফিরিয়ে আনা যায়নি, ১৯৫৪ সালেও তিনি একই পন্থা বেছে নিলেন। তিনি কৃষক-শ্রমিক পার্টি নামে নতুন দল গঠন করলেন। মুসলীম লীগের কিছু সুযোগ সন্ধানী নেতা তার দলে যোগদান করলেন। এসময়ে যুক্তফ্রন্ট নামে যে নির্বাচনী মোর্চা গঠিত হয় সেখানে মনোনয়ন পাবার অশুভ তৎপরতা লক্ষ করা যায়। একই ব্যক্তি এক দল থেকে মনোনয়ন না পেয়ে অন্য দল থেকে মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচন করার নজীরও সৃষ্টি হয় এ নির্বাচনে। এখানে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসকদের ন্যায় ভাগ কর শাসন কর নীতির মাধ্যমে পূর্ববাংলার রাজনীতিকদের একতাবদ্ধ শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া থেকে বিরত রাখার তৎপরতা লক্ষ করা গেছে।

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর সব ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের পতন ঠেকানো যায়নি। অবাঙালি মুসলিমদের প্রভাবাধীন মুসলিম লীগ পাকিস্তান আন্দোলনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করলেও এটি

পূর্ববাংলায় জনগণের দলে পরিণত হতে ব্যর্থ হয়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট বিপুল বিজয় অর্জন করে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তাঁদের ষড়যন্ত্র সফল না হলেও তাঁদের প্রচেষ্টা থেমে যায়নি। এবার তাঁরা নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করে। যুক্তফ্রন্টের সর্ববৃহৎ দল আওয়ামীলীগকে বাদ দিয়ে ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল মন্ত্রী পরিষদ শপথ গ্রহণ করে। কৃষক প্রজা পার্টির শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রধান মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এছাড়া আজিজুল হক নান্না মিয়া, আবু হোসেন সরকার এবং নেজামে ইসলাম পার্টির আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ মন্ত্রী পরিষদের অন্তর্ভূক্ত হন। নেজামে ইসলামের মত নামসর্বস্ব দল মন্ত্রীপরিষদে স্থান পেলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা হয়। এধরণের অশুভ তৎপরতা পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিতবহ। পরবর্তীকালে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে আওয়ামী লীগের সদস্যদের অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং ১৯৫৪ সালের ১৫ মে পুনর্গঠিত মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। এদিন শপথ গ্রহণ করেন আতাউর রহমান খান, কফিলুদ্দিন চৌধুরী, আবদুস সালাম খান, শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, হাসেমউদ্দিন, আর হায়দার চৌধুরী, মোহন মিয়া, এ এল বিশ্বাস এবং সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ।[৪৭] সেদিন কেউ কি বুঝতে পেরেছিল যে, মঞ্চে সরকারে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান চললেও পর্দার অন্তরালে চলছিল অন্য এক খেলা? শপথ নিয়েই মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদেরকে ছুটে যেতে হয়েছিল সরকারের অদৃশ্য হাতের ইশারায় সংঘটিত দাঙ্গা পীড়িত আদমজী জুট মিলে। সেদিনই সকাল ১১ টায় আদমজী পাটকলে বাঙালী ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। খবর পেয়ে শপথ গ্রহণ শেষে সব মন্ত্রীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। আদমজী জুটমিলে সংঘটিত দাঙ্গার অজুহাতে প্রাদেশিক সরকারের ব্যর্থতার কারণ দেখিয়ে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে মন্ত্রী পরিষদ ভেঙে দেয় হয়।[৪৮] আওয়ামী লীগকে মন্ত্রী পরিষদে না নেওয়া আদমজী জুট মিল এবং চন্দ্রঘোনা কাগজ কলে সংঘর্ষ ইত্যাদি ছিল একই চক্রান্তের অংশ।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার জন আকাঙ্ক্ষার প্রতি শুধু অসম্মান প্রদর্শন করাই হয়নি, সেই সাথে গণতান্ত্রিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হলো। গণতান্ত্রিকভাবে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত সরকারকে বরখাস্ত করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী গণতন্ত্রের প্রতি তাদের অনিহার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন। মন্ত্রী পরিষদে আওয়ামী লীগ সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির দিনেই দাঙ্গার ঘটনা পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্রের গভীর ইঙ্গিত বহন করে। শুধু সরকার ভেঙ্গে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হলেন না নির্বাচিত গণপ্রতিধিসহ আওয়ামীলীগ নেতাদেরকে নির্বিচারে গ্রেফতার করে প্রথমে দাঙ্গা-হঙ্গামার অভিযোগে এবং পরবর্তীকালে নিরাপত্তা আইনে বিনাবিচারে কারান্তরীণ করে রাখা হলো মাসের পর মাস। পূর্ববাংলার জনগণ যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন তা ভেস্তে গেল। এই নির্বাচন পাকিস্তানীদের জন্য একটি পরীক্ষা হিসেবে দেখা যেতে পারে। যে দল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করল সেই দলটি মাত্র সাত বছরের ব্যবধানে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক মনন থেকে অনেকটা ধুয়ে-মুছে গেল।

এটি পূর্ববাংলার অধিবাসীদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্রবোধের বড় দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যায়। অন্যদিকে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে ক্রিয়াশীল বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সংহতির অভাবকেও দৃশ্যমান করে। কেননা এত বড় বিজয় নিয়েও যুক্তফ্রন্টের শরীক দলগুলো সরকারের অদৃশ্য রাজনৈতিক শক্তির ইশারায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলায় সরকার ভাঙ্গাগড়ায় খেলায় মেতে ওঠে। তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে এদেশের কিছু দালালচক্র হাত বাড়িয়ে দেয়। দলভাঙা এবং দল গড়ার রাজনীতির যে সংস্কৃতি বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনও চালু আছে তা এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সূচিত হয়। রাজনীতিতে উচ্ছিষ্টভোগী দালালচক্রের যে উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তারও সূচনা হয় এ সময় থেকেই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তোষামদী, দালালতন্ত্রের অপতৎপরতা, দল ভাঙাগড়ার খেলা, ইত্যাদি অপসংস্কৃতি এ সময়ে জন্ম নেয়। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি সে সময় পাকিস্তানী শাসকচক্রের ষড়যন্ত্রের খেলায় যোগ না দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে তা মোকাবেল করতে পারত তবে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস হয়তো ভিন্নভাবে লেখা হতো। যা হোক, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পরবর্তী রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে আওয়ামী লীগ এককভাবে রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে এটি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। এই দলই পূর্ববাংলার রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি নির্ধারণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৫৪ সালের পরে জনগণের সরাসরি ভোটে আর কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে যখনই জনগণ সুযোগ পেয়েছিল অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ কার্যত পাকিস্তানী শাসন উৎখাতের পক্ষে রায় দিয়েছিল।

৫.৩ শাসনতন্ত্র তৈরিতে গড়িমসি

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান রচিত হয়। কিন্তু পাকিস্তান দীর্ঘ ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালে একটা সংবিধান রচনা করে বটে কিন্তু পূর্ববাংলার জনগণ সেটি সানন্দে গ্রহণ করতে পারেনি। এর মূল কারণ নিম্নরূপ:

প্রথমত, পূর্ববাংলাকে তাঁর প্রাপ্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করার অভিলাষ থেকেই সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া এত দীর্ঘ ও জটিল হয়। পূর্ববাংলার জনসংখ্যা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের একই সমান ১৫৫টি আসন প্রদান করা হয়। সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন প্রস্তাব সমূহ বিশ্লেষণ করলে শাসক গোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।[৪৯] সংবিধানে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসনবিন্যাসের পূর্ববাংলার দাবি উপেক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়ত, এই সংবিধান ছিল লাহোর রেজ্যুলেশনে বর্ণিত 'the constituent units shall be autonomous and sovereign[৫০]' এই মূল চেতনার পরিপন্থী। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার সময় থেকেই দলটি পূর্ববাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্ব-শাসন দাবি করে আসছিল। পূর্ববাংলার অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দাবিও ছিল প্রায় অভিন্ন। এই সব যৌক্তিক দাবিগুলো সংবিধানে উপেক্ষিত থেকে যায়।

তৃতীয়ত, পূর্ববাংলার জনগণ সর্বদা অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করে। কিন্তু সংবিধানে পাকিস্তানকে 'ইসলামিক স্টেট' এবং রাষ্ট্রের প্রধান হবেন 'ধর্মপ্রাণ' মুসলমান ইত্যাদি ধারা যুক্ত হয় যা পূর্ববাংলার মানুষের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মুল্যবোধের চেতার পরিপন্থী।

চতুর্থত, অনেক ত্যাগ আর আন্দোলনের পরে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বাংলা ভাষার যথাযথ মর্যাদা তাঁরা দেয়নি। উপরন্তু, বাংলাভাষা সংস্কার এবং 'পাক বাংলাভাষা' সৃষ্টির নামে ভাষার বিকৃতির প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।

যে পেক্ষাপটে পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠী ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত করেছিল, যার উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো পূর্ববাংলার জনগণের সেসব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে সেই পূরণো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত দেশ শাসিত হয়। আইনের শাসনের প্রতি কোন রকম সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি। দল ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে চরম স্বৈরাচারী আচরণ লক্ষ করা যায় নতুন রাষ্ট্রের শুরু থেকেই। এক ব্যক্তির হাতে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়। অন্যদিকে সংবিধান প্রণয়নের জন্য পাকিস্তানের কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী (পরবর্তীকালে সিএপি) যেটি গঠিত হয়েছিল সেটিও আইনের স্বাভাবিক পদ্ধতিতে গঠিত হয়নি। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হয়নি। প্রদেশভেদে শর্তের কিছুটা পার্থক্য থাকলেও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ ১৫ শতাংশের বেশী নাগরিক ভোটাধিকার পায়নি।[৫১] এ নির্বাচনের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে বিভক্ত ভারতের সিএপি গঠিত হবে সে কথাও ম্যানিফেস্টোতে বলা ছিল না। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হলে শূন্য আসনে নতুন সদস্য মনোনয়ন দেওয়া হয়। গোঁজামিল দিয়ে গঠিত পাকিস্তানের ৮০ সদস্য বিশিষ্ট সিএপির উদ্বোধনী সভায় ৬৯ জন অনুমোদিত সদস্য ছিল। দেশভাগের পর মনোনয়নের মাধ্যমে তা ৭৯ তে উন্নীত হয়। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ১৫জন অমুসলিম সদস্য ছিল। ১৯৪৯ সালের ৭ মার্চ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সংবিধান প্রণয়নের যে নীতিমালা ঘোষণা করেন তা In the Name of Allah, the Benificient, the marciful পবিত্র কোরআনের এই বাণী দিয়ে শূরু হয়। এছাড়া এখানে বলা হয় যে, ইসলাম ঘোষিত স্বাধীনতা, সাম্য, সহনশীলতা, সামাজিক ন্যায়বিচর ইত্যাদি গণতন্ত্রের ভিত্তি। মুসলমানরা তাদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করবে

কোরআন ও সুন্নআহ্‌র আলোকে। জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রস্তাবিত রেজলিউশনে এসব চিত্র দেখে ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত বলেন, পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জীবদ্দশায় এই রেজলিউশন তৈরি হলে বর্তমান যে চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তা হত না।[৫২] মুসলিম লীগ সদস্য ড. ইশতিয়াক হুসাইন কোরেশী সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'the best guarantee of minority's rights is the good-will of the mejority[53]' তাঁর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকারন্তরে মুসলিম লীগের সংখ্যালঘু বিদ্বেষী চেহারা উন্মোচিত হয়। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কাজেই এ ধরনের বক্তব্য প্রমাণ করে সংবিধানে যা-ই থাকুক না কেন সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত মনে করেন, এর মাধ্যমে ইসলামিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানকে একটি ধর্ম রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করছেন যেখানে সংখ্যালঘুরা 'জিম্মি' হিসেবে বিবেচিত হবে।[৫৪] আলোচনা শেষে ১২মার্চ রেজুল্যুশনটি গ্রহণ করে খসড়া সংবিধান প্রণয়ণের জন্য ২৫ সদস্যবিশিষ্ট বেসিক প্রিন্সিপল কমিটি (BPC) গঠিত হয়। বিরোধীদলের ১৮টি সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। ১০ জন হিন্দু সদস্যের সকলে বিভিন্ন প্রস্তাবের সংশোধনীর পক্ষে ভোট প্রদান করেন। কিন্তু মুসলিম সদস্যরা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন।[৫৫] সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ কেমন হবে তার একটি ধারণা পাওয়া যায়।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ধারণা ছিল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী কেন্দ্রিক। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দিন গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হলে তাঁর ক্ষমতা খর্ব করার জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সংস্কার করা হয়। সংবিধান প্রণয়নের মূলনীতিতে তা প্রতীয়মান হয়। ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লিয়াকত আলী খান Interim BPC রিপোর্ট উপস্থাপন করলে তাতে নানা বৈষম্যমূলক ও অগণতান্ত্রিক ধারা থাকায় পূর্ববাংলার সদস্যদের প্রতিবাদের মূখে তা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের তিনজন স্বতন্ত্র মুসলিম সদস্যও এর বিরোধিতা করেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দ সংবিধানে পৃথক নির্বাচনের ধারার তীব্র বিরোধিতা করেন। তারা পূর্বের তীক্ত অভিজ্ঞতা থেকে দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরোধিতা করে হিন্দূ-মুসলিম সম্বয়ে একটি জাতি গঠনের পক্ষে অবস্থান নেন। লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন BPC রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। মজার ব্যাপার হলো এবার পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের বিরোধিতায় এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এটি পূর্ববর্তী যে কোন খসড়ার চেয়ে ভালো ছিল।[৫৬] ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ আলী আহম্মদীয়া বিরোধী দাঙ্গার অজুহাতে নাজিমুদ্দিন সরকার বরখাস্ত করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী সরকার গঠন করেন। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ১৯৫৩ সালের ৭ অক্টোবর পরবর্তী BPC রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। এই রিপোর্ট আরও বেশী সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ছিল।

কোরআন ও সুন্নাহ্ পরিপন্থি কোন আইন প্রণীত হতে পারবে না এবং রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। সংবিধান প্রণয়ণের প্রধান বাঁধা ছিল পূর্ব-পশ্চিম প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে একমত হতে না পারা, তা পূর্ববাংলার মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের বক্তব্যে পরিস্কার হয়ে যায়।[৫৭] প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী চৌধুরী আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, ২৫শে ডিসেম্বর কায়েদে আজমের জন্ম দিনে জাতিকে সংবিধান উপহার দিতে পারবেন। কিন্তু বিপিসি রিপোর্ট অনুমোদনের এক মাস পর কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী ভেঙ্গে দেওয়ার পর ১৯৫৪ সালের মে মাসে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ দ্বিতীয় কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী গঠন করার আদেশ জারি করেন।[৫৮] পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমানসংখ্যক সদস্য নিয়ে ৮০ সদস্য বিশিষ্ট কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীতে ১১ জন সংখ্যালঘু সদস্যসহ, গঠন করার কথা বলা হয়। কতকগুলো নীতিমালার ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালের জুন মাসে দ্বিতীয় কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং জুলাই মাসে প্রথম সভায় মিলিত হন। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের সংবিধান কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী কর্তৃক গৃহিত হয়। এভাবে ভারত শাসন আইন থেকে পাকিস্তান সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, নির্বাচনের কোন তোয়াক্কা না করে নির্বাহী আদেশে ভাঙ্গা-গড়া চলছিল। আর সংবিধান প্রণয়নের নামে যে তৎপরতা চলছিল তাও পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি হতাশাজনক চিত্র উপস্থাপন করে।

৫.৪ রাজনীতির সামরিকীকরণ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই সামরিক-বেসামরিক আমলাদের প্রধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র একক ও অবাধ ক্ষমতা ভিতরে ভিতরে শীর্ষ সামরিক-বেসামরিক আমলাদেরকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তোলে। জিন্নাহর বয়স এবং অসুস্থতার সুযোগে তাঁর বিশ্বস্ত আমলাগণ বেশীর ভাগ কাজ তাঁর নামে চালিয়ে দিত।[৫৯] শাসনতান্ত্রিক বিধানাবলীর অনুপস্থিতির সুযোগে আমলারা যথেচ্ছা ক্ষমতার প্রয়োগ করতে থাকে। জিন্নাহ কতৃক ভারত শাসন আইনে ৯২ ক ধারা সংযুক্তির ফলে গভর্ণর-জেনারেল এককভাবে যে কোন প্রদেশের নির্বাচিত সরকারকেও বরখাস্ত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।[৬০] আইনের শাসনের অনুপস্থির কারণে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং গোষ্ঠীশাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়। সামরিক আমলাতন্ত্রের হস্তক্ষেপের কারণে গণতন্ত্র বিকাশের পথ রুদ্ধ হয় বার বার। পাকিস্তান সৃষ্টির ৯ বছরের মাথায় একটি সংবিধান প্রণীত হলেও সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা বিকাশের সুযোগ লাভ করেনি। মাত্র ২ বছর ৫ মাস ১৪ দিনের মাথায় সংবিধানের যবনিকা ঘটে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান 'শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের' মাধ্যমে প্রধান সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর জেনারেল

আইয়ুব খান তিন সপ্তাহের মাথায় মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে বিতাড়িত করেন। বেসামরিক আমলা আজিজ আহম্মদকে উপ-প্রধান সামরিক প্রশাসক নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে এটি পরিস্কার হয়ে যায় যে, সামরিক-বেসামরিক আমলারা রাজনৈতিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একাট্টা। রাজনৈতিক নেতা ও জনগণের প্রতি আমলাদের অবজ্ঞাসূচক মনোভাব কোনভাবেই গোপন থাকেনি। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা 'পাকিস্তান এখনও গনতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত নয়' বলে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমর সাংবাদিকদের কাছে মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পাকিস্তানের সাধারণ জনগণকে অশিক্ষিত এবং রাজনীতিবিদদের নির্বোধ বলে মন্তব্য করে। নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে পূর্ববাংলার নেতাদের দায়ী করে 'গুরুতর ভুলগুলো শোধরাবার জন্য 'কোন লোকের' প্রয়োজন বলে তিনি সামরিক শাসনের পক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন।[৬১] এভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চরিত্র হনন করে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পাশ কাটিয়ে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার মত জঘন্য নজীর স্থাপন করা হয়। এই সামরিক ক্যু'র আগে সামরিক-বেসামরিক আমলাদের প্রভাবে পাকিস্তানে কতকগুলি বেসামরিক ক্যুও সংঘটিত হয়।[৬২] গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা চলমান থাকলে পূর্ববাংলা অবধারিতভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে চালকের আসনে থাকত। পূর্ববাংলাকে রাজনৈতিকভাবে দাবিয়ে রাখার জন্য নানান কায়দা-কানুন করে সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে দীর্ঘয়িত করা হয়। অবশেষে সংবিধান প্রণীত হলে পূর্ববাংলায় সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বেশী রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিকাশের পথ সুগম হয়। এই নিয়ন্ত্রিত সম্ভাবনাকেও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র মেনে তিতে প্রস্তুত ছিল না, সে কারণে সংবিধান বাতিল করে অগণতান্ত্রিক সামরিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববাংলার বেসামরিক প্রশাসনেও সামরিক আমলা নিয়োগ করা হয়। রাষ্ট্রের সর্বত্র সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এসময় পাকিস্তানে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম এতই বেড়ে যায় যে, জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনকালে ভারত ভ্রমণকালে একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মন্তব্য করেন যে,"There are only two Political Parties in Pakistan- the Army and the bureaucracy".[৬৩] পাকিস্তানী সাংবাদিকের মন্তব্যের মধ্যদিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামরিক চরিত্রের সত্যতা বেরিয়ে আসে। পাকিস্তানের রাজস্ব বাজেটের শতকরা ৫৫ শতাংশ অব্যাহতভাবে সামরিক খাতে ব্যয় করা হয়। আইয়ুব খান তাঁর শাসন ব্যবস্থায় বেসামরিক চরিত্র প্রদান করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি একটি সংবিধান প্রদান করে। সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয়। এই সংবিধানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সামরিক বাহিনীর লে. জেনারেল বা তদুর্ধ্বো পদমর্যাদার কোন অফিসারের জন্য ২০ বছরের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। তিনি তাঁর প্রতি অনুগত দুজন শিয়া অফিসার জেনারেল মুসা এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে অর্ধডজন অফিসারের জ্যেষ্ঠতা লংঘন করে পর্যায়ক্রমে সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। জেনারেল আইয়ুব খান নানানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর অনুগত অভিজাত শ্রেণি সৃষ্টি করে

তাঁর শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রী সৃষ্টি করেন। পূর্ববাংলার মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য 'উন্নয়ন দশক' ঘোষণা করেন। কিন্তু পূর্ববাংলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক জাগরণ তৈরি হয় তাঁর ঢেউ আয়ুবীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করে। আইয়ুব খানের শাসমামলে পূর্ববাংলায় বেশ কিছু দৃশ্যমান উন্নয়ন সাধিত হলেও জনগণের মন জয় করা সম্ভব হয়নি। কেননা আইয়ুব খানের শাসনামলে তথাকথিক 'মৌলিক গণতন্ত্রের' নামে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মৌলিক কাঠামোকে পরিবর্তন করে সাধারণ জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়। তাঁকে গণ-অভ্যুত্থানের পরিণতি ভোগ করতে হয়।

রাজনৈতিক উত্থানকে সামাল দেওয়ার জন্য ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের বিশ্বস্ত জেনারেল ইয়াহিয়া খান দ্বিতীয়বারের মত সামরিক শাসন জারী করেন। এবারে তিনি প্রশাসনকে পুরোপুরি সামরিকীকরণ করেন। নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানদ্বয় তাঁর উপ-প্রধানসামরিক শাসক হিসেবে নিযুক্ত হন। পাকিস্তানী শাসন ব্যবস্থায় যে সামরিক কোটারী তেরী হয় তাঁর নেতৃত্ব দেন আর্মি চিফ অব ষ্টাফ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার লে. জেনারেল পীরজাদা, প্রথম কোর কমান্ডার এবং পরবর্তীকালে পূর্ববাংলার গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান, চিফ অব জেনারেল স্টাফ লে. জেনারেল গুল হাসান, আন্তঃগোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান জেনারেল আকবর খান, জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল ওমর খান, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান জেনারেল ভাইস এডমিরাল মোজাফ্ফর হাসান এবং এয়ার মার্শাল রহিম খান প্রমুখ। এসব সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা পূর্ববাংলার জনমতকে দমন করে পাকিস্তানী শাসন ও শোষণ দীর্ঘায়িত করার এজেন্ডা নিয়ে মাঠে নামে। ২৫ মার্চ পূর্ববাংলার জনগণকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যে ক্র্যাকডাউন প্ল্যান তৈরি করা হয় তাতে সায় না দেওয়ায় এডমিরাল আহসানকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁর পরিবর্তে জেনারেল টিক্কা খানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এতসব পরিকল্পনা করেও ষড়যন্ত্রের প্রাসাদের পতন রোধ করা যায়নি। 'মার্শাল রেস' হিসেবে আত্ম-অহমিকায় আচ্ছন্ন পাঞ্জাবীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা তৎকালীন সময়ের অন্যতম শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার ঐক্যবদ্ধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শক্তি মিলিত প্রচেষ্টার জয় হয়।

৫.৫ বাঁচার দাবী ৬-দফা

পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোয় পূর্ববাংলার রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা রাজনৈতিক অঙ্গনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রেখেছিল। এই কর্মসূচি প্রচারের পর পূর্ববাংলার রাজনীতি ৬-দফাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। পূর্ববাংলার সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং মানুষের চিন্তা-চেতনার সব কিছুই ৬-দফা কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। ১৯৬৫ সালে কাশ্মির প্রশ্নে পাক-ভারত যুদ্ধের পেক্ষাপটে ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে পাকিস্তানের বিরোধী দলসমূহের একটি

কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান সাবজেক্ট কমিটিতে ৬-দফা এজেন্ডাভূক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে ৬-দফা কর্মসূচি প্রচার করেন।[৬৪] পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে দিক পরিবর্তনীয় ভূমিকা রাখে।

৬-দফা কর্মসূচিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'আমাদের বাঁচার দাবি' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। এই প্রত্যয়ের মাধ্যমে একদিকে জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করেছিলেন অন্যদিকে জনগণের মৌলিক অধিকারের বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফার প্রচারপত্রে বলেছিলেন, 'আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত-বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই'।[৬৫] বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ৬-দফা কর্মসূচি প্রদান অনেকের কাছে আকস্মিক ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে বিরোধীদল কর্তৃক জনগণের পক্ষে দাবী-দাওয়া উত্থাপন একটি সাধারণ ঘটনা। তবে সেই কর্মসূচি প্রণয়নে সঠিক সময় নির্বাচন এবং তাতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারাটাই একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুবই দক্ষতার সাথে সে কাজটি করতে পেরেছিলেন। নানা কারণে ৬-দফাকে একটি ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যসূচক রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে দেখা যেতে পারে।

প্রথমত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচি নিয়ে লাহোরে যান পাকিস্তানের বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় কনভেনশনে যার আলোচ্য সূচি ছিল ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ এবং তাসখন্দ চুক্তির প্রেক্ষাপটে করণীয় নির্ধারণ। অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তিনি সাবজেক্ট কমিটির বৈঠকে ৬-দফাকে এজেন্ডাভূক্ত করতেই ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে সেই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে রাজনীতির মাঠে সবচেয়ে জনপ্রিয় এজেন্ডায় রূপান্তর করেন তাঁর সহজাত রাজনৈতিক প্রতিভা দ্বারা।

দ্বিতীয়ত, এই কর্মসূচির দফাগুলি এমন ছিল যে, এটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক চক্রের জন্য উভয় সংকট। এই ৬-দফার পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে পূর্ববাংলা প্রায় স্বাধীন একটি রাষ্ট্রে পরিণত হতো তবে পাকিস্তানের সাথে এক ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক থাকত। আবার এই দাবিগুলোর মধ্যে এমনভাবে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল যে, এটি না মানলে এর ভিত্তিতে অধিকাংশ জনগণের অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে ওঠা সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র। পরবর্তীতে হয়েছিলও তাই।

তৃতীয়ত, এই কর্মসূচি তিনি ঘোষণা করেন খোদ পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে। রাজনৈতিক ঝুকি নিয়ে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার স্পর্ধা একমাত্র তাঁরই ছিল। কেননা, তাঁর এই স্পর্ধার ভিত্তি হলো জনগণ।

৬-দফা কর্মসূচির মর্মার্থ পাকিস্তানের সমর্থক এবং পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বুঝতে দেরি হয়নি। সেজন্য পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল বিরোধী দল সরকারের সাথে এক সূরে এর বিরোধিতা করেছিলেন। এমন কি পূর্ববাংলার অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এর বিরোধিতা করেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাউন্সিল) সহ-সভাপতি খাজা খয়ের উদ্দিন এম, এন, এ এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিকুল ইসলাম এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন "৬-দফা কর্মসূচি পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। জনাব শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার ৬-দফা পরিকল্পনাকে ফেডারেশন হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন, কিন্তু ফেডারেশন ও দুইটি প্রদেশের মধ্যে কর্তৃত্ব বন্টনের ধরণ দেখিয়া মনে হয় জনাব রহমানের অভিপ্রায় "কনফেডারেশন" ফেডারেশন নয়। কিন্তু সুস্পষ্ট কারণে তিনি ইহাকে 'ফেডারেশন' হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন"।[৬৬] ৬-দফা ঘোষণার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। তিনি রাজশাহীতে মৌলিক গণতন্ত্রীদের বিভাগীয় সম্মেলনে বলেন, 'পাকিস্তান জন্মের সময় হইতে কোন কোন নেতা বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার যে অভিলাষ পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, বর্তমান পরিকল্পনা তাহার সহিত সম্পর্কিত। এই জঘন্য স্বপ্ন বাস্তবায়িত হইলে তাহা দেশের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানবাসী গোলামে পরিণত হইবে'[৬৭] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতে, এই কর্মসূচি শুধু পূর্ববাংলার নয় পশ্চিম পাকিস্তানের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্যও রক্ষা কবচ। সবাই ধারণ করার এক অসাধারণ ক্ষমতাই তাঁকে রাষ্ট্রনায়কোচিত নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে।

শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলার মানুষের মনের ভাষা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সূচিন্তিতভাবে ৬-দফা কর্মসূচির দফাগুলি প্রণয়ন করেন। এক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্দ জ্ঞান, পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপট, বাঙালির ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর নিজস্ব রাষ্ট্রধারণার সমন্বয় ঘটান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোন দফা তিনি এখানে যুক্ত করেননি। ৬-দফা কর্মসুচি ঘোষণার পর যে প্রচারপত্র তিনি প্রকাশ করেন সেখানে তিনি দফাগুলির যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। দফাগুলি যে অযৌক্তিক নয় এবং দফাগুলির যে ঐতিহাসিক এবং আইনানুগ ভিত্তি রয়েছে তা বোঝাবার জন্য এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন। সেখানে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ম্যানিফেস্টো, ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট প্রাপ্তির বিষয়ে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। ফেডারেল রাষ্ট্র ব্যবস্থা যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে যে এসকল ব্যবস্থা চর্চিত হচ্ছিল তা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি প্রদেশ শব্দের পরিবর্তে 'স্টেটস্' শব্দটি ব্যবহার করেন যা ফেডারেল রাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তিনি শুধু পূর্ববাংলার কথা না বলে 'স্টেটসমূহের' সার্থ নিয়ে কথা বলেছেন। পূর্ববাংলা জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হলেও তিনি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংখ্যাসাম্যের কথা বলেছেন। এই প্রস্তাবে তিনি রাষ্ট্রনায়কোচিতভাবে উভয় অংশের মঙ্গলের কথা বলেছেন। সবচেয়ে বড়

কথা তিনি এই প্রস্তাবে জনসমর্থন যাচাইয়ের জন্য গণভোটেরও প্রস্তাব দেন। তাঁর এই অভিপ্রায় জনগণের ওপর আস্থা এবং গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কাজেই ৬-দফা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার আলোকে শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা প্রণয়ন করেন। বাঙালির রাষ্ট্র আকাঙ্ক্ষার এই সহজাত ভাবনাটাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বের আলোকে যুক্তিগ্রাহ্য করে এর পূর্বে কেউ উপস্থাপন করতে পারেননি। তিনি এত সহজভাবে এবং যুক্তিগ্রাহ্য করে বিষয়টি উপস্থাপন করলেন যে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারলেন তাঁদের কথাই তিনি বলেছেন ৬-দফা কর্মসূচিতে। সে কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ ৬-দফার ডাকে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। এই কর্মসূচি পূর্ববাংলার সমস্ত সমাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তিকে রাজনৈতিক শক্তির সাথে সংযুক্ত করে। এটিই ছিল পূর্ববাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের টার্নিং পয়েন্ট। বাঙালির ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ধারায় বঙ্গবন্ধুর পূর্বে আর কেই এভাবে বাঙালি জাতিকে এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড় করাতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু ৬-দফা কর্মসূচি দিয়ে বসে থাকেননি, এই কর্মসূচি নিয়ে তিনি পূর্ববাংলার মানুষের কাছে গিয়েছেন, পথে প্রান্তরে হেটেছেন, বাংলার মানুষকে প্রস্তুত করেছেন আসন্ন এক বিপ্লবের জন্য। তিনি ৬-দফা কর্মসূচি প্রচার করতে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়েছেন। এই প্রচারণার মাধ্যমে তিনি একদিকে জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছেন অন্যদিকে সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌছাবার জন্য রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করেছেন।

৬-দফা কর্মসূচিকে পাকিস্তান পন্থী কোন দল বা ব্যক্তি সমর্থন না করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলার সমমনা রাজনৈতিক দলেরও সমর্থন তিনি পাননি। এমনি নিজ দলের অনেক জ্যেষ্ঠ নেতাও এর প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা করেছেন। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঘোষণা করেন, 'তাহার দল পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গৃহিত কোন প্রচেষ্টায় শরীক হইবে না।'[৬৮] আওয়ামী লীগের অনেক প্রবীণ নেতা ৬-দফা নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। অনেক প্রবীন নেতা পিডিএম[৬৯] (পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন) এর পক্ষে অবস্থান নিয়ে দল ভেঙ্গে নতুন দল গড়ার চিন্তা করেছিলেন। পিডিএম এ যোগদান প্রশ্নে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে পিডিএম এ যোগদানের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত হলে আওয়ামী লীগ সুস্পষ্টভাবে দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।[৭০] তবে আওয়ামী লীগের অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতা-কর্মীরা ৬-দফার পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেন। ৬-দফার প্রশ্নে তিনি আপোষহীনভাবে ঘোষণা করে বলেন, 'সরাসরি রাজপথে যদি আমাকে একা চলতে হয়, চলবো। কেননা ইতিহাস প্রমাণ করবে বাঙালির মুক্তির জন্য এটাই সঠিক পথ।'[৭১] তিনি ছিলেন এমনি এক নেতা যিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন। বঙ্গবন্ধুর সেই বক্তব্য পরবর্তীকালে সঠিক প্রমাণিত হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বঙ্গবন্ধু ৬-দফা ঘোষণার পর অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে (১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ ১৯৬৬) এই কর্মসূচির দলীয় অনুমোদন নেওয়া হয়।

যুগ যুগ ধরে বাঙালি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে আসছিল, অথচ ৬-দফা ঘোষণার পর ছয় বছরও লাগেনি বাঙালির অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছতে। এই কর্মসূচি ঘোষণার মাত্র ৫ বছর ১ মাস ১৯ দিনের মাথায় তিনি বাঙালির কাঙ্ক্ষিত মুক্তি নিশ্চিত করতে সক্ষম হন। এই কর্মসূচি ঘোষণার পর তাঁর ওপর নেমে আসে নির্যাতনের খড়্গ। ৬-দফা কর্মসূচি প্রচার চলাকালে শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মাসে ৮ বার গ্রেফতার হন।[৭২] সর্বশেষ ৮ মে নারায়ণগঞ্জ জনসভায় বক্তৃতা শেষে ঢাকায় ফেরার পর গ্রেফতার হন। শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৭ জুন পূর্ববাংলায় হরতাল কর্মসূচি আহ্বান করা হয়। ৭ জুনের হরতাল কর্মসূচিতে ব্যাপকহারে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ লক্ষ করা যায়। এই ধর্মঘটে বেঙ্গল বেভারিজ ইন্ডাস্ট্রিজের শ্রমিক মনু মিয়াসহ অনেকে শাহাদৎবরণ করেন। পূর্বে শ্রমিকরা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধর্মঘট, মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করলেও ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলনা বলে অলি আহাদ উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য ৮ জুন গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে নারায়ণগঞ্জের জনসভায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহস্রাধিক শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে পাটের মালায় ভূষিত করেন।[৭৩] রাজনৈতিক কর্মসূচিতে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ ও আত্মা-হুতি দেওয়ার মাধ্যমে আন্দোলন আরও বেশী বেগবান হয়। উল্লেখ্য, ৭ জুনের হরতালে সরকারী প্রেসনোট অনুসারেই ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত হন।[৭৪] কাজেই বলা যায় ৬-দফা কর্মসুচিতে পূর্ববাংলার সকল ক্রিয়াশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তির সাথে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অধিকার আদায়ের মিছিল পূর্ণতা পায়। এভাবে পূর্ববাংলায় রাজনৈতিক কর্মসূচিকে জনসমম্পৃক্তকরণের নতুন ধারার সূচনা করে।

৫.৬ আগরতলা মামলা

পাকিস্তান শাসনামলের অর্ধেকের বেশি সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলে বন্দী ছিলেন। কখনো রাজনৈতিক অভিযোগের ভিত্তিতে আবার কখনো বিনা বিচারে বছরের পর বছর তাকে কারাজীবন ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু ১৯৬৬ সালে আগরতলা মামলার নামে তাঁকে ষড়যন্ত্র করে বিচারিক হত্যাকাণ্ডের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে পূর্ববাংলার সর্বস্তরের মানুষ এর প্রতিবাদে আন্দোলনে সংযুক্ত হয়। এই মামলায় যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল তাতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত ছিল। তাঁদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অধরাই থেকে যেত। সে কারণে এই মামলাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক জাগরণ পূর্ববাংলার মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬-দফা কর্মসূচি ও আগরতলা মামলা একই সূত্রে গাঁথা। কেননা ৬-দফা কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য দালাল চক্রের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পিডিএম গঠনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে দ্বিধাবিভক্ত ও দুর্বল করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দেওয়া হয়। ৬-দফা নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের দেশব্যাপী লাগাতার কর্মসূচি এবং তাতে ক্রমবর্ধমানহারে জনসম্পৃক্ততা শাসকগোষ্ঠীকে

ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। একের পর গ্রেফতার এবং কারান্তরীণ করে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দমানো যায়নি তখন তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়। আইয়ুব খানের সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে কারাবন্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে ৩৫ জনের নামে এ মামলাটি করে। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক প্রেসনোটের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা আইনে ইতোমধ্যেই কারাবন্দী শেখ মুজিবুর রহমানের আগরতলা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সাথে জড়িত থাকার প্রমান পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করা হয়।[৭৫] অবশ্য এই মামলাটি সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্যদের বিরুদ্ধে আগেই দায়ের করা হয়েছিল। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারী পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক প্রেসনোটের মাধ্যমে ২৮ জন আসামীর নাম প্রকাশ হয়েছিল। সেই তালিকায় শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ছিল না। এক নম্বর আসামী ছিল লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। শেখ মুজিবের নাম পরে যুক্ত করে তাঁকে এক নম্বর আসামী করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে মামলার বিচার কাজ শূরু হয়। এ মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র'মামলা হিসেবে সাধারণ মহলে খ্যাত হয়। আইনের ভাষায় এই মামলার নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য'। শেখ মুজিবকে পরে যুক্ত করেও এক নম্বর আসামী করায় এ মামলায় পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায়।

মামলার মূল বিবরণে জানা যায় কিছু সামরিক বেসামরিক অফিসার সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ এবং কর্মরত বঙালি অফিসার ও সিপাহীরা নিদারুণ বৈষম্যের শিকার হত। একই বাহিনীতে কর্মরত বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে এই বৈষম্য তাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। তাঁরা এই বঞ্চনার অবসানের পথ খুঁজছিল। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁদের মনে আশার সঞ্চার করে। তাঁরা লক্ষ করেছিলেন যে, পার্লামেন্টে শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক-বেসামরিক চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে বিভিন্ন সময় অত্যন্ত জোরালে বক্তব্য প্রদান করছিলেন। শেখ মুজিবের বক্তব্যে তাঁদের অভিব্যক্তির প্রকাশে তারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিছু অফিসার একে অপরের সাথে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। তাদের অভিপ্রায় ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে সমন্বয় করে শসস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ববাংলা স্বাধীন করা। গভীর দেশপ্রেম এবং অসীম সাহসিকতার সাথে তাঁরা এ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যান। অন্য দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিয়মতান্ত্রিভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন বেগবান করছিলেন। এটা ঠিক যে, ১৯৬৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁর অনুরোধে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওয়াহার লাল নেহেরুর সাথে সাক্ষাত করেন। তবে প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরায় অবস্থান করে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচার কার্য চালানোর

বিষয়ে সম্মত হননি। শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ দিন ত্রিপুরায় অবস্থান করে পূর্ববাংলায় ফিরে আসেন।[৭৬] বঙ্গবন্ধুর সেই সফর আগরতলা মামলার মূল ভিত্তি। তাঁর বিরুদ্ধে বিদেশের মাটিতে বসে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়।

এ মামলা পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে সাড়া জাগায়। মনস্তাত্ত্বিক ও সরাসরি পুরো জাতি এ মামলার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। পত্রপত্রিকায় বিশেষ করে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মামলার বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে। আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে আন্দোলনে মূল নের্তৃত্ব গ্রহণ করে ছাত্ররা। ছাত্র-জনতার আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। মামলা চলাকালে প্রকাশ পেতে থাকে যে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাক্ষীগণকে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়ায় একের পর এক সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করা হয়। এ মামলার মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে দণ্ডিত করে চলমান গণ-আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন করাই ছিল পাকিস্তানীদের মূল লক্ষ্য। বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবকে হত্যার উদ্দেশ্যেই এই মামলায় তাঁকে প্রধান আসামী করা হয়।[৭৭] ৬-দফা আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান হারে জনগণের অংশ গ্রহণ সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের অগ্রযাত্রাকে থামানোর জন্য নিপীড়নমূল পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন গণতান্ত্রিক উপায়ও সরকারের হাতে ছিল না।

আগরতলা মামলার আইনজীবি ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম আসামী পক্ষের আইনজীবী হিসেবে জেলখানায় অভিযুক্তদের সাক্ষাতকার গ্রহণকালে জানতে পারেন যে, পাকিস্তান সরকার উৎখাতে শেখ মুজিবসহ অন্য রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে শিকারোক্তি আদায়ের জন্য অভিযুক্তদের লোমহর্ষক নির্যাতন করা হয়। তা সত্ত্বেও তাদের দৃঢ়সংকল্প মনোভাব বদলানো যায়নি। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানও ছিলেন অত্যন্ত আত্ম-বিশ্বাসী। ঢাকা জেলখানা থেকে ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইবুনালে যাওয়ার সময় এক মুঠো মাটি হাতে শপথ করে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'মৃত্যু যদি হয় এই পবিত্র মাটিতে যেন মরতে পারি এবং সেই মৃত্যুতে যেন সারা বাংলাদেশের মানুষের সাথে মিশে থাকতে পারি।'[৭৮] শেখ মুজিবের এই অনমনীয় দৃঢ়তা রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিবসহ আরও কিছু অভিযুক্ত বেসামরিক নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ক্যান্টনমেন্টে স্পেশাল ট্রাহিবুনালে বিচার করা ছিল দুরভিসন্ধিমূলক।

এই মামলা পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্তরের মানুষকে আরও একতাবদ্ধ করেছিল। বিশেষ করে আইনজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, যুবসমাজ সর্বোপরি সারা দেশের মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মিছিলে শামিল হয়েছিল। ৬-দফা মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল। কিন্তু আগরতলা মামলার নামে

তাঁদের স্বপ্নদ্রষ্টার আসন্ন বিচারিক হত্যাকান্ডের আশঙ্কায় তাঁরা বিচলিত হয়ে পড়েন। জনগণের পক্ষে ঘরে বসে থাকা সম্ভব হয়নি। তাঁরা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিল।

এই মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের উত্থাপিত অভিযোগের কিছুটা ভিত্তি ছিল। সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সদস্যরা এ ধরণের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অবিচল, তিনি বিচার চলাকালে অন্যদেরকে সাহস যুগিয়েছিলেন। বিচার চলাকালে অভিযুক্তদের দৃঢ় মনোবল, আইনজীবীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, এবং গণজোয়ার মামলার বাদী পক্ষের কুশিলবদের দুর্বল করে দেয়। মামলার বাদী বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। সাজানো সাক্ষীগণ সত্য কথা বলতে বাধ্য হন। জনগনের চেয়ে বড় বিচারক আর কেই হতে পারে না তা প্রমাণিত হয়।

৫.৭ উণসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

আগরতলা মামলার প্রেক্ষাপটে গণ-আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতনই ইতিহাসে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত। পূর্ববাংলায় ছাত্রদের নেতৃত্বে যে গণ-আন্দোলন তৈরি হয়েছিল তা রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করে। কেননা এই আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তানের অভিজাততন্ত্রের প্রতীক সেনা শাসক থেকে বেসামরিক শাসকে রূপান্তরিত হওয়া আইয়ুব খানের পতন মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসের অনন্য নজীর স্থাপন করে। এছাড়া ছাত্রদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও বটে। কাজেই এই আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

আগরতলা মামলার অনেক অভিযুক্ত আসামী সামরিক বাহিনী থেকে অবসর প্রাপ্ত। শেখ মুজিবুর রহমান বেসামরিক ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক নেতা। কাজেই বিশেষ ট্রাইবুনাল করে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে বেসামরিক কোন অভিযুক্তকে আদালত বসিয়ে বিচার করার বিষয়টি ছিল আইনের শাসনের পরিপন্থি। তিনজন বিচারকের যে প্যানেল করা হয় হয়েছিল, তার প্রধান এস এ রহমান ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। সরকারের এই পদক্ষেপকে দেশবাসী সন্দেহের চোখে দেখে। তবে এই মামলাটি প্রকাশ্য আদালতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় মামলার বিবরণ ধারাবাহিকভাবে পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসী জানতে পারে।

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন অনেক ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। এই মামলা মোকাবেলা করার প্রক্রিয়াটাই একটা আন্দোলনে পরিণত হয় যা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। এটি পূর্ববাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের ভিন্ন একটি দিক। এই মামলার আইনজীবীরা মামলাটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচারের উদ্দেশ্যে লন্ডনের আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। লন্ডনের আইনজীবী ব্রিটেনের রাণীর উপদেষ্টা থমাস উইলিয়ামস্ কিউ.সি.আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য

পূর্ববাংলায় আসেন। তাঁর আসার মাধ্যমে এই মামলাটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচারিত হয়। দেশের আইনজীবীগণও এ মামলাকে কেন্দ্র করে একতাবদ্ধ হয়।

অন্যদিকে ছাত্ররা ১১ দফা দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। ছাত্রদের ১১ দফায় বঙ্গবন্ধুর ৬-দফাকে যুক্ত করে। ছাত্রদের আন্দোলনের পাশাপাশি শিল্প-কারখানার শ্রমিকরাও আন্দোলনে শামিল হন। সাধারণ মানুষের মধ্যেও জনমত গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে রাজপথ উত্তাল হতে থাকে। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ আন্দোলনে নের্তৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে। ছাত্রদের ধারাবাহিক কর্মসূচির মধ্যে কয়েকটি ঘটনা আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানের রূপ দেয়। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আহুত ছাত্র সমাবেশে যোগদান করতে আসা মিছিলে পুলিশের গুলিতে ঢাকা সেন্ট্রাল ল' কলেজের ছাত্র আসাদ নিহত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে পেছন থেকে গুলি করে কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করা হয়। আন্দোলনরত ছাত্রদের রক্ষা করতে গিয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টর অধ্যাপক শামসুজ্জোহার আত্ম-ত্যাগ আন্দোলনে নতুন মাত্র যুক্ত করে। গণ-আন্দোলন গণবিস্ফোরণে রূপান্তরিত হয়। সারাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। ছাত্রদের আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। সারা ঢাকা শহরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। সাধারণ জনগণ নজিরবিহিনভাবে ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে। আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি এস. এ রহমানের বসবাসকারী রাষ্ট্রীয় অতিথিভবনে আগুন ধরিয়ে দিলে তিনি কোন রকমে প্রাণে বেঁচে পালায়ন করেন। জেনারেল আইয়ুব খান পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য গোলটেবিল বৈঠকের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আইয়ুব খানের পক্ষে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব নিয়ে ঢাকায় আসেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে চেয়েছিল। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, এমন কি তিনি জামিনে মুক্ত হয়ার প্রস্তাবেও রাজি হননি। অশেষে সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী ফৌজদারী সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অর্ডিন্যান্স ১৯৬৮ নামক অধ্যাদেশ বাতিল করতে বাধ্য হন। ঐদিনই শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা মামলার অভিযুক্তরা মুক্তি পান।[৭৯] ২৩ শে ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রমনার রেসকোর্স ময়দানে গণসংবর্ধনা প্রদানের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধীতে ভূষিত করেন। অন্যদিকে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণের মাধ্যমে পদত্যাগ করে জেনারেল এ. এম. ইয়াহিয়া খানকে দায়িত্ব অর্পণ করেন।

আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয় ছাত্র-জনতা। সাথে যুক্ত হয় শ্রমিকরা। এই ঘটনা রাজনৈতিক অঙ্গনে ছাত্র-জনতার নেতৃত্ব প্রদান এবং বিজয় অর্জন বিকল্প রাজনৈতিক

নেতৃত্বের এক মাইল ফলক হিসেবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অহঙ্কারের প্রাসাদ নিমিষে ভেসে যায় ছাত্র-জনতার বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে। শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি না নিয়ে শেখ মুজিব বাঙালিকে অন্য এক উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

৫.৮ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

আগরতলা মামলা থেকে মুক্তির পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ববাংলার রাজনীতিতে প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। শেখ মুজিবুর রহমান কয়েক দফা গোল টেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণ করে। পূর্ববাংলার কিছু উগ্র বামপন্থী নের্তৃবৃন্দ এবং পিপলস্ পার্টি নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো বৈঠক বর্জন করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের এটি ছিল এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। সম্ভাব্য সকল বিকল্প তিনি কাজে লাগাতেন যেন কেউ কোন অজুহাত তৈরি করতে না পারেন। গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে তিনি কখনোই অবজ্ঞা করতেন না। ফলাফল সম্পর্কে পূর্ব ধারণা থাকা সত্ত্বেও তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ করতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১০-১৩ মার্চ কয়েক দফা গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন এবং ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ঘোষণা প্রদান করেন।

আগরতলা মামলায় জেনারেল আইয়ুব খানের গদি নড়বড় হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম মেরুকরণ চলছিল। ১৫ মার্চ তিনি জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমাদের দেশের ধ্বংসস্তুপের উপর সভাপতিত্ব করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'[৮০] ২৪ মার্চ তিনি জেনারেল এ এম ইয়হিয়া খানকে লেখা এক পত্রে সামরিক বাহিনী কর্তৃক শাসন ক্ষমতা গ্রহণের অনুরোধ জানান। ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করে নিজ হাতে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। ২৬ মার্চ বেতার ভাষণে একটি সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। একটি সুষ্ঠু ও গঠনমূলক রাজনীতি এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন।[৮১] প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা প্রদান করেন। এই ভাষণে ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর বলবত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়। ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে পুনরায় ভাষণের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এলএফও (Legal framework worder) এর রূপরেখা ঘোষণা করেন। এলএফও এর কতকগুলি ধারার ব্যাপারে পূর্ববাংলার মানুষ সন্দেহে প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়েছিল যে, জাতীয় পরিষদ কর্তৃক তৈরি সংবিধান কার্যকর করতে প্রেসিডেন্টের সম্মতি প্রয়োজন হবে। নির্বাচিত জাতীয় পরিষদকে ১২০ দিনের মধ্যে একটি সংবিধান তৈরি করতে হবে। এসময়ের মধ্যে না পারলে প্রেসিডেন্ট নিজেই সংবিধান

প্রণয়ন করবে। এই ঘোষণায় ১৯৭০ সালের ২২ অক্টোবরের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এলএফও এর তীব্র বিরোধিতা করেন। সামরিক শাসকের ধারণা ছিল কোন দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। কাজেই শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। আবার একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার আর কোন পথ খোলা ছিল না। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো অভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। তবে ১৯৭০ সালের ৭ জুন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভার মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণারণা শুরু করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আওয়ামী লীগ একভাবে নির্বাচনে প্রতিদন্দ্বিতা করে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনকে যেমন পকিস্তানের পক্ষে গণভোট হিসাবে বিবেচনা করা হয় তেমনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনও ছিল ৬-দফার পক্ষে গণভোট স্বরূপ। পরবর্তীকালে নির্বাচনের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

১৯৭০ সালের ১১ নভেম্বর মধ্যরাতে দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় এক প্রলয়ঙ্করী ঘুর্ণিঝড় আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ হানি ঘটে। পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতার কারণে ঘুর্ণিঝড় পরবর্তী ত্রাণতৎপরতা, উদ্ধার অভিযান এবং পুনর্বাসন কাজে চরম অবহেলা লক্ষ করা যায়। নির্বাচনী প্রচার স্থগিত রেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্গত এলাকায় ছুটে যান। এই ঘুর্ণিঝড়ের পর মাওলানা ভাসানী ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়ে বলেন 'ভোটের আগে ভাত চাই'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘুর্ণিঝড় কবলিত এলাকা থেকে ৯ দিনের সফর শেষে ঢাকায় ফিরে ২৬ নভেম্বর দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান সরকারের অপরাধমূলক অবহেলা এবং ঘুর্ণিঝড় আক্রান্তদের উদ্ধার এবং ত্রাণতৎপরতার উদাসীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে কোন অজুহাতে নির্বাচন পেছানো হলে গৃহ যুদ্ধ বাঁধবে। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাবে। তিনি ঘোষণা করেন পূর্ব পাকিস্তানের ১০ লক্ষ মানুষ মারা গেছে প্রয়োজনে মানুষকে মুক্ত করতে আরও ১০ লক্ষ লোক জীবন দিবে।[৮২] নির্বাচন না পিছিয়ে দুর্গত এলাকায় পরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দেন।

ইয়াহিয়া খান ২৭ নভেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকা ব্যতীত ৭ ডিসেম্বরই ইলেকশন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ১৫৩ আসনে এবং জাতীয় পরিষদের ২৮২ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একই দিনে পশ্চিম পাকিস্তানেও প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ববাংলায় ঘুর্ণিঝড়ের কারণে স্থগিতকৃত আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারী। মাওলানা ভাসানীর ন্যাপ, আতাউর রহমান খানের পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ নির্বাচন বর্জন করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে পেরেছিলেন। আরও কয়েকটি কারণে এই নির্বাচন ইতিহাসে মাইল ফলক হিসাবে বিবেচিত। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে পাকিস্তানের এটিই প্রথম নির্বাচন। প্রাপ্ত বয়সের ভিত্তিতে সকল নারী-পুরুষ এই প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এবারই প্রথম 'এক ব্যক্তির এক ভোট' ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উপমহাদেশে এই প্রথম রাজনৈতিক দলের প্রধানগণ রেডিও-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে নির্বাচনী ভাষণ প্রদান করেন।[৮৩] ১৯৭০ সালের ২৮ শে নভেম্বর আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্ব প্রথম ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু যে সকল প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তাতে জীবনব্যাপী লালিত রাষ্ট্র চিন্তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। ৩০ মিনিটের বক্তব্যে তিনি আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে পাকিস্তান সমাজ থেকে অসাম্য এবং অবিচার দূর করার লক্ষ্যে সামাজিক বিপ্লবের কথা বলেন। অর্থনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যে ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স, বস্ত্রকল, পাটকল ইত্যাদি জাতীয় করণের কথা বলেন। ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার, সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের কাজের পরিধি ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেন। এমন কি পররাষ্ট্র নীতি বিষয়েও তিনি কথা বলেন। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন এবং জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির কথা বলেন। সিয়াটো এবং সেন্টো চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলেন। তাঁর বক্তব্যে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হলে ভবিষ্যত পাকিস্তান কেমন হবে তার একটি আভাস পাওয়া যায়। পর্যায় ক্রমে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত পূর্ববাংলার ৫টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ১০টি রাজনৈতিক দল জাতির উদ্দেশ্যে নির্বাচনী ভাষণ প্রদান করেছিলেন।

শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নারীর ভোটারের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। নির্বাচনে ৫৭.৭ শতাংশ ভোট পড়ে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ আসনে জয়লাভ করে এবং পূর্ববাংলায় জাতীয় পরিষদের ১৬২ টি সাধারণ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে জয় লাভ করে। ৭টি মহিলা আসনসহ মোট ১৬৭ আসনে আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে। অপর দিকে ভুট্টোর পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশে মহিলা আসনসহ ৮৮টি আসনে জয় লাভ করে। অর্থাৎ মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদের ৩১৩ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসনে জয় লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন আসনে এবং পিপলস্ পার্টি পূর্ববাংলার কোন আসনে জয়লাভ করেনি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল। নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে ২৩ বছরের আঞ্চলিক বৈষম্য এবং নভেম্বরে সংঘটিত প্রলয়ঙ্করী

প্রাকৃতিক দুর্যোগে শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা নির্বাচনের ফলাফলে ভূমিকা রাখে। ঘুণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতিতে মাওলানা ভাসানীসহ অনেকে নির্বাচন পেছানোর দাবি করলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঠিক সময়ই রাজনৈতিক টার্ম কার্ডটি খেলেছিলেন। সময়োচিত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই তাকে বাঙালির অবিসম্বাদিত নেতায় পরিণত করেছিলেন। নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ওয়ালী ন্যাপের সভাপতি খান আবদুল ওয়ালী খান মন্তব্য করেন দেশ রাজনৈতিকভাবে দু'ভাগে বিভক্ত।[৮৪] নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় পাকিস্তানের দুই অংশ দুটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা নিয়ে তথাকথিত ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে কোনমতে টিকে থাকার সংগ্রাম করে যাচ্ছিল। নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানকে নীতিগতভাবে বিভক্ত করে। পৃথক দুটি রাষ্ট্রের আত্ম-প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতা বাকি থাকে মাত্র।

৫.৯ ব্যালটের জবাব বুলেটে: বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনে আওয়ামী লীগ জয় লাভ করার পর পাকিস্তান সামরিক জান্তার সমস্ত হিসাব নিকাশ পাল্টে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক কুশিলবরাও নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করে। সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের দোসর হিসেবে আবির্ভূত হয় পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। যে কোন গণতান্ত্রিক দেশে এটিই স্বাভাবিক রীতি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করবে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নানা তালবাহানা শুরু করে। পাকিস্তান পিপলস পার্টি নেতা জেড এ ভুট্টো জানিয়ে দেন যে তাঁর দল জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসতে রাজি নয়। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে দেশের শাসনতন্ত্র রচনার ঘোষনা দেন।[৮৫] নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসেন। ঢাকা সফরকালে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ জানুয়ারী তিনি সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে শেখ মুজিব পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে অবকাশের নামে সিন্ধুতে ভুট্টোর এলাকায় যান। অবকাশের অন্তরালে মূল উদ্দেশ্য ছিল লারকানায় ভুট্টোর সাথে শলা পরামর্শ করে আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের ক্ষমতা প্রদান না করার কৌশল ঠিক করা। ২৭ শে জানুয়ারী জেড এ ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনার ব্যাপারে কেই মুখ খোলেননি তবে এই আলোচনা যে নিস্ফল ছিল তা বুঝতে কারোই বাকি রইল না। ৩০ শে জানুয়ারী দুজন ভারতীয় কাশ্মিরী ভারতের একটি ফকার বিমান ছিনতাই করে লাহোরে অবতরণ করে। বিমানটি লাহোর বিমান বন্দরে ধ্বংস করা হয়। ভুট্টো ছিনতাই ঘটনাকে অভিনন্দন জনান। এ ঘটনা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার জন্য লারকানা ষড়যন্ত্রের অংশ বলে অনেকে মনে করেন। শেখ

মুজিবুর রহমান এই ঘটনাকে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য সাবোটাজ হিসেবে অভিহিত করেন এবং জনগণকে সতর্ক থাকার আহবান জানান।[৮৬]

এদিকে ১৩ ফেব্রয়ারী ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারী জেড এ ভুট্টো ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন ইতিমধ্যে প্রণীত শাসনতন্ত্রে তাঁর পার্টির সদস্যরা সাক্ষর করার জন্য যেতে পারবেন না।[৮৭] ১৬ ফেব্রুয়ারী সংসদীয় দলের বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানকে দলের নেতা নির্বাচিত করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফার কোন ধরনের পরিবর্তন ছাড়া সংবিধান প্রণয়নের ঘোষণা দেন। ২৪ ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিক সম্মেলনে একটি লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ বক্তব্যে ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন জাতীয় পরিষদই হলো সংবিধান প্রণয়ণের যথাযথ প্রতিষ্ঠান। আর সংবিধানই হলো দুই অংশের এক সাথে থাকার মূল ভিত্তি। তিনি তার বক্তব্যে বারংবার পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' হিসেবে উল্লেখ করেন।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির নাজুক অবস্থা আঁচ করতে পেরে পর্দার অন্তরালে কুটনৈতিক পর্যায়েও নানা তৎপরতা চলতে থাকে। পাকিস্তান সরকারের ঘনিষ্ট মিত্র মার্কিন দূতাবাসের কিছু ভূমিকা লক্ষ করা যায়। ২৮ শে ফেব্রুয়ারী মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড শেখ মুজিবের সাথে ঢাকায় তাঁর বাসভবনে দেখা করেন। একই দিনে ভুট্টো ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসলে খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত সহিংস প্রতিবাদ জানানোর আহবান জানান। এমন পরিস্থিতিতে ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদে ঢাকার রাজপথ উত্তাল হয়ে পড়ে। সমস্ত দোকান-পাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ শুরু করে। মার্কিন কুটনীতিক আর্চার কে ব্লাডের মতে, মৌচাকে ঢিল পড়লে যে দশা হয়, ঢাকার মানুষের সে দশা হয়েছিল। তিনি বলেন ' I believe I have just witnessed the beginning of the end of a unified pakistan.'[৮৮] আসলেই সেদিন পাকিস্তানের পতনের সূচনা হয়েছিল এবং সেই পতন সূচিত হয় তাঁদের হাত দিয়েই।

আওয়ামী লীগ ২ মার্চ ঢাকায় হরতাল এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২ তারিখ পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক এবং গভর্নরের পদ থেকে ভাইস এডমিরাল এস এম আহসানকে সরিয়ে লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক সপ্তাহের কম সময়ের ব্যবধানে লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে সরিয়ে বেলুচিস্তানের কসাই খ্যাত লে.

জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এসব পরিবর্তন পূর্ববাংলায় আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস দেয়।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারাদেশে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সমস্ত প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। প্রশাসনে পাকিস্তানী কমান্ড অকার্যকর হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী সব কিছু চলতে থাকে। সামরিক প্রশাসন সন্ধ্যা ৭ টা থেকে সকাল ৭ টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলত করে। বঙ্গবন্ধু ৬ মার্চ পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন। ২ তারিখ ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। বঙ্গবন্ধু ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় বক্তব্য প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর হাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের পতাকা হস্তান্তর করা হয়। বঙ্গবন্ধু জনগণকে ট্যাক্স প্রদান বন্ধ করার আহবান জানান। বক্তারা বঙ্গবন্ধুকে 'বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্সের সুপ্রিম কমান্ডার' হিসেবে ঘোষণা করেন। ৩ মার্চ ইয়াহিয়া খান সকল পার্লামেন্টারী পার্টির নেতাদেরকে ১০ মার্চ এক বৈঠকে বসার আহবান জানিয়েছিলেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে হত্যার বিষয় উল্লেখ করে আলোচনার প্রস্তাবকে নির্মম পরিহাস বলে আখ্যায়িত তা প্রত্যাখ্যান করেন।

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের প্রাক্কালে ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণ প্রদান করেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে ৭ মার্চ শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করা হবে কি হবে না সে বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছিল। শেখ মুজিবের পূর্বঘোষিত জনসভার আগের দিন তড়িঘড়ি করে ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ শেখ মুজিবের প্রতি এক ধরনের হুশিয়ারী বা হুমকি ছিল তা বলা যেতে পারে। এই ভাষণে একদিকে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের সভা আহবান করেন অন্যদিকে পাকিস্তানের অখন্ডতার প্রশ্নে কঠোর অবস্থান ঘোষণা করেন। তিনি বলেন 'রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য অনির্দিষ্ট সময়কাল ধরে অপেক্ষা করতে পারি না'। তাঁর এ ভাষণকে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি বলে মনে করা হয়। তিনি প্রকারান্তরে উদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য শেখ মুজিবকে দায়ী করেন। এসকল ঘটনা প্রবাহের মধ্যে পূর্ববাংলায় পাকিস্তান সেনাসংখ্যা এবং সামরিক শক্তি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি করা হতে থাকে। এভাবে ইয়াহিয়া খান পূর্ববাংলার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।[৮৯] এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। লক্ষ লক্ষ জনতা সারাদিন ব্যাপী রেসকোর্স ময়দানে এসে জড়ো হয়। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। 'শেখ মুজিবের পথ ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো' ইত্যাদি শ্লোগানে জনসভাস্থল সহ সারা ঢাকানগরী মুখরিত হয় সেদিন। বঙ্গবন্ধু তাঁর চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট দেরিতে জনসভাস্থলে আসেন। সেদিনের জনসভায় শেখ মুজিব ছাড়া অন্য কোন বক্তা বক্তব্যও রাখেনি। বঙ্গবন্ধু সেদিন ১৮ মিনিটের ভাষণে পূর্ববাংলার মানুষের ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনা আর আত্ম-ত্যাগের ইতিহাস তুলে ধরেন।

পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে তিনি দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।[৯০] সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও জনগণ সঠিক বার্তা পেয়ে যায়, এ থেকেই জনগণ করণীয় নির্ধারণ করে ফেলেন। 'The end of the old Pakistan' শিরোনামে The Daily Telegraph এর একটি প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়, 'On sunday [March 7] Shiekh Mujib came as near to declaring this [Independence] as he could without inviting immediate harsh reaction from the Army.'[৯১]

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুসারে সারা দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। প্রেসিডেন্টের জরুরী বার্তা পেয়ে ২১ শে মার্চ ঢাকায় আসেন পাকিস্তান পিপলস পার্টি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। ১৫ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক অঙ্গনে চলে নানা তৎপরতা। প্রকাশ্যে ও গোপনে চলে নানান আলোচনা। পাশাপাশি পিআইএ ও পাকিস্তান বিমান বাহিনীর এর এয়ারক্রাফট্গুলো বিরামহীনভাবে সেনা পরিবহণে ব্যস্ত থাকে। পাকিস্তানী বিমানের জন্য ভারতের আকাশ সীমা বন্ধ থাকায় কলম্বো হয়ে আসায় ৫ ঘন্টা ফ্লাইং টাইম ১১ ঘন্টার বেশি লাগে। সমুদ্র পথেও করাচী থেকে অস্ত্র বোঝাই রণতরী চট্টগ্রাম নৌবন্দরে আসতে থাকে। একদিকে চলে লোক দেখানো আলোচনা। অন্তরালে চলে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিজদেশের (?) একটি অংশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে গণহত্যার প্রস্তুতি।

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসকে শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এই দিন ঢাকার সমস্ত ভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। উত্তেজিত জনতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং পাকিস্তানের পতাকা ভস্ম করে। ২৪ মার্চ একটা সমঝোতার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। বস্তুত, সমঝোতার কোন ইচ্ছাই পাকিস্তানীদের ছিল না। শেষ মূহর্তে সমঝোতার লোক দেখানো প্রচেষ্টাও থেমে যায়। ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সন্ধ্যা ৭ টার ফ্লাইটে ঢাকা ত্যাগ করেন। যাওয়ার আগে 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামক গণহত্যার দলিলে সাক্ষর করে যান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মধ্য রাতের পর গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের আগ মুহূর্তে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হয়। পূর্ববাংলার মানুষকে শোষণ করার জন্য তারা ধর্মকেই হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়। তারা বাঙালিদেরকে 'ভাল মুসলমান' হিসেবে মনে করতো না। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধর্মকে তারা শোষণের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিল। তারা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের পদে প্রতিবন্ধকতা সুষ্টি করেছে বারংবার। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের ন্যূনতম শ্রদ্ধা ছিল না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যক্তি ছিল তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে রাজনৈতিক গতিধারা এবং আইন ও প্রতিষ্ঠান। জনমতের তোয়াক্কা না করে সামরিক ও বেসামরিক-আমলাতন্ত্র কায়েম

করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। বাঙালিদেরকে তারা সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিম্নতর এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অযোগ্য মনে করতেন। তারা পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালির অবদানের কোন ধরনের মূল্য দেননি। আভিজাত্যের দাম্ভিকতায় মত্ত থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিকে তারা দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল এবং পূর্ববাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করতে চেয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তাদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান দেন। এই একটিমাত্র মানবিক দর্শন বাঙালির পরবর্তী সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একজন রাজনৈতিক কর্মীই ছিলেন না তিনি ছিলেন বাঙালির স্বাতন্ত্র্য রাজনৈতিক দর্শনের রূপকার। এই দর্শন বাঙালির নিজস্ব সত্তার মধ্যেই ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল। তিনি সেটির সন্ধান দেন এবং একে একটি কাঠামোবদ্ধ করে জাতীয়তাবাদী চেতনায় রূপান্তর ঘটান। সেটিই হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর সেখানেই নিহিত ছিল বাঙালির মুক্তির পথ।

উপরের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের আলোকে বলা যায়, পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমানদের সমর্থদের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলেও বাঙালির প্রতি তাঁদের সংবেদনশীল কোন অনুভূতিই ছিল না। ধর্মের ভিত্তিতে একটা ঐক্যমত্য হলেও বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় বিশুদ্ধতা নিয়েই তাঁদের সন্দেহ ছিল। বাঙালির প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ ছিল সহজাত। বাংলা ভাষাকে তাঁরা ঘৃণা করত পৌত্তলিকতার ভাষা বলে। বাঙালি সংস্কৃতিকে হিন্দুদের সংস্কৃতি মনে করত। জাতিগত অহংকার ছিল তাঁদের মজ্জাগত। এ ধরনের চিন্তা থেকে পূর্ববাংলা সম্পর্কে তাঁরা সর্বদাই নেতিবাচক রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব লালন করত। এ অঞ্চলকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির যোগানদাতা হিসেবে ব্যবহার করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। তাদের হয়ত ধারণা ছিল পূর্ববাংলার অধিবাসীদের অধিকাংশই যেহেতু কৃষিজীবি এবং রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর কাজেই তাঁদের যেভাবেই শাসন করা হোক না কেন, তাঁরা প্রতিবাদ করতে পারবে না। কিন্তু তাঁদের সে ভাবনা ছিল ভুল। বাঙালির ছিল উন্নত সংস্কৃতি, সমৃদ্ধ অতীত, অমিত সম্ভাবনা এবং প্রগতিশীল চিন্তা ও দর্শন। কাজেই নিরবে অন্যায় সহ্য করার জাত বাঙালি না। ফলে তাঁদের সকল প্রচেষ্টাই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। পূর্ববাংলার প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনায় নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। পাকিস্তানীদের ভাষানীতি পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে প্রেরণা যোগায়। ৫৪'এর নির্বাচন ছিল পূর্ববাংলার রাজনৈতিক শক্তির পরীক্ষা স্বরূপ। এ নির্বাচনের প্রাথমিক লক্ষ অর্জিত হলেও অল্পদিনের ব্যবধানে রাজনৈতিক সংহতি অভাবে এর সুফল জনগণ ভোগ করতে পারেনি। ৬-দফার অর্জন ছিল সূদুরপ্রসারী। এ কর্মসূচি মানুষকে স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রাণ উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ৬-দফা থেকে গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত বহু মানুষ আত্ম-ত্যাগ করেন প্রাণের তাগিদে। এঁদের মধ্যে শ্রমিক মনু মিয়া, ছাত্র আসাদুজ্জমান, শিক্ষক শামসুজ্জোহার লাশ যেন সমাজের এক একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

এসময়ে হত্যা গ্রেফতার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে নারীরাও রাজপথে নেমে এসেছিল। কাজেই নারী-পুরুষ, ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক, শ্রমিক, মুটে-মজুর সব পর্যায়ের মানুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মসূচি পূর্ববাংলার অধিবাসীদের একান্তই আপনার কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ৫২' থেকে ৭১ পর্যন্ত এক-একটি রাজনৈতিক ঘটনা ঐতিহাসিক পরম্পরা সৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষের দিকে ধাবিত হয়েছে। রাজনৈতিক এই অগ্রযাত্রা ছিল অবিস্মরণীয়। পাকিস্তান সরকার গৃহীত গণবিরোধী প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তাৎক্ষণিক কিন্তু জোরালো এবং একটি রাজনৈতিক কর্মসূচির সাথে অন্য রাজনৈতিক কর্মসুচির একটি পরম্পরা তৈরি হয়েছে। এভাবেই বাঙালি তাদের স্বতন্ত্র জাতি সত্তাকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে মুক্তির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

---

১ প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, *পাক-ভারতের রূপরেখা*, শ্যামা প্রকাশনী, নদীয়া, ভাদ্র, ১৩৭৫, পৃ. ১৪

২ Kabir U Ahmad, *Breakup of Pakistan: Background and prospects of Bangladesh*, The social science Publishers, London, 1972, p. 15

৩ এই ভাষণে তিনি সেখানে বলেন, "A community which is inspired by feelings of ill-will towards other communities is low and ignoble. I entertain the hieghest respects for the customs, laws, religious and social institutions of other communities... Yet I love the communal group which is the sourse of my behabiours; and which has formed me what Iam by giving me its religion, its literature, its thought, its culture, and thereby re-creating its whole past, as living operative factor, in my present conciousnes.... I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interests of India and Islam. ...I would like to see the Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan amalgated into a single state. Self-government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-west Indian Muslim State appears to me the final destiny of the Muslims at NorthWest India. See. Dr. sir Mohammad Iqbal, Presidential Adress, Allahabad session, December, 1930, Delhi, All-India Muslim Legue, 1945, p. 10-12 cited in Kabir U Ahmad, Ibid, p. 19

৪ Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947*, The University Press Limited, Dhaka, 2015, p. 177

৫ বেঙ্গল প্যাক্টের পরে ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় আইনসভা এবং ১৯২৪ সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত কলকাতা পরপোরেশন নির্বাচনে সাধারণ ও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের পরাজিত করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৩৯ আসনের মধ্যে স্বরাজ্য পার্টি ২১টিতে জয়লাভ করে। অন্য দিকে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে মুসলিমদের ১৫টি আসনের মধ্যে তারা ১০টি জয়লাভ করেন। সিআর দাস মেয়র, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র, সুভাস চন্দ্র বোস এক্সিকিউটিভ অফিসার, আবদুর রশিদ খান এক্সিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হন। Harun-or-Rashid, *op.cit*, p.21-22

৬ ১৯৪৬ সালের ৭-৯ এপ্রিল মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দিল্লী কনভেনশনে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তা হলো, ...That the zones comprising Bengal and Assam in the North-East and the Punjan, North-West Frontier province, Sind and Baluschistan in the North-West of India, namely Pakistan Zones, where the Muslims are in a donminant majority, be constituted into a soverign independent state. দ্রষ্টব্য- Harun-or-Rashid, *op.cit*, p. 233

১৯৪০ লাহোর প্রস্তাবে যা ছিল, ... That the areas in which the Muslims are numerically in a mejority as in the North-Western and Eastern Zones of India Should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. Latif Ahmed Sherwani, (Ed.) *Pakistan Resolution to Pakistan, 1940-1947: A selection of documents presenting the case for pakistan,* Days Publising House, Delhi, Reprint, 1985, p. 21

৭ অন্যকোন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেনি, যেমন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস সমর্থিত মুসলিম সদস্যগণ, পাঞ্জাবে সেকান্দর হায়াৎ খানের ইউনিয়নিস্ট দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৮ আজাদ, ১১ জুন, ১৯৪৭

৯ জি অ্যালানা (অনুবাদ কে এম ফিরোজ খান), *পাকিস্তান আন্দোলন: ঐতিহাসিক দলিলপত্র*, খান ব্রাদার্স কোম্পানী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩১৫-১৬

১০ আজাদ, ৪ জুন, ১৯৪৭, আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৫, পৃ. ২২৬

১১ ভারত বিভাগের সময় বাংলার ভাগ্য নির্ধারণের প্রশ্নে বাংলার হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ অবিভক্ত বাংলা গঠনের দাবি জানায়। বিষয়টি সমাধানকল্পে বাংলার নেতাদের মতামত গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী ছিল। কিন্তু দেশভাগ সংক্রান্ত কমিটিতে বাংলার কোন নেতাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, ডা. রাজেন্দ্র প্রসাদ, মি. লিয়াকত আলী খান এবং আবদুর রব নিশতারের সম্বয়ে গঠিত কমিটিতে বাংলার স্বার্থ দেখার কেউ ছিল না। আজাদ, ১৪ জুন, ১৯৪৭

১২ R.C. Majumdar. *History of the freedom movement in India, Vol. III,* Firma KLM private Limited, Calcutta, 1963, P. 673-75

১৩ এক বেতারভাষণে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেন, "Since my arrival in India at the end of March I have spent almost everyday in consultation with as many as of the leaders and representatives of as many communities and interests as possible. I wish to say how greatful I am for all the information and the helpful advice that they have given me. Nothoing I have seen or heard in the past few weeks has shaken my firm opinion that reasonable measures of good will between the communities a unified India would be by far the best solution of the problem.

For more than a hundred years 400,000,000 of you have lived togethar, and this country has been administered as a single entity. This has resulted in unified communications, defence, postal services, and currency; an absence of tarrifs and customs barriers; and the basis for integrated political economy. My great hope was that communal differences would not be destroying all this. see- www. nationalarchieves.gov.uk/wp-content/uploads/2014/03/cab21-2038ii1.jpg

১৪ *আজাদ*, ১৪ জুন, ১৯৪৭

১৫ *আজাদ*, ২৬ এপ্রিল, ১৯৪৭

১৬ *আজাদ*, ২৬ এপ্রিল, ১৯৪৭

১৭ *আজাদ*, ১১ জুলাই, ১৯৪৭

১৮ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনির্ভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৪, পৃ. ৭৪, আজাদ, ২৯ মে ১৯৪৭, আজাদ, ২ জুন, ১৯৪৭

১৯ কঙ্কর সিংহ, *সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ৫৮

২০ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ আগস্ট, ১৯৪৭

২১ শেখ মুজিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫-৭৮

২২ *ঢাকা প্রকাশ* ১৭ আগষ্ট, রবিবার, ৮৭ বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা, ১৯৪৭

২৩ স্বাধীনতার প্রথম দিন পূর্ববাংলার প্রধান প্রধান সব শহরেই পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। রাজশাহী জেলার উৎসবে হিন্দুদের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী বলেছেন- ..."এরই মধ্যে 'পাকিস্তান' একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দেখা দিল। তাই মুসলমানদের মধ্যে যেমন বিজয়ের গর্ব, অ-মুসলমানদের মধ্যেও তেমনি একটা পরাজয়ের গ্লানি। অ-মুসলমানদের মধ্যে সুখ নেই কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সেদিন ঘর ছেড়ে রাস্তায় নামেনি কিন্তু অ-মুসলমানেরা সকলেই রাস্তায় নেমেছে। নেমেছেন, প্রাণের ভয়ে-দেশদ্রোহী ব'লে ধীকৃত হওয়ার ভয়ে। মুসলমানের মনে সে ভয় নেই। অ-মুসলমান সদাই আতঙ্কিত। রাস্তায় ও বৈকালিক জনসমাবেশে আজ, তাই, অ-মুসলমানের সংখ্যা অজস্র। তাঁদের চোখে পরাজয়ের গ্লানি, মুখে কিন্তু জোর করে আনা কৃত্রিম হাসি"। দ্রষ্টব্য- প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. পৃ. ৩৩

২৪ Census of Pakistan, 1951, Volume-3, East Bengal, Report & Table, p. 111

২৫ Census of Pakistan, 1961, Volume-2, East pakistan, Tables & Report, p. iv-20

২৬ ১৯৫১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী পাকিস্তানের পাঞ্জাবী ভাষাভাষী ২৮.৫৫%, পশতু ৩.৪৮% সিন্ধি ৫.৪৭%, ইংরেজী, উর্দু ৩.৩৭% ০.০২% বেলুচি ১.২৯%, দেখুন- *Popultion Census of Pakistan*, 1961 Vol-1, Ministry of Home and Kashmir affair

২৭ Census of Pakistan, 1951, Volume-3, East Bengal, Report & Table, p. 112

২৮ Census of Pakistan, 1961, Volume-2, East pakistan, Tables & Report, p. iv-21

২৯ S. M. Ikram and Percival Spear, *The Cultural Heritage of Pakistan*, Oxford University Press, Karachi, 1955, p. 119-120

৩০ H.M. Matin, *National Languge of Pakistan*, Marsh publishing House, Karachi, 1954, p. 197

৩১ Census of Pakistan, 1951, Volume-3, East Bengal, Report & Table, p. 112

৩২ H.M. Matin, Op. cit. p. 199

৩৩ British rule proved really most favorable for the popularity as well as the development of the Urdu, since this language suited most to British strategy,...they used it as one of the many means to achieve their selfish ends; consequently, it was specially made popular them throughout Northern India. Muslims never gave as honorable a status to Urdu as the British did, Muslims did not do because

Persian was their language, while the British did that because it served their purpose best. H.M. Matin, Op. cit. p. 247

৩৪ *Ibid*, p. 212

৩৫ *Ibid*, p.214

৩৬ S. M. Ikram and Percival Spear, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

৩৭ H.M. Matin, Op. cit. p p.219

৩৮ আবুল মনসুর আহমদ, মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৫০

৩৯ আতিউর রহমান সম্পাদিত, *ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০০০ পৃ.৩৯

৪০ বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খন্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫,পৃ. ১৯

৪১ S. M. Ikram and Percival Spear, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

৪২ আপনারা এখনমুক্ত। আপনারা এখন মন্দিরে যেতে বাধাহীন, আপনারা মসজিদে যেতে বাঁধাহীন, এই পাকিস্তান রাষ্ট্রে যে কোন উপাসনালয়ে যেতে আপনারা বাধাহীন। আপনি যে কোন বর্ণ, ধর্ম, বা ধর্মগোষ্ঠীর লোক হতে পারেন, রাষ্ট্রের এইসব ব্যাপারে কিছুই করার নেই। দ্রষ্টব্যঃ জি অ্যালানা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৮-২৯

৪৩ *দৈনিক আজাদ*, ২৯ জুলাই, ১৯৪৭

৪৪ *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭।

৪৫ ঢাকা প্রকাশ, ১৫ মার্চ ১৯৪৮

৪৬ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলে নানান মেরুকরণ হয়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদানের অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি অদৃশ্য কারণে তা না করে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ব্রিটিশ আমলে গঠিত কৃষক-প্রজা পার্টির আদলে তিনি গঠন করেন কৃষক শ্রমিক পার্টি। ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলার জমিদারী প্রথা রহিত করা হলে প্রজা পদবাচ্যের যৌক্তিকতা না থাকায় প্রজা শব্দের স্থলে শ্রমিক শব্দ যুক্ত করে কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করা হয়।

৪৭ তাজউদ্দীন আহমেদ, *তাজউদীন আহমদের ডায়েরী ১৯৫৪*, পঞ্চম খন্ড, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৫৯

৪৮ গভর্ণর জেনারেল জেনারেলের ঘোষণায় বলা হয়- The Governor-General having considered the political crisis with which the country is faced, has with deep regret come to the conclusion that the constitutional machinery has broken down. He therefore has decided to declare a state of emergency throughout Pakistan. The constituent Assembly as an present constitueted has lost the confidence of the people and can no longer function.

The ultimate authority vests in the people who will decide all issues including constitutional issues through their representatives to be elected afreash. Election will be held as early as possible. Until such time as elections are held, the administration of the country will be carried on by a reconstituted Cabinet. He has call upon the Prime Minister to reform the cabinet with a administration. The invitation has been accepted. Hamid Khan,*Constitutional and Political History of Pakistan,* Oxford University Press, Karachi, 2011, p. 78

এই ঘোষণায় কন্সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলী ভেঙ্গে দেওয়ার কথা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি, শুধুমাত্র বলা হয়েছে, কন্সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলী জনগণের আস্থা হারিয়েছে অথবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্ট অথবা গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫-এর কোন ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি যা যে কোন প্রক্লেমেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সূত্র: Hamid Khan, *Ibid.* 78, তাজউদ্দীন আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৪৯ সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত Basic Principal committee (BPC) কমিটির বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত রিপোর্ট এর প্রমাণ দেয়। ১৯৫০ সালের প্রস্তাবে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে উচ্চ কক্ষে ৬০ টি এবং নিম্ন কক্ষে ২০০ আসন, ১৯৫২ সালেও সমসংখ্যক, ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলায় উচ্চ কক্ষে ১০ নিম্ন কক্ষে ১৬৫ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চ কক্ষে ৪০ এবং নিম্ন কক্ষে ১৩৫ টি আসন প্রস্তাব করা হয়। এভাবে পূর্ববাংলার দাবি অনুযায়ী আনুপাতিক হারে আসন দিতে অস্বীকৃতির কারণে সংবিধান প্রণয়নে একমত হতে দেরী লাগে। দ্রষ্টব্য- Kabir U Ahmad,*Ibid* P. 54

৫০ Latif Ahmed Sherwani, Pakistan Resolution to Pakistan, 1940-1947, Daya Publishing House, Delhi, 1985, p. 21

৫১ Keith Callard, *Pakistan: A Political Study,* George allen & Unwin Ltd. London, 1957, p.77

৫২ *Cnstituency Assembly of Pakistan*, Debates, 8 March 1949, cited in- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র: প্রথম খন্ড, (১৯০৫-১৯৫৮), পৃ. ৬৪৯

৫৩ ঐ.পৃ. ৬৬১

৫৪ Muhammad Ghulam Kabir, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৫৫ *Cnstituence Assembly of Pakistan*, Debates, 8 March 1949, cited in- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র: প্রথম খন্ড, (১৯০৫-১৯৫৮), পৃ. ৬৬৬-৬৭০

৫৬ Keith Callerd, পূর্বোক্ত, পৃ. 96-97

৫৭ *Constituent Assembly of Pakistan*, Debates, Vol.XV, 14, October, 1953, P. 183

৫৮ *The Constituent assembly order*, 1955 (G. G. O. 12/1955}(Pakistan a Political Study. p. 118)

৫৯ Kabir U Ahmad *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫

৬০ বস্তুত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সেকশন-৯২ এ বর্ণিত ছিল 'the provincial Governors at their discrition and with 'the concurrence of the Gover-General at his discrition' could proclaim a state of emergency within a province. কিন্তু ৯২/ক ধারায় গভর্ণর জেনারেল এককভাবে এই ক্ষমতা পেয়ে গেলেন। জিন্নাহর স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিন্ধুর মূখ্যমন্ত্রী এম এ খারু, পাঞ্জাবের মূখ্যমন্ত্রী মামদুত খানের মন্ত্রী সভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তিনি দেশভাগের পূর্ববাংলার রাজনীতি থেকে যুক্তবাংলার সর্বশেষ নির্বাচিত মূখ্যমন্ত্রী হেসেন শহীদ সোহরাওয়াদী এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে বিদায় করে দেন। জিন্নাহর পথ ধরে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করার পর যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা বার বার ভাঙ্গা-গড়ার শিকার হয়। Kabir U Ahmad *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২-৬৩

৬১ *Dawn,* October, 31, 1958

৬২ আমলা থেকে রাজনীতিবিদ বনে যাওয়া নেতৃবৃন্দ যেমন গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জার প্রভাবে ১৯৫৩ সালে গভর্নর জেনারেল পদ থেকে খাজা নাজিমুদ্দিনকে, ১৯৫৪ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে অপসারণ এবং ১৯৫৪ সালে প্রথম কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এসব ঘটনা পাকিস্তানের রাজনীতিকে গণতান্ত্রিক ধারায় বিকাশের পথে বাঁধার সৃস্টি করে।

৬৩ S.P. Varma, Virendra Narain, Edited. *Pakistan political System in Crisis: Emergence of Bangladesh*, South Asian Studies Centre, University of Rajasthan, 1972, p. 14

৬৪ হারুন-অর-রশিদ, *'আমাদের বাঁচার দাবী' ৬ দফা'র ৫০ বছর*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১৬ পৃ. প্রাককথন

৬৫ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ: প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৭৩

৬৬ *দৈনিক আজাদ*, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

৬৭ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ মার্চ ১৯৬৬

৬৮ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ এপ্রিল ১৯৬

৬৯ শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ছয় দফা ঘোষণার পর আওয়ামী লীগের গুরত্বপূর্ণ প্রায় সব নেতাই গ্রেফতার হয়ে যায়। যারা জেলের বাইরে ছিলেন তারাও সক্রিয় ছিলেন না। নবাবজাদা নসরুল্লাহ এসময় পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সংক্ষেপে পিডিএম নামে একটি জোট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল ৬-দফা কর্মসূচির আন্দোলনকে দুর্বল করা। তিনি আওয়ামী লীগ নেতাদের ধারণা দেন রাজনীতিতে শেখ মুজিবের ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই নেই। আবদুস সালাম খানসহ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কিছু নেতা পিডিএম এর পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা কর্মী ও সমর্থকরা সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। প্রফেসর সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত). *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ. ১৫১-১৫২

৭০ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ আগস্ট, ১৯৬৭

৭১ আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস [১৯৪৯-১৯৭১]*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩ পৃ. ১৪৩

৭২ হারুন-অর-রশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২

৭৩ অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩০৫- ৩০৮

৭৪ দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ জুন, ১৯৬৬

৭৫ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫৮-১৯৭১)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩০১

৭৬ নাজনীন হক মিমি, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *আগরতলা মামলা অনুচ্চারিত ইতিহাস*, জার্নিম্যান বুকস্, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪৮৭

৭৭ প্রফেসর সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত). *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ. ১৬৩

৭৮ নাজনীন হক মিমি, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত). পূর্বোক্ত ৪১৭

৭৯ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪

৮০ প্রফেসর সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত). পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০

৮১ মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ: উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২০৩

৮২ Archer K Blood, *The Cruel Birth of Pakistan: Memoirs of an American Diplomat*, The University Press Limited, Dhaka, 2002, pp. 116-117

৮৩ *Ibid*, 124

৮৪ প্রফেসর সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত). *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৭

৮৫ আবু আল সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৪-১৮৫

৮৬ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫৮-১৯৭১)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৪-৬২৫

৮৭ প্রফেসর সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত). *পূর্বোক্ত*, পৃ.২০৪

৮৮ Archer K Blood, *op. cit.* p. 154

৮৯ Mahmudul Huque, *American Policy towards the Bangladesh Liberation War in 1971: A collection of Essential Documents*, Asiatic society of Bangladesh, 2018, p. 42

৯০ বিস্তারিত- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ ই মার্চের ভাষণ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অক্টোবর ২০১১, পৃ, ১৫০-১৫২ (পঞ্চম তফসিল)

৯১ The Daily telegraph, London, 10 March 1971, p. 14, দ্রষ্টব্য. হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ২০১৮, পৃ. ২৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক চর্চা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ

ষষ্ঠ অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক চর্চা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ

পূর্ববাংলায় প্রাগ্রসর সাংস্কৃতিক চেতনা ও মননশীল জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি সত্বেও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধার অভাবে এ অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের গতি খানিকটা মন্থরই ছিল। ঢাকা কয়েকবার এর রাজধানীর মর্যাদা হারায়। ফলে এ অঞ্চলের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক অগ্রগতি বারে বারেই বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে বটে, তবে একেবারেই থেমে যায়নি। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ববাংলায় একটি শিক্ষিত সমাজ বিকাশের গতি ত্বরান্বিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পূর্ববাংলার অধিবাসীরা আত্ম-পরিচয়ের সংকটে পড়ে। হাজার বছরে গড়ে ওঠা ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতিসত্তা হুমকির মুখে পড়ে। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি, বঙ্গদেশ, বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি ইত্যাদি পদবাচ্য সৃষ্টি হয়েছে। মাতৃভাষায় কথা বলা এবং জ্ঞানচর্চা করা মানুষের জন্মগত অধিকার। রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী মৌলিক এই অধিকারকে হরণ করতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে পূর্ববাংলার মানুষের সংগঠিত হওয়ার যে প্রচেষ্টা তার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্ম লাভ করে। এসব সংগঠন, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রাজনীতির মিথস্ক্রিয়ায় বিকশিত হয় জাতীয় চেতনা যা থেকে জন্ম নেয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ। পূর্ববাংলায় গড়ে ওঠা এসকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উৎস ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সূচনা হয় যা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব আন্দোলনের প্রভাব ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ও অজ্ঞানতাই তাঁদের পশ্চাৎপদতার মূল কারণ। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাবে এসব ঘাটতি দূর হতে শুরু করে। এভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক চর্চা পূর্ববাংলার অধিবাসীদেকে রাজনৈতিক অধিকার সচেতন করে

গড়ে তোলে। এ থেকে তৈরি হয় জাতীয় চেতনা যা পরিণতি লাভ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। কাজেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বুঝতে হলে পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও বিকাশ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বর্তমান অধ্যায়ে পূর্ববাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং বাঙালির মুক্তির আন্দোলনে সেসবের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে একে-অপরের ওপর প্রভাব নির্ণয় করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানপন্থী যেসকল ব্যক্তি ও সংগঠন দেশজ সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিপরীতে সহযোগীতা করেছিল সেটিও নিরীক্ষা করা হবে।

৬.১ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

ব্রিটিশ শাসনামল বা পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা উপেক্ষিত থেকেছে। মুসলমানরা কুসংস্কার বশত উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে পিছিয়ে পড়ে, তাছাড়া সরকারও এ অঞ্চলের প্রতি উদাসীন ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পেছনেও প্রধানত ব্রিটিশ শাসকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল মুখ্য। তথাপি বঙ্গভঙ্গ পূর্ববাংলার মানুষের জন্য সৌভাগ্যের সূচনা করেছিল। পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসেবে মোগল যুগের রাজধানী ঢাকা আবারও কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে সৌভাগ্য বেশিদিন টেকেনি। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে পূর্ববঙ্গের মানুষ আশাহত হয়। বলা হয়ে থাকে বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কারণেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন এটি পূর্ববাংলার জনজীবনের ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে দেয়। এরকম বিভিন্ন ঘটনাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ যে-সব প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল সেসব প্রতিষ্ঠান পূর্ববাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

৬.১.১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পূর্ববাংলার পশ্চাৎপদ জনজীবনে প্রাণ সঞ্চার করে। ব্রিটিশ শাসনামলে নানা কারণে মুসলিম জনগোষ্ঠী পশ্চাৎপদ অবস্থানে চলে যায়। আর পূর্ববাংলার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। এছাড়া এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু জনগোষ্ঠী (১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় পাকিস্তানে প্রায় সত্তর লক্ষ দলিত হিন্দু ছিলেন যাঁরা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন) বাস করতেন। উচ্চ বর্ণের ভূ-স্বামী হিন্দু জনগোষ্ঠী কলকাতাতেই অবস্থান করতেন। এসকল নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ গতানুগতিক জীবনচক্রে আবর্তিত হতো।[১] অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতাকে নিয়তি হিসেবেই তারা মেনে নিয়েছিল।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই পূর্ববাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। 'ইস্ট বেঙ্গল এডুকেশন অর্ডিনেন্স ১৯৪৭'এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ওপর পূর্ব পাকিস্তানে ম্যাট্রিকুলেশন এবং হাই-মাদ্রাসার উপরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অধিভূক্তিকরণের ক্ষমতা অর্পন করা হয়। এরপর পূর্ববাংলায় শিক্ষা সম্প্রসারণের গতি বৃদ্ধি পায়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি হয় ৮০০ জন। ১৯৪৬-৪৭ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০৯২ জনে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৪২১ জন।[২] ১৯৬৮ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯২১ সালের তুলনায় প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬৪৮৯ জনে উন্নীত হয়। উচ্চ শিক্ষায় নারীদের অংশ গ্রহণও বৃদ্ধি পায়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থী ছিল মাত্র ২ জন যা ১৯৬৮ সালে ১৩৩৬ জনে উন্নীত হয়।[৩] পূর্ববাংলায় শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালিকা শক্তির ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ববাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনবোধের পরিবেশ সৃষ্টি ও বিবর্তিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে।[৪] মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে একটি সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে ওঠেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরী হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "সেখানে আছে আলাদা আলাদা গ্রন্থাগার ও রঙ্গালয়, ও ক্রীড়াঙ্গন,; অনুষ্ঠিত হয় বিতর্ক-সভা, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ভোজ ও আরও অনেক সময়োচিত অধিবেশন। সেখানকার নাট্যাভিনয় দেখতে নগরবাসীরাও সোৎসাহে সমবেত হন"।[৫] কলকাতা কমিশনের রিপোর্টে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিস্কার চিত্র পাওয়া যায়। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা নয় দেহ মন ও চরিত্র গঠণের মাধ্যমে সচেতন মানব সম্পদ তৈরি হবে এর লক্ষ্য। দেহ মনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য হলের আবাসিক ও সংযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সাহিত্য ও নাট্যচর্চা, এবং খেলাধুলা, সমাজ সেবা ইত্যাদি পাঠ্যসূচি বহির্ভূত কার্যক্রমের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল।[৬] কলকাতা কমিশনের রিপোর্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিপূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর সংগ্রহ করা হয়েছিল। বিশেষ করে 'এ্যথলেটিক ক্লাব' 'গেমস' ক্লাব'সহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছিল। ছাত্র সংসদের আবশ্যিকতার কথা বলতে গিয়ে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়,

> We warmly endorse the proposal for the foundation of a university union on the lines of those at Oxford and Cambridge, as a general social centre, that all members of the teaching staff and all the students should belong to it. We saw an admirable institution of this kind at recently founded University of Mysore. We also aprove the proposal to establish a professors' club.।[৭]

এ সকল উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের জন্য পাঠ্যসূচিভুক্ত এবং পাঠ্যসূচি বহির্ভূত উভয় কার্যক্রমের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের সূচনালগ্ন থেকেই হল কেন্দ্রিক একটি সাংস্কৃতিক ধারার সূচনা হয়। প্রত্যেক হলের পরিকল্পনাতেই একটি করে সভাকক্ষ সংযোজিত হয়েছিল। সভা কক্ষের উঁচু মঞ্চে ছাত্ররা নাট্যাভিনয়সহ সাংস্কৃতিক চর্চা করতেন। ক্রীড়া, সাহিত্য ও পত্রিকা, বিতর্ক সভা এসব আলাদা আলাদা কর্যক্রমের জন্য একজন করে সম্পাদক ছিলেন।[৮] হল ইউনিয়নের উদ্যোগে ছাত্ররা নিয়মিত সাংস্কৃতিক ও সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন। যে ধরনের লক্ষ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সফল হয়েছিল। বিশেষ করে, পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ববাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নের্তৃত্ব দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং ছাত্র সংগঠন বিশেষ করে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা ও নেতৃত্ব প্রদান করতেন।

ক্রমবর্ধমান হারে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরামর্শ সহযোগিতা প্রদানের জন্য ১৯৬১ সালে ছাত্র-বিষয়ক একটি বিভাগ খোলা হয়। এর প্রধান হন একজন পরিচালক। পরবর্তীকালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে উক্ত ছাত্র-বিষয়ক বিভাগকে এর সাথে একীভূত করা হয়। এভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্মিলনের এক নতুন ধারা চালু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনধারায় এটি একটি নতুন সংযোজন। এই কমপ্লেক্স ঢাকা শহরের মধ্যে সর্বাধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রেক্ষাগৃহ, লাইব্রেরী, পাঠকক্ষ, কলা ও সঙ্গীত কক্ষ, মঞ্চ, সুইমিং পুল, স্ব-পরিবেশিত ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি সংযোজিত হয়।[৯] বলা যেতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র শ্রেণি কক্ষের বাইরে সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়। এখানে ছাত্র-শিক্ষক সম্মিলিতভাবে নিয়মিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিত। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আরও বৃদ্ধি পায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান বিদ্যার্থীদের স্বাধীনতাপ্রিয় মানস গঠনে ভূমিকা রাখে। পাকিস্তান শাসনামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাস্থলে পরিণত হয়। এখানকার ছাত্ররা তাঁদের ছাত্র-জীবনে নেতৃত্ব প্রদান করতেন আবার ছাত্রত্ব শেষে কর্ম-জীবনেও সমাজের আলোক বর্তিকা হিসেবে পথনির্দেশনা দিতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একজন ছাত্র সমাজের এক একটি স্তম্ভে পরিণত হয়। কলকাতা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান শাসনামলে বিশেষ করে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ বেড়ে যায়। ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পরিবর্তন করে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পুরো সত্তরের দশকজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ব-শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলন চলে। এই আন্দোলন পুরো জাতিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একাত্ম করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ধারণা এর শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পুরো জাতির মনস্তত্ত্বকে পরিবর্তন করে দেয়। এখানকার শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব প্রদানের অধিকার এবং

স্বাধীনভাবে সকল কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ তাঁদেরকে সাহসী ও স্বাধীনচেতা নাগরিক হিসেবে বিকশিত করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা সব সময় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসময়ে পূর্ববাংলার জনস্বার্থ বিরোধী সকল আন্দোলন-সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা।

ভাষা প্রশ্নে ১৯৪৭ সাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা লক্ষ করা যায়। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া থেকে শুরু করে এই আন্দোলনকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া সবই করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার শিক্ষা ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয় তার শিক্ষার্থীদেরকে ভালভাবেই দিতে পেরেছিল। ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, ১১ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ আন্দোলন সব ক্ষেত্রে স্বতস্ফুর্তভাবে ছাত্ররা এগিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পাশাপাশি হল ছাত্র সংসদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র ছাত্রদেরকে সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করে। এসবই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ষাট এবং সত্তরের দশক জুড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেওয়াল লিখন, স্বৈরাচার বিরোধী প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, মিছিল, স্লোগান পাকিস্তানী শাসকদের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এই ক্যাম্পাস জন্ম দিয়েছে অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীর। এই ক্যাম্পাসে বসেই অনেকে কালজয়ী কবিতা, গান রচনা করেছেন, সেসব গান ও কবিতার আবেদন সধারণ মানুষকে ঘর হতে বের করে মিছিলে শামিল করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের (বর্তমান নাম শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) আবাসিক ছাত্র হেলাল হাফিজ হলে বসে এসময় নিষিদ্ধ সম্পাদকীয় কবিতাটি লিখেছিলেন। এই কবিতাটি ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লিখিত। একই হলে বসে শিব নারায়ণ দাস বাংলাদেশের মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শ্রেণি কক্ষে বসে পাঠগ্রহণ করেছে, রাস্তায় আন্দোলন করেছে, টিএসসিতে সাংস্কৃতিক চর্চা করেছে এবং হলে বসে ভবিষ্যৎ স্বাধীন দেশের আকৃতি প্রদান করেছে।

অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের মতে, "পূর্ব পাকিস্তান এবং পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন অর্থাৎ পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে একটি মীমাংসাকারী ভূমিকা পালন করেছে, তা নিঃসন্দেহ"।[১০] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ পূর্ববাংলার মুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৯৪৭ সালের পর

থেকেই বাঙালির স্বাতন্ত্র্য জাতীয় চেতনা বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। দেশ-বিদেশে জনমত গঠন, বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান, পরিকল্পনা প্রণয়ন এমনকি রাজপথের সংগ্রামেও শিক্ষকদের সরব উপস্থিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পাকিস্তানীদের প্রধান লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে শিক্ষকরা জরুরি এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। এই সভায় মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্যতা স্বীকার করে যুদ্ধের সম্ভাব্য কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করার জন্য গ্রামাঞ্চলে 'কিনশিপ নেটওয়ার্ক' তৈরীর বিষয়ে কোন কোন শিক্ষক মত প্রকাশ করেন। মার্চ মাসের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শহীদ মিনারে গিয়ে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য এবং স্বাধীনতার জন্য জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন।[১১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে যে বহুমাত্রিকতা রয়েছে তা নিঃসন্দেহে তার বিদ্যার্থীকে রাজনীতি সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠতে প্রেরণা দেয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ তাঁকে অধিকার সচেতন করে গড়ে তোলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সূচিত যে কোন প্রতিবাদ কর্মসূচি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ত। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরো জাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেছে।

৬.১.২ বাংলা একাডেমি

১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরে গভর্নরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরের জন্য যে তিনটি বাড়ি নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে বর্ধমানের মহারাজা থাকার জন্য নির্মিত বাড়িটির নাম ছিল বর্ধমান হাউস। এই বাড়িটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হত। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার ১৬ নম্বর দফায় এই বাড়িটিতে বাংলা ভাষার গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল।[১২] যুক্তফ্রন্টের প্রথম সরকার বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তবে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে আবু হোসেন সরকার ক্ষমতায় এলে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেন। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা বাংলা ভাষা সংস্কৃতির উন্নয়নে এক মাইলফলক।

বাংলা একাডেমির উদ্বোধনী ভাষণে পূর্ববাংলার তৎকালীন উজীরে আলা (প্রধানমন্ত্রী) আবু হোসেন সরকার বলেন,

> একুশ দফা কার্য্যসূচীতে পূর্ববাংলার জনগণের কাছে আমরা যে সব প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আজ তাহারই একটি ওয়াদা পালনের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। সাড়ে চারকোটি পূর্ব-বঙ্গবাসীর মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা এবং তাহাকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার যে সার্বজনীন দাবি, মূলতঃ তাহা হইতেই বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জন্ম লইয়াছে। কাজেই বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা পূর্ববাংলার ভাষার শাশ্বতদাবি ও ঐতিহাসিক আন্দোলনেরই প্রথম বাস্তব স্বীকৃতি। যাঁহাদের

> মহান ত্যাগে এইদাবি অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিয়াছে, আজিকার এই দিনে সকলের আগে আমরা তাঁহদের স্মরণ করিতেছি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে।[১৩]

এই বক্তব্য থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, একুশের মহান আত্ম-ত্যাগ ভাষাভিত্তিক চেতনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতেই বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভাষা প্রশ্নে বিরোধ থেকেই মূলত বাংলা একাডেমির মত একটি প্রতিষ্ঠানের ধারণা বিকশিত হয়েছিল। দেশের যে কোন ভাষার উন্নয়নে যেখানে সরকার উদ্যোগী হওয়ার কথা সেখানে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকার এর বিনাশ সাধনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। বিপরীতে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের ভেতর থেকে এরকম একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দাবি ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার উন্নয়ন শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক শাহেদ আলী বলেন,

> বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা ও ভাষারূপে বাংলার স্বীকৃতি এদেশের জনসাধারণ নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য যে ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় নিজেদেরকে যাচাই করেছে তারই প্রতিফলন। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠারদাবি উঠেছিল জনসাধারণের তরফ থেকে। কারণ রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলা যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের প্রকাশের বাহন হতে পারে, এ সম্পর্কে অনেকের মনে দ্বিধা-সংশয় ছিল, তাই এর উপযোগিতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশেষ করে ভাষা, সাহিত্য ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীদের নিজ সত্তাকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ছিল অনস্বীকার্য্য।[১৪]

বাংলা একাডেমির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আদায়, পূর্ববঙ্গের ভাষার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা রক্ষা করা, ভাষার সমৃদ্ধি-সাধন, সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার-সাধন, সাহিত্যিকদের শোষণ বন্ধ করে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। বর্ধমান হাউজে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করার পেছনে কারণ হলো, পূর্ববাংলার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও নূরুল আমিন বর্ধমান হাউজে বসবাস করেছেন। তাঁরা উভয়েই এই ভবনে বসেই ভাষা আন্দোলনকে দমন করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। মুসলিম লীগ সরকার বাঙালির স্বার্থবিরোধী বহু সিদ্ধান্ত এখানে বসে গ্রহণ করেছিলেন। যেখানে বসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ধ্বংস করার চক্রান্ত হয়েছিল সেখানেই বাংলাভাষার গবেষণাগার স্থাপনের দাবি উঠেছিল ছাত্র-শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে।[১৫] এভাবে বাঙালির চেতনাকে চিরতরে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রস্থলেই নির্মিত হলো বাঙালির পুনরুত্থানের মন্দির।

বাঙালির জাতীয় চেতনার বিকাশ এবং ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাংলা একাডেমির জন্ম হলেও কোন কোন ব্যক্তির প্রভাবে সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোরও চেষ্টাও লক্ষ করা গেছে। বাংলা ভাষা বাঙালির ভাষা কাজেই এই ভাষায় রচিত গান দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল বাঙালিকেই আপ্লুত করবে। কিন্তু, বাংলা একাডেমি কখনো কখনো সেই সত্যকে ভুলে গিয়ে বাংলা গানকে পূর্ববাংলা-পশ্চিম বাংলার বিভাজনের দৃষ্টিতে দেখেছেন। বাংলা একাডেমি ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান জাতীয় চেতনাকে

জাগ্রত করার জন্য এ ধারার সাহিত্যিক ও গীতিকারের রচিত গানের সংকলন করেছিলেন। সংকলনের মুখবন্ধে সম্পাদক বলেন,

> কিছুদিন আগে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'আমার দেশ' নামে একটি গীতি-বিচিত্রা পরিবেশন করা হয়। তার সব ক'টি গানই ছিল দেশপ্রেমমূলক। আর গীতিকারদের নিবাস ছিল, এবং এখনো রয়েছে, পশ্চিম বাংলায়। দেশ প্রেমের প্রেমটুকু সব দেশেই প্রায় এক। কিন্তু দেশগুলো এক নয়। তাই দেশের প্রতি প্রেমের জন্য যেসব দেশ-প্রেমের গান রচিত হয়, সেগুলোর এক দেশের গান সব দেশের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। পশ্চিম বাংলা আর আমাদের নয়। রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের আবেদন এবং গানের আবেদন মানবিক, বিশ্বজনীন। সেই দিক থেকে পশ্চিম বাংলার গান আমার মনের মানুষটিকে কিছুটা মুগ্ধ করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই মানুষটির তো আরও একটি পরিচয় আছে। সে পরিচয় আঞ্চলিক, দেশ-ভিত্তিক। রসোত্তীর্ণ সাহিত্য বা গানে সে পরিচয় থাকলে তবেই তা' সেই মানুষটিকে সম্পূর্ণভাবে মুগ্ধ করবে। বলা বাহুল্য সে সাহিত্য বা গান আমার দেশের সাহিত্যিক বা গীতিকারে কাছ থেকে আসা করব। আমার পাকিস্তান, পাকিস্তানের মন, পাকিস্তানের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথা আমি তো পাকিস্তানের সাহিত্যিক বা গীতিকারের কাছ থেকেই সত্যিকার ভাবে পেতে পারি।[১৬]

মূখবন্ধের এই বক্তব্যে বোঝা যায় বাংলা একাডেমির দায়িত্বে কখনো কখনো এমনও ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিভাজন করেছেন। অথচ বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ভাষার সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে তথা বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চাকে আরও উৎসাহিত করতে। এই সংকলনে কাজী নজরুল ইসলামেরও নয়টি গান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আর নজরুল ইসলাম ছিলেন জন্মসূত্রে ভারতের নাগরিক। এছাড়া সেসময়ে পূর্ববাংলায়ও অনেক হিন্দু গীতিকার ছিলেন। শুধুমাত্র ধর্মীয় চেতনা থেকে সেটি করা হয়েছিল বলে সেখানে হিন্দু গীতিকারের একটি গানও স্থান পায়নি। এছাড়া বাংলা সাহিত্যকে যে কবি বিশ্বের কাছে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই মহান কবির জন্মশতবার্ষিকী পালনেও বাংলা একাডেমি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বরং বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের সংহতির প্রয়োজন হলে আমি রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দিতে রাজী আছি'।[১৭] পাকিস্তানী ভাবধারার সাহিত্যিকগণ সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকেই এ ধরনের আচরণ করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকতে পারে না। এ ঘটনা নিশ্চয় বাংলা একাডেমির মূল চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবি উঠেছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কেননা যেখানে বসে বাংলা ভাষাকে ধ্বংষের ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল সেখানেই বাংলাভাষার পুনরুজ্জীবনের সূতিকাগারে নির্মিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এর প্রতীকি গুরুত্ব রয়েছে বটে। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে এই ভাষার উন্নয়ন সাধনের লক্ষে। ভাষার কোন ধর্মীয় চেতনা থাকতে

পারেনা এবং সাহিত্য সার্বজনীন, এটি নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর হতে পারে না। এই প্রতিষ্ঠানটি এর বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন তথা বঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

৬.১.৩ নজরুল একাডেমি

নজরুল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালে। নজরুল একাডেমি ছিল পাকিস্তানী জাতীয় ভাবধারায় পুষ্ট একটি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-কেন্দ্রিক সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এর প্রচেষ্টা ছিল কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাবমূর্তিকে খন্ডিতভাবে ব্যবহার ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য রচনা করা। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পূর্ববাংলার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং আধুনিক ও প্রগতিশীল ভাবধারাকে সম্পৃক্ত করে মুসলিম ঐতিহ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানী সংস্কৃতির নির্মাণ ও সংরক্ষণ করাই এর মুল লক্ষ ছিল।[১৮] এক্ষেত্রে সবচেয়ে নিন্দনীয় বিষয় হলো পূর্ববাংলায় নজরুলের রচনার খন্ডিত ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য হাসিলের অপচেষ্টা করা হয়েছিল।[১৯] নজরুলের রচনা বৈচিত্র্যময় হলেও এ সময়ে নজরুলের ইসলামী ভাবধারার রচনাগুলো বেশি করে চর্চিত হতে লাগলো।

এই প্রতিষ্ঠানটি নজরুলের রচনা সংগ্রহ, সংকলন এবং কবির জীবনী গ্রন্থ প্রকাশের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া দেশ-বিদেশে নজরুল সাহিত্য প্রচার, গান ও কবিতার মৌলিক সূর সংরক্ষণের জন্য টেপরেকর্ডার এবং গ্রামোফোন রেকর্ড তথা স্বরলিপি সংগ্রহ ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এখানে গ্রন্থাগার, পাঠচক্র, স্কুল, ইনস্টিটিউট, প্রকাশনা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নজরুল চর্চাকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নজরুল একাডেমি পত্রিকা ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তবে নজরুল একাডেমি পাকিস্তানী ভাবধারায়, সাহিত্যে মুসলিম ইতিহ্য ও রীতিনীতির চর্চা ও প্রসারের মাধ্যমে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ বিস্তারের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেন তা কবি চেতনার পরিপন্থি। কবি সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে তা সমর্থন করতেন কিনা সে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই সামনে চলে আসে। কেননা কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন, প্রেমের কবি, দ্রোহের কবি, সাম্যের কবি, বিশ্বমানবতার কবি। তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মকে কোন ধর্ম-বর্ণ, দেশ-কাল বা সীমানায় আবদ্ধ করেননি। তিনি যেমন ইসলামী সঙ্গীত রচনা করেছেন আবার একাধারে শ্যামা সঙ্গীত, ভজন ইত্যাদিও রচনা করেছেন। তিনি তাঁর রচনার জন্য একদিকে যেমন গোঁড়া মুসলিম মোল্লাদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুদের ও বিরাগভাজন হয়েছেন। কাজেই এই মহান কবিকে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে খণ্ডিতভাবে উপস্থাপন করে কবির অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে অসম্মান করা হয়েছে। এতদসত্বেও প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন নজরুল একাডেমী বাঙালির চেতনাকে শাণিত করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সাহিত্যের নিজস্ব একটি ধর্ম আছে যা অজ্ঞানতার অন্ধকার

থেকে আলোর সন্ধান দেয়। আর নজরুলের সাহিত্যে এমন কিছু আছে যা মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে প্রেরণা যোগায়। কাজেই নজরুল চর্চার মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত না হয়ে বরং অসাম্প্রদায়িক ভাবধারায় বিকশিত হতে অনুপ্রাণিত করে।

৬.২ সাহিত্যিক সংগঠন ও আন্দোলন

ব্রিটিশ শাসনামলে কলকাতা ছিল বাঙালির শিল্প-সাহিত্য চর্চার মূলকেন্দ্র। পূর্ববাংলায় জন্ম নেওয়া কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণও কলকাতাকেই তাঁদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেঁছে নিয়েছিলেন। তবে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের শাখা তাঁরা ঢাকায় স্থাপন করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের পর অনেক কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ঢাকায় চলে আসেন। পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের ভাবনা ও বিকাশের লক্ষ্যে অনেকে বিভিন্ন সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকাল এসকল সংঠন পূর্ববাংলার মানুষের জীবনাচরণে গভীর প্রভাব রেখেছিল। নিচে এসকল সংগঠনের উৎপত্তি বিকাশ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

৬.২.১ মুসলিম সাহিত্য সমাজ

উনিশশ শতকের বিশের দশকের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক-শিক্ষার্থী মুসলিমদের আধুনিককতার সাথে যুক্ত করার ভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসেন। সাহিত্যে আধুনিকতার অর্থই হলো নতুন মুল্যবোধের সৃষ্টি। তাঁরা পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কূপমণ্ডকতা ও অজ্ঞানতার জাল ছিন্ন করে আধুনিক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানস গঠনে প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেন। আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিই এর একমাত্র পথ। সে ভাবনার ফসল হিসেবে তাঁদের প্রচেষ্টায় ১৯২৬ সালে জন্ম হলো 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলের ছাত্র সংসদ কক্ষে প্রতিষ্ঠার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সভায় সভাপত্বি করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক আবুল হুসেন, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষক কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী আনোয়ারুল কাদির এবং কিছু ছাত্রদের সমন্বয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়। এই সংগঠনের মুখপত্র ছিল 'শিখা'।'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' ছিল এদের শ্লোগান। এই সংগঠনের নামের আগে মুসলিম শব্দ যুক্ত হলেও এটি কোন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে জন্ম হয়নি বলে প্রতিষ্ঠাতাগণ উল্লেখ করেছেন। এর বিভিন্ন অধিবেশন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), সুরেন্দ্র নাথ মৈত্র, হেমন্তকুমার সরকার, রমেশ চন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) প্রমূখ হিন্দু সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার এবং আধুনিক ধারার শিল্প-সাহিত্যে সৃষ্টি এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এর সম্পাদক ছিলেন আবুল হুসেন। তিনি সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণিতে বলেছেন,

> আপনাদের কেহ কেহ হয়ত মনে করবেন এ সমাজের নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' হওয়ায় হিন্দু সাহিত্যিকগণের কোন সম্পর্ক এতে নাই। কিন্তু এই বার্ষিক বিবরণ হতে আপনারা বুঝবেন যে এ-সমাজ

কোন একটি বিশিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। কিংবা এ কোন এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গঠিত হয় নাই। সাহিত্য-সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য; আর সেই সাহিত্য মুসলমানদের প্রাণ ও জীবন ফুটিয়ে তোলাই অন্যতম উদ্দেশ্য।[২০]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় আসলে সাহিত্যর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের জাগ্রত করে সচেতন সমাজ বিনির্মাণই এই সংগঠনের মূল লক্ষ ছিল। তথাপিও সাহিত্য কেন্দ্রিক সংগঠনে ধর্মীয় পরিচয় যুক্ত নাম বাঞ্ছিত নয়। এতদসত্বেও খেলাফতের পতন এবং মুসলিমদের গৌরবময় যুগের অবসানের যুগে ধর্মনির্ভর সাহিত্যের মোহমুক্ত করে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনার জন্য ধর্মকেই উপজীব্য করে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। আসলে পূর্বে মুসলিম সাহিত্য ছিল অনেকটা ধর্ম নির্ভর। সাহিত্যে ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তাকে মানবতাবাদী চিন্তায় রূপান্তরের প্রচেষ্টায় এঁরা কাজ করেছেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিষয়ক লেখায় আধুনিক মানসিকতার প্রকাশ লক্ষ করা যায় এই সংগঠনের সাথে যুক্ত লেখকদের গদ্য সাহিত্যে। পূর্ববাংলা মুক্তি আন্দোলনে সরাসরি ভূমিকা না থাকলেও বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক জীবন ও তাঁদের চিন্তা ভাবনায় স্বদেশচেতনা ও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করতে মুসলিম সাহিত্য সমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

৬.৩ তমুদ্দুন মজলিস

'তমুদ্দুন মজলিস' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর। 'তমুদ্দুন মজলিশ' আরবি শব্দ যার বাংলা অর্থ নাগরিক সভা। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের তরুণ প্রভাষক জনাব আবুল কাশেম (অধ্যক্ষ আবুল কাশেম নামে অধিক পরিচিত)। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তার প্রসার ঘটানো। এই সংগঠনের গঠনতন্ত্র তিনবার পরিবর্তন করা হয়। প্রথম গঠনতন্ত্রে অনুযায়ী এর অন্যতম লক্ষ ছিল, কুসংস্কার এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর করে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিল্প-সাহিত্য নির্ভর একটি রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করা। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ভাষা প্রশ্নে যে বিতর্ক সূচনা হয়, তাতে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য এই সংগঠন দাবি উত্থাপন করে। অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগতভাবে এর পূর্বেও বাংলাকে শুধুমাত্র পাকিস্তান নয় ভারতেরও রাষ্ট্রভাষা করারদাবি জনানো হয়েছিল।[২১] তবে এই সংগঠনটি যে সময়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান তখন অনেকেই সাহস করেননি। ভাষা প্রশ্নে ছাত্রদের আন্দোলন জোরদার করার আগে এ ক্ষেত্রে তমুদ্দুন মজলিস সোচ্ছার ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তমুদ্দুন মজলিসের একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সেখানে দাবি করা হয় বাংলা ভাষাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, আদালতের ভাষা, অফিসাদির ভাষা। উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা।[২২] তমুদ্দুন মজলিসের নেতৃবৃন্দ তৎকালীন সরকারের

সাথে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য নানা দেন-দরবার করেন। তারা ১৮৪৮ সালের প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করা জন্য শ্রমিক কর্মচারী এবং ছাত্রদের সংগঠিত করেন। তারা শিল্প-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সাপ্তাহিক সাহিত্য সভার আয়োজনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৮ সালের ১৪ নভেম্বর এই সংগঠনের মূখপত্র সাপ্তাহিক 'সৈনিক' প্রকাশিত হয়।[২৩] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তমুদ্দুন খিলাফতে রাব্বানী পার্টির সাথে অংশ গ্রহণ করে। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে সংঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়। এছাড়া ধর্মভিত্তিক রক্ষণশীল মতাদর্শের অনুপ্রবেশ এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিকতাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের দিকে এই প্রতিষ্ঠান অনেকটা অকার্যকর হয়ে যায়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের দুই সপ্তাহের মাথায় তমুদ্দুন মজলিস-এর জন্ম হয়। এখানেই এই সংগঠনের গুরুত্ব নিহিত। কেননা নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পাকিস্তানী সংস্কৃতির মোহাবিষ্ট পরিবেশে বাঙালির স্বাতন্ত্র্য চিন্তা নিয়ে এগিয়ে আসা নিঃসন্দেহে একটি সাহসী পদক্ষেপ। সূচনাকারী পদক্ষেপ পরবর্তীকালে অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ী ভূমিকা পালন করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৬.৪ পরিবেশনা শিল্পের বিকাশ

ষাটের দশকের শুরু থেকে পূর্ববাংলায় পরিবেশনা শিল্পের বিকাশ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পাকিস্তানী ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার বিপরীতে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানী সংকীর্ণ মানসিকতার প্রতিবাদে ব্যবহারিক শিল্প চর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্ম নেয়। এসকল প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এসকল প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। আবার অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে এসকল প্রতিষ্ঠান তাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালিয়ে যায়। নিম্নে এধরনের দু-একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

৬.৪.১ বুলবুল ললিতকলা একাডেমি

নৃত্যকলা দরবারি বিনোদন মাধ্যম হলেও মুসলিম সমাজের সাধারণের মঝে এই শিল্পের প্রতি রক্ষণশীলতা পরিলক্ষিত হত। এই শিল্প মাধ্যমকে সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে কাজ করেছিলে উপমহাদেশের প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পী বুল বুল চৌধুরী। বুলবুল চৌধুরী মাত্র ৩৫ বছর বয়সে ১৯৫৪ সালে অকাল প্রয়াত হন। এই গুণী শিল্পীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর বন্ধু মাহমুদ নুরুল হুদা বুলবুল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ বা বাফা নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। বাফার শুরু থেকেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি এবং নৃত্য বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। বাফা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে পাকিস্তান সরকারের অনুদান নিয়ে বাফার শিল্পীদের নিয়ে বিদেশ সফরের জন্য সরকারের কাছে ধরনা দেওয়ার কারণে এর কর্মকর্তরা খানিকটা বিতর্কের মধ্যে পড়ে। করাচীতে আইয়ুব খানের জন্মদিনে

তাঁর ছবি নিয়ে নৃত্য করেও সমালোচিত হয়েছিলেন।[২৪] এতদসত্ত্বেও পরিবেশনা শিল্পের দরবারী এই মাধ্যমকে সর্বসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে এই একাডেমী অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে এই শিল্পমাধ্যমে নারীরাও অংশ গ্রহণ করে যা পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রার ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

৬.৪.২ ছায়ানট

একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রতিবাদী চেতনা থেকে বাঙালি সংস্কৃতির ধারক কিছু ব্যক্তির একত্রিত হওয়ার প্রচেষ্টা থেকে ছায়ানটের জন্ম। ১৯৬১ সাল ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী। নোবেলজয়ী এই কবির জন্মশতবর্ষ উৎসব স্মরণীয় করেত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। সরকারের তরফ থেকে পূর্ববাংলায় রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার তৎপরতা চলছিল। কাজেই সরকারীভাবে এধরণের আয়োজনের তো প্রশ্নই ছিল না। বাংলা একাডেমিসহ সাহিত্যাঙ্গনেও খুব একটা তৎপরতা লক্ষ করা যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কোন কোন শিক্ষক উৎসাহী থাকলেও প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগে আগ্রহ দেখাননি। এমন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত ও নাগরিক উদ্যোগ শেষ ভরসা। হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মুরশিদকে সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ড. খান সরওয়ার মুরশিদকে সম্পাদক করে বিশিষ্ট নাগরিকদের সমন্বয়ে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি গঠিত হয়।[২৫] এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ এবং বিভিন্ন জেলাতে আঞ্চলিক উদ্যোগেও রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। পাকিস্তানী শাসগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সফলভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের পর অনেকেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরির তাগিদ অনুভব করলেন। বলা যেতে পারে এই তাগিদ থেকেই ছায়ানটের জন্ম। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সফল আয়োজনের পর ঢাকার জয়দেবপুরে এক পুণর্মিলনী অনুষ্ঠানে কয়েকজন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক মিলিত হন। সেখানে তাঁরা একটি সমিতি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীকালে ঢাকায় এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রতিষ্ঠানটি আত্ম-প্রকাশ করে।[২৬] এভাবে ১৯৬১ সনের গোড়ার দিকে ছায়ানট প্রতিষ্ঠিত হয়। বেগম সুফিয়া কামাল হলেন ছায়ানটের প্রথম সভাপতি এবং প্রথম সম্পাদক হলেন মিসেস ফরিদা হাসান। এছাড়া এই কমিটিতে আরও ছিলেন, মিসেস মহিউদ্দিন, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, মোখলেছুর রহমান (সিধু ভাই), আহমেদুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, সন্‌জিদা খাতুন, কামাল লোহানী প্রমুখ।

ছায়ানট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচলনা করে। তবে ছায়ানটের সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৬৩ (১লা বৈশাখ ১৩৭০) সালে। ১৯৬৪ সালে অর্থাৎ ১৩৭১ সালের ১লা বৈশাখ রমনা বটমূলে ছায়ানট বৈশাখ বরণের উৎসব পালন করে। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন

অধ্যাপক সন্‌জিদা খাতুন। সেই থেকে রমনা বটমূল ছায়ানট এবং বাংলা বর্ষবরণ সমার্থক হয়ে যায়। তবে বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আবহমান বাংলার একটি বড় উৎসব হিসেবে গ্রাম-গঞ্জে মেলা, সঙ্গীতের আসর, বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ক্রীড়া-কৌশল লাঠি খেলা, ইত্যাদি আয়োজন একং হালখাতা করার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়ে আসছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১লা বৈশাখের জৌলুস কমতে থাকে। সেই বছর ছায়ানটের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন সাড়ম্বরে ১লা বৈশাখ উদযাপন করে। ১৯৬৪ সালের বর্ষবরণে ছায়ানট ছাড়াও বাংলা একাডেমি, পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ, তমুদ্দিন মজলিস, নিক্কন ললিতকলা কেন্দ্র, ঢাকা মেডিকেল সাহিত্য-সংসদ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদ, সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রসংসদ, গীতিকলা সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। সে বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল।[২৭] ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা নববর্ষ বরণের কোন আয়োজন করেনি। ছায়ানটের উদ্যোগে রমনার বটমূলে বর্ষবরণের যে রীতি চালু হয় তা বাঙালির জাতীয় চেতার এক প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি করে। ছায়ানট শতপ্রতিকূলতা সত্ত্বে বাঙালি সংস্কৃতির স্বকীয়তা বজায় রাখার আন্দোলনের মধ্যদিয়ে জাতীয় চেতনার বীজ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। পূর্ববাংলায় পাকিস্তান সরকার ও তাঁদের তাবেদারদের রবীন্দ্রবিরোধিতার প্রতিবাদে ছায়ানটের জন্ম হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সার্বিকভাবে বাঙালি সংস্কৃতি তথা বাঙালি জাতিসত্তা বিনির্মাণে কাজ করে গেছে।

৬.৫ সর্বস্তরে বাংলাভাষার ব্যবহারের প্রচারণা

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীকে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু দাপ্তরিক কাজকর্মসহ সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠী আন্তরিক ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাব পোষণ করতে দ্বিধা করত না। তারা কৌশলে সরকারী দপ্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার করার ক্ষেত্র সংকুচিত করে ফেলেছিল। ফলে ১৯৫২ সালের পরেও বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে নানাভাবে আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হয়েছিল। নিচে এসকল বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

৬.৫.১ বাংলাভাষা ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতার প্রতিবাদ

১৯৬২ সালের ২৯ জুন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সভায় পূর্বাংলার সদস্য জনাব আবদুর রশিদ বাংলাভাষায় প্রশ্ন উত্থাপন করলে জবাবে জুলফিকার আলী ভুট্টো সিন্ধি ভাষায় উত্তর প্রদান করেন। এ নিয়ে পূর্ববাংলার সদস্যরা প্রতিবাদ জানান এবং ভুট্টোর জবাবের বাংলা তরজমা করার দাবি জানান। তাঁরা দাবি করেন যে, জনাব ভুট্টো জাতীয় ভাষাদ্বয়ের যে কোন একটিতে অথবা ইংরেজিতে উত্তর প্রদান করিতে

পারেন। এর পর একজন সিন্ধি সদস্য বলেন, মাতৃভাষায় কথা বলা কি অপরাধ? স্পিকার মন্তব্য করেন যে, এরূপ কোন বিধি-নিষেধ নাই তবে, এর তর্জমার ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখ্য আবদুর রশিদ সরকারী দলের সদস্যদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য একটি স্কুল স্থাপনের জন্য অর্থমন্ত্রী জনাব আবদুল কাদিরের কাছে অর্থ বরাদ্ধ দাবি করেন। এদিন সকালে জনাব আবদুর রশিদ অর্থমন্ত্রীকে বাংলায় প্রশ্ন করা শুরু করলে অর্থমন্ত্রী তাঁর ইয়ার ফোন খুলে ফেলেন। স্পীকার জনাব তমিজউদ্দিন খান উক্ত সদস্যকে ইংরেজীতে কথা বলার পরামর্শ দিলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, 'স্যার আমাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলুন'।[২৮] উল্লেখ্য জাতীয় পরিষদের স্পীকার জনাব তমিজ উদ্দিন পূর্ববাংলার ফরিদপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং বাঙালি ছিলেন।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার স্বীকৃতি দিলেও অফিস আদালতে বাংলাভাষা প্রচলনের ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী ছিল না। পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে দু'অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র সংযোগ স্থাপনকারী মাধ্যম ছিল পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার-লাইন্স কর্পোরেশন (পিআইএ)। পিআইএ তাদের প্রচার কাজে বাংলা ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বে বাংলার প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে পিআইএ ফ্লাইট পরিচালনায় ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় ঘোষণা প্রদানের সার্কুলার জারি করলে পূর্ববাংলায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।[২৯]

অন্য একটি ঘটনায় বাংলা ভাষায় ফরম পূরণ করায় ইউনাইটেড ব্যাংক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা একটি একাউন্ট খুলতে অস্বীকৃতি জানায়। এ খবরে ছাত্রদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ডাকসুর সহসভাপতি জনাব তোফায়েল আহমেদ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁরা বলেন, ইউনাইটেড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই কৃত্তির মাধ্যমে বাংলাকে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের যে সার্বজনীন দাবি, সেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রতি চরম অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। এ ঘটনা সকল বাংলাভাষীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন হল ইউনিট এক যুক্ত বিবৃতিতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মনোভাবের নিন্দা করেন। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষা ব্যবহারের জন্য তাঁরা জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান।[৩০] এসব ঘটনা প্রমাণ করে ভাষাবিদ্বেষী পাকিস্তানী যে কোন প্রচেষ্টা বিনা চ্যালেঞ্জে পার পেয়ে যায়নি।

অন্যদিকে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পূর্ববাংলার শিক্ষার্থীরা বাংলাভাষায় পরীক্ষা প্রদান করেন। কর্তৃপক্ষ রেজাল্ট প্রকাশ স্থগিত করেন। প্রবাসী বাঙালি শিক্ষার্থীরা, পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ও রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ ফলাফল প্রকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানায়। পূর্ব পাকিস্তান

ছাত্রলীগ করাচী শাখা, পূর্ব বাংলা ছাত্র সমিতি সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম গড়ে তোলে। তাঁরা গভর্নরের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রেজাল্ট প্রকাশ করে। সর্বস্তরে বাংলাভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি মাইলফলক।

এদিকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. এনামুল হক ঢাকায় মেডিক্যাল সমিতির ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনকালে জাতীয় ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিদেশী ভাষায় প্রদত্ত শিক্ষা মানুষ পুরাপুরিভাবে আত্মস্থ করতে পারে না। এ ধরনের শিক্ষার ফলে অকল্যাণকর বিজাতীয় মনোভাব গড়ে ওঠে।[৩১] উপরোক্ত ঘটনাবলি ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালির জাতীয় চেতনা নির্মাণের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। বাংলাভাষা প্রচলনের জন্য আলোচিত ঘটনাবলি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয়। এগুলো পূর্ববাংলার অধিবাসীদের প্রাণের দাবি। শুধু মাত্র তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির বিদেশাগত অবাঙালি মুসলমানরা বাংলা ভাষার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন।

৬.৫.২ বাংলা প্রচলন সপ্তাহ

নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পূর্ববাংলার জনসাধারণ সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রচলন করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ১৯৬৬ সালের ১৪ থেকে ২০ই ফেব্রুয়ারি বাংলা প্রচলন সপ্তাহ পালন করে। সর্বস্তরে বাংলাভাষা ব্যবহারের জন্য ছাত্রলীগ এই কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির মধ্যে ছিল ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রচারপত্র, দেওয়ালপত্র, ব্যাজ বিতরণ, ব্যাজ পরিধান; ১৬ থেকে ১৭ই ফেব্রুয়ারি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভা, শহরের বিভিন্ন জায়গায় খণ্ড সভা এবং সরকারি ও বেসরকারি অফিস আদালতে বাংলা প্রচলনের দাবিতে প্রচার; ১৮শে ফেব্রুয়ারি আলোচনা সভা; ১৯ শে ফেব্রুয়ারি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ কর্মীসভা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাংলা ভাষার প্রচার অভিযান এবং ২০শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের কর্মীসভা এবং শহীদ দিবসের প্রস্তুতি গ্রহণ।[৩২] এই কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রলীগ বাংলাভাষার প্রতি সর্বস্তরের মানুষের ভালবাসা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। এই কর্মসূচি নিয়ে ছাত্রলীগ সকালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভা-সমাবেশ পালন করে এবং বিকেল বেলায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে পথসভা করে। ছাত্রলীগ তাদের অফিস হতে বের হয়ে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ইকবাল হল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, রেল হসপিটাল, গুলিস্তান, নবাবপুর, সদরঘাট, ইসলামপুর, ইত্যাদি স্থানে খণ্ড খণ্ড সভা করে এবং বাংলা ভাষা ব্যবহার সংক্রান্ত শ্লোগান দেয়। রাস্তায় রাস্তায় পথ সভার মাধ্যমে বাংলা ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ফলক, অফিস-আদালতের হিসাবপত্র ও নথিপত্র, মোটরগাড়ি, বিভিন্ন যানবাহনের নম্বর প্লেট, চিঠিপত্র এবং নিজ নিজ সাক্ষর বাংলায় করার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি আবেদন করা হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারি অফিস থেকে বের হয়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা শোভাযাত্রা এবং পথসভা করেন।[৩৩] বাংলা প্রচলন সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনে ছাত্রলীগের কর্মীরা শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় চলমান ও অপেক্ষমান যানবাহনের সম্মুখে

পিছনের দিকে ইংরেজি নম্বর মুছে দিয়ে বাংলা নম্বর লিখে দেয়। ছাত্রলীগ কর্তৃক সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রচলন সপ্তাহ পালন ছিল এক অভিনব কর্মসূচি। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেও অফিস-আদালতে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বাধা ছিল বলেই এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই কর্মসূচি বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ তৈরিতে অবশ্যই ভূমিকা রেখেছিল। এটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি ভিন্ন দিক বটে।

৬.৬ রবীন্দ্রভীতি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কর্মজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় পূর্ববাংলায় কাটিয়েছেন। বাংলার নদী, জল, প্রকৃতি এবং জনজীবন তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। তিনি বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতিকে তাঁর সাহিত্যে নিপূণভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর কবিচিত্তে দ্বি-খণ্ডিত বাংলা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতেও এর ছাপ রেখেছেন। পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যেও রবীন্দ্র সাহিত্যের গভীর প্রভাব বিদ্যমান। রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং ভালবাসা অবশ্যই বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি সহজাত অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। সেখানে রাজনীতির কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবং পূর্ববাংলার পাকিস্তানভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীগণ রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কারণে রবীন্দ্র সাহিত্যকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। পাকিস্তানী শাসকচক্রের না হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কোন আবেগ-অনুভূতি না'ই থাকতে পারে কিন্তু পূর্ববাংলার কবি সাহিত্যিকদের মধ্যেও অনেকে একইভাবে ভাষা ও সাহিত্য বিদ্বেষী পথে পা বাড়ালেন। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ন্যায় তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মকে হিন্দুত্ববাদী হিসেবে আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করলেন না। তারা রবীন্দ্রভক্তদের অখণ্ডবাংলা গঠনের ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দেখতে লাগলেন। সরকার পূর্ববাংলার মানুষকে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রভাব মুক্ত করার জন্য নানা তৎপরতা তারা শুরু করলেন। সেই তৎপরতায় পূর্ববাংলার কিছু কবি-সাহিত্যিক ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও যুক্ত হলেন। পূর্ববাংলার মানুষ রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হলেও এর প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়। সরকারের একধরনের অলিখিত নিষেধাজ্ঞার ফলে উনিশশো পঞ্চাশ সালের দিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৩৪] সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িকীকরণের এক নিন্দনীয় নজির স্থাপিত হলো।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয় ১৯৬১ সালে। বিভিন্ন মহল থেকে পূর্ববাংলার রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগের বিরোধিতা করা হয়। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সরকারীভাবে রবীন্দ্র জন্মমতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগে তো প্রত্যাশিত ছিল না বরং বিজাতীয় বলে এ ধরনের আয়োজনের বিরোধিতা করা হয়। কোন কোন পত্রিকায় মাসব্যাপী রবীন্দ্র বিরোধী প্রচারণা চালানো হয়।[৩৫] কট্টর পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও রাজনীতিকরা সভা-সমাবেশের মাধ্যমে নগ্নভাবে রবীন্দ্রনাথের

সমালোচনা করে এ ধরনের আয়োজনের বিরোধিতা করেন।[৩৬] তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এ ধরনের বিরোধিতার ফলে পূর্ববাংলার জনমনে রবীন্দ্রনাথ আরও পাকাপোক্তভাবে অধিষ্ঠিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'সংস্কৃতি সংসদের' সভাপতি খান সারওয়ার মুরশিদের মতে, সরকারের বাধা-নিষেধের ফলে সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা একটি রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো।[৩৭] কোন জাতিসত্তার নিজস্ব সংস্কৃতির গতিধারাকে বাঁধাগ্রস্থ করা নিঃসন্দেহে অপরাজনীতি। সে কারণে পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবীগণ পাকিস্তানীদের এই অপপ্রচেষ্টাকে রুখে দিয়েছিলেন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রবিদ্বেষী প্রচারণার মধ্যেই মফস্বল শহরের অনেক সংগঠন রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে এগিয়ে এলেন। বিভিন্ন পর্যায়ে উদযাপন কমিটি গঠিত হতে লাগল। ঢাকা শহরেও অবশেষে নাগরিক উদ্যোগ গৃহিত হয়। বিচারপতি এস এম মুরশিদকে সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ড. খান সরওয়ার মুরশিদকে আহবায়ক করে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ২৪ শে বৈশাখ থেকে চার দিনব্যাপী আলোচনাচক্র, সংগীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি, নাট্যাভিনয় ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠান পালন করে।[৩৮] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল সংসদ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংগঠনসমূহ এবং তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ঢাকার বাইরে জন্মশতবার্ষিকীর সবচেয়ে বড় আয়োজন হয় চট্টগ্রামে। এছাড়া জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, বগুড়া, গাইবান্ধা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, যশোর, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী পালনের খবর পাওয়া যায়।[৩৯] এভাবে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে যায়। তর্ক-বিতর্ক ও সংবাদ পত্রের প্রচারণার ফলে অনেকেই সাহিত্যের প্রতি খুব একটা সমঝদার না হয়েও রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।[৪০] আজাদ পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক খবর ও সম্পাদকীয় প্রকাশ এবং জোরালো বিতর্কের কারণে পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে গভীর অনুরাগ ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়।[৪১] পাকিস্তানী শাসক ও তাঁদের সহযোগীদের সাম্প্রদায়িক ভাবনা প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হল।

বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পাকিস্তানীদেরকে ভাবিয়ে তোলে। ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন যে, 'বেতার ও টেলিভিশনে পাকিস্তান বিরোধী রবীন্দ্র সংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানও প্রচার হ্রাস করা হবে।[৪২] কয়েকজন বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিকর্মী রবীন্দ্রসংগীত বন্ধের পক্ষে বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতি প্রদানকারীদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষক, ৪০ জন সাংস্কৃতিক কর্মী, ৩০

জন মাওলানা, ৫০ জন সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন বলে জানা যায়।[৪৩] সরকারের ঘোষণার বিরোধিতা করে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীগণ এক বিবৃতিতে বলেন,

> স্থানীয় সংবাদপত্রে ১৩ই জুন তারিখে মুদ্রিত এক সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সরকারী মাধ্যম হইতে রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলিয়া মনে করি।
>
> রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করিয়াছে, তাঁহার সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীর সংস্কৃতির সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করিয়াছে। সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্তার গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।[৪৪]

কয়েকজন উর্দু কবি ও সাহিত্যিকও বিবৃতির মাধ্যমে সরকারের এধরনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন।[৪৫] রবীন্দ্রনাথকে প্রতিরোধের সরকারী প্রচেষ্টা যে কতখানী সংস্কৃতি বিদ্বেষী ছিল উর্দু কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতিবাদী বিবৃতি তারই প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথকে প্রতিরোধের শত প্রচেষ্টা হলেও এদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়নি। পূর্ববাংলায় রবীন্দ্রনাথ আরও বেশি করে চর্চিত হতে শুরু করে। অনেক কোম্পানী রবীন্দ্রসঙ্গীতের গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরিতে এগিয়ে আসলেন। ১৯৬৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ববাংলায় প্রস্তুত রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম মৌলিক রেকর্ডের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বভারতীর অনুমোদন নিয়ে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে 'বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের' প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন যে,"সংস্কৃতির ওপর হামলার কারণেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের উপর হামলা আসে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত ছাড়া বাংলা সঙ্গীতই অসম্পূর্ণ"[৪৬] পূর্ববাংলার মানুষ সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে ধর্মীয় চেতনাকে মেলাননি কখনো। রবীন্দ্র-নজরুল তাঁদের কাছে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক। রবীন্দ্র সাহিত্যের অনেক উপাদান বাঙালির জাতীয় চেতনার উৎস। সে কারণেই মূলত পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী পূর্ববাংলায় রবীন্দ্র চর্চা বন্ধ করতে চেয়েছিল।

এই সাংস্কৃতিক বিতর্ক প্রকারান্তরে মানুষের রাজনৈতিক চেতনায় রূপান্তরিত হয়। এটি ছিল পূর্ববাংলার মানুষের সহজাত প্রবণতা। যেখানেই বাঁধা সেখানেই প্রতিরোধ, এভাবেই এদেশের মানুষ অধিকারের প্রশ্নে ক্রমান্বয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন। পূর্ববাংলার সংস্কৃতির স্বকীয়তা এবং স্বৈরশাসন বিরোধী মনোভাব মানুষকে আরও মানুষকে আরও বেশী একাত্ম করে। রবীন্দ্র বিতর্ককে কেন্দ্র করে সূচিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রকারন্তরে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে ভূমিকা রাখে।

৬.৭ পাকিস্তানী ভাবধারার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর পাকিস্তান আন্দোলনকে কবি-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাঁদের কর্মতৎপরতায় যুক্ত করার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষে ১৯৪২ সালে কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি এবং 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন দুটির প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিলেন মুজিবুর রহমান খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ সাজ্জাদ হেসেন, আলী আহসান প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ। পাকিস্তানের জাতীয় চেতনা বিনির্মাণ, আরবি, উর্দু, ফারসি শব্দবহুল বাংলা সাহিত্য রচনা করা এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের থেকে স্বাতন্ত্র্য থেকে ইসলামের ঐতিহ্যকে সাহিত্যের মূল উপজীব্য করে সাহিত্য রচনা করা ইত্যাদি লক্ষ্য সামনে নিয়ে তাঁরা সংগঠন দুটি প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৭] পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনেক ব্যক্তি ও সংগঠনের আত্ম-প্রকাশ করে। এসকল ব্যক্তি ও সংগঠন ধর্মকে উপজীব্য করে বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম এবং আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার বাঙালি অধিবাসীদেরকে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চালায়। তাঁরা প্রচলিত বাংলাভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের কথা বলেন। নিচে এসকল ব্যক্তি ও সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

৬.৭.১ বাংলাভাষা সংস্কারের উদ্যোগ

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাভাষার ওপর একটার পর একটা আক্রমণ আসতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার আরবি হরফে বাংলা চালু করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং পূর্ববাংলা সরকারের অবাঙালি শিক্ষা সচিব ছিলেন এর উদ্যোক্তা।[৪৮] তাঁদের যুক্তি হলো যে, বাংলা ভাষায় যুক্ত অক্ষরের ব্যবহার অনেক কঠিন। যেহেতু দেশের ৯০ শতাংশ লোক আরবি জানে, এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য সহজ হবে।[৪৯] তাঁরা আরও মনে করেন, পূর্ববাংলার বেশীরভাগ মানুষ আরবী হরফের সাথে পরিচিত। বাংলা লেখার মাধ্যম হিসেবে আরবী হরফ গৃহিত হলে সাক্ষরতার হার রাতারাতি ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭০-৮০ শতাংশে উন্নীত হবে। তারা আরও বলেন যে, বেশীরভাগ পরীক্ষক হিন্দু হওয়ায় মুসলমান ছাত্ররা সুবিচার পায় না। আরবী হরফ প্রচলন হলে তাদের জারিজুরি আর থাকবে না। আরবি হরফে লেখা হলে মুসলিম দেশগুলোর সাথে একাত্মতা বৃদ্ধি এবং বাংলাভাষায় ইসলামী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটবে।[৫০] এ ধরনের অবাস্তব যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য তারা তৎপর ছিল।

পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সরকার মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে সভাপতি করে একটি ভাষা-সংস্কার কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সৈয়দ মুহম্মদ আফজল, আবুল হাসনাত, মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, ডক্টর এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের হেড গণেশ বসু প্রমূখ। বাংলাভাষার ব্যাকরণ, বানানরীতি, বিদেশী শব্দের পরিভাষা তৈরি, অনুবাদ এবং বাংলা ভাষাকে পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সরকারের এই উদ্যোগ উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের আরবীকরণ নীতিরই যেন প্রতিচ্ছবি। খিলাফতের সর্বত্র আরবি ভাষা ব্যবহার, আরবি ভাষায় ছাপাঙ্কিত মুদ্রা তৈরি, দাপ্তরিক কাজে আরবি ভাষার প্রচলন,আরবীয় সংস্কৃতির বিস্তারের এই প্রচেষ্টা আরবীয়করণ নীতি হিসেবে পরিচিত। আরবীয়করণ রীতি সফল হয়নি। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ভাষার ধর্মীয়করণের বিরুদ্ধে বাঙালিরা সোচ্চার হয়।

কমিটির সদস্যরা বাংলা বর্ণমালা থেকে শুরু করে ব্যাকরণ পর্যন্ত আদ্যন্ত সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত বাংলা ব্যাকরণ ছাড়া কিছু নয় বলে কমিটি মন্তব্য করেন। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুহিতা বা দৌহিত্রী বলে স্বীকার করা যায় না বলে সদস্যরা মতে প্রকাশ করে আমূল সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করলে হিন্দু সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক গণেশচরণ বসু কিছুটা আপত্তি জানালে কমিটির অন্যতম সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁকে বলেন, "দেখুন গণেশ বাবু, বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃতের আওতা থেকে মুক্ত করে আমরা যেভাবে এর সংস্কার করতে চাইছি, তাতে আপনার মত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কোন কথা না বললেই সম্ভবত শোভন হয়"।[৫১] স্বাভাবিক কারণেই অধ্যাপক গণেশচরণ বসু সংস্কার কমিটির আর কোন সভায় উপস্থিত হননি। কমিটি পূর্ব বাংলার জনগণের 'প্রতিভা ও সংস্কৃতি' এবং ইসলামী আদর্শের সাথে সমন্বয় সাধন করে রিপোর্ট প্রণয়ন করে। বর্ণমালা থেকে কিছু বর্ণবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। উর্দু ও রোমান হরফে বাংলা লেখার বিষয়টি ২০ বছরের জন্য স্থগিত করার সুপারিশ করা হয়।[৫২] কমিটি বাংলা ভাষাকে 'হিন্দুত্ববাদ' থেকে মুক্ত করে মুসলিম ভাবধারার সন্নিবেশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাষার জন্ম হয় নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজনে এবং সেখানে পারিপার্শ্বিক প্রভাব অবধারিত। ধর্মকে কেন্দ্র করে কোন ভাষার জন্ম হয়নি বরং যুগ যুগ ধরে ভাষাকে আশ্রয় করে বিভিন্ন ধর্ম মানবের মাঝে প্রচারিত হয়েছে। পাকিস্তান সরকার ও তাঁদের এদেশীয় সহযোগীদের এই প্রচেষ্টা বাঙালিদেরকে তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আরও বেশী অনুরাগী করে তোলে যা জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শাণিত করে।

৬.৭.২ 'পাক-বাংলা' সাহিত্য

পূর্ববাংলার সাহিত্যিকগণ দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটি অংশ সাহিত্য সৃষ্টিতে বাংলার আবহমান সংস্কৃতি, বাংলার ভৌগোলিক উপাদান এবং মানুষের জীবন থেকে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ

করেন। অন্য ধারার সাহিত্যিকগণ ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ এবং পাকিস্তানী জাতীয়তবাদী চেতনায় সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হন।

দ্বিতীয় ধারার সাহিত্যিকগণ নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী চেতনা বিনির্মাণে প্রবল প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তাঁরা 'পাক-বাংলা সাহিত্য' সৃষ্টির লক্ষে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাঁর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চট্টগ্রামে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' আয়োজন করা। ১৯৫৮ সালের ২-৪ মে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য মাহফিলের উদ্যোগে এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে মৌলবী আবদুর রহমান এবং মৌলবী নূরুল ইসলাম যথাক্রমে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী এ কে খান, রফিউদ্দিন আহমেদ সিদ্দিকী এবং তৎপুত্র সাইফুদ্দিন আহমেদ সিদ্দিকী এই সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। ঢাকা কুমিল্লা ও কাগমারী সম্মেলনের প্রতিবাদে এবং সাহিত্যে পাকিস্তানী ভাবধারা ফিরিয়ে আনতে চট্টগ্রামে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' আয়োজন করা হয়েছিল তা আয়োজকদের বক্তব্যে বোঝা যায়।[৫৩] এই সম্মেলনে অন্যান্য প্রবন্ধের পাশাপাশি প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ 'আমাদের সাহিত্যে পাকিস্তানী আদর্শ' কবি গোলাম মোস্তফা 'পাক-বাংলার কাব্যসাহিত্য', আশরাফ সিদ্দিকী আজাদী-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যসাহিত্য, আবুল মনসুর আহমদ ' পাক-বাংলার কালচার ও ভাষা' মোহাম্মদ আজরফ ' আমাদের তামদ্দুনীন পুনর্গঠন' প্রবন্ধগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সম্মেলনে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য মহফিল' নামক একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গৃহিত হয়। এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে জনাব আবদুর রহমানকে আহবায়ক নিযুক্ত করা হয়।[৫৪] পাক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা এমনি উন্মাদনা তৈরি করে যে, 'মুসলমানী' বাংলা ভাষার অভিধান পর্যন্ত তৈরি হয়ে যায়। উনিশশ শতকে বাংলা ভাষায় বাঙালি মুসলমানদের ব্যবহৃত ৬০০০ আরবি, ফার্সি, উর্দু, হিন্দি শব্দ সংবলিত একটি *Musalmani Bengal-English* অভিধান প্রকাশিত হয়। এই অভিধানে সংস্কৃত থেকে আগত বাংলা বর্ণ পরিহার করা হয়। অভিধানটির রচয়িতা ছিলেন William Goldsack এবং এটি প্রকাশ করেন 'দ্য সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ।[৫৫] এ ধরনের প্রচেষ্টা থেকে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, বাঙালির মন থেকে আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি মুছে দিয়ে তথাকথিত পাকিস্তানী ভাবধারায় উগ্র ধর্মীয় সংস্কৃতি বাঙালিদের মনস্তত্বে অনুপ্রবেশ ঘটানোই তাঁদের মূল লক্ষ ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারী লর্ড মেকলে ভারতীয় শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক যে রিপোর্টে (Minute on Indian Education) প্রদান করেন তাতে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে ইংরেজী ভাবধারা সম্পন্ন ভারতীয় জাতি গঠন কথা বলা হয়েছিল।[৫৬] পাকিস্তান সরকারও একই পথে পা বাড়ায়। ব্রিটিশ সরকার যেমন সফল হয়নি এক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির কাছে পাকিস্তানীরাও পরাজিত হয়েছে।

৬.৭.৩ নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন

১৯৫৬ সালের ৮ এপ্রিল করাচীতে নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। পাকিস্তান ইতিহাস সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডা. এ মঈনুল হক সম্মেলনে শিক্ষা শাখার সভাপতির ভাষণে উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি বলেন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আগামী ১০ বছরে ইংরেজির পরিবর্তে উর্দু সরকারি ভাষায় পরিণত হবে, কাজেই উর্দুতে উচ্চশিক্ষা প্রদান আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহিত হয়।[৫৭] এভাবে উর্দুকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে।

৬.৭.৪ পাক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং 'রওনক'

পাকিস্তানী ভাবধারার কিছু কবি সাহিত্যিক মিলে ১৯৫৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে 'রওনক' নামে একটি সাহিত্যিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ঘরোয়াভাবেই এই সংগঠন তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে শুরু করে। সংগঠনের সদস্যেদের বাসায় পর্যায়ক্রমে মাসিক আলোচনা চক্র হবে সেখানে একজন সদস্য প্রবন্ধ পাঠ করবেন এবং কয়েকজন সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন বলে ঠিক করা হয়। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহকে সভাপতি, ইবরাহিম খাঁ ও গোলাম মোস্তফা সহসভাপতি এবং আবুল কালাম শামসুদ্দিনকে সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়ে এর প্রথম কর্মসংসদ গঠিত হয়েছিল।[৫৮] কবি গোলাম মোস্তফার বাসায় অনুষ্ঠিত রওনক এর তৃতীয় মাসিক সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব সৈয়দ আলী নুর। কবি গোলাম মোস্তফা 'পাক-বাংলা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে 'পাক-বাংলা' ভাষায় অধিকতর আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দ গ্রহণের ওপর বিশেষ জোর দেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে কবি আজহারুল ইসলাম, কবি আজিজুর রহমান এবং জনাব মতিনউদ্দিন আহমেদ বাংলা সাহিত্যে বেশি আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই 'পাক বাংলা ভাষা'র বিবর্তন সম্ভব হবে বলে মত প্রকাশ করেন। অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন বলেন, 'আমরা যে ভাষায় এখন কথা বলি এবং লিখি তা 'পাক-বাংলা' ভাষা নয়। কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যে অধিকতর আরবি, ফার্সী ও উর্দু শব্দ থাকিলে নতুন একটা ভাষা জন্ম নিবে এবং এই ভাষাই হইবে পাক-বাংলা ভাষা'। জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন বলেন, ভাষার রূপান্তর সময় সাপেক্ষ হইলেও এখানে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে। এই আলোচনায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, অতীতের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রজাল বাংলাভাষা হইতে হিন্দুধারার বাহক সংস্কৃত শব্দগুলি বর্জন করতে হবে। রাষ্ট্রগত আদর্শের ভিত্তিতে ভাষার সংস্কার সময় সাপেক্ষ হলেও লেখকদের প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হবে। এই সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, জনাব আবদুর রহমান, অধ্যক্ষ নাজিরুল ইসলাম, জনাব আশরাফ

উজজামান, জনাব আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, জনাব মোহাম্মদ নাসির আলী, জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান প্রমূখ।[৫৯]

সাহিত্যালোচনার পাশাপাশি 'রওনক'-এর সভায় প্রতিযোগিতা করে ভুরিভোজের আয়োজন চলে। আজাদ পত্রিকা রওনকের খবর সবিস্তারে প্রচার করে।'রওনক' এর ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসের অধিবেশনে আবদুর রশিদ ওয়াসেকপুরী 'পাক-বাংলা ভাষার অভিধান' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন। এই সম্মেলনে 'পাক-বাংলা ভাষার অভিধান' প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্মেলনে খান মুহম্মদ মঈনুদ্দিন 'পাক-বাংলা সাহিত্যে উপমা', আবদুল মান্নান 'সঙ্গীতে মুসলমানদের অবদান' মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ 'আমাদের সংস্কৃতি' ও 'আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলিম অবদান' প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন। 'রওনক' পশ্চিম বঙ্গের কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম পূর্ববাংলায় চর্চার ঘোরবিরোধী ছিলেন। ১৯৫৯ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আলোচকরা মত প্রকাশ করেন যে পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যপুস্তক পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী ভাবধারায় পুষ্ট। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যপুস্তক আমদানীর ওপর বিধি-নিষেধ আরোপের সুপারিশ করেন।[৬০] 'রওনক' এর প্রতিষ্ঠাতারা পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য তাঁরা পাকিস্তানী আদর্শের পরিপন্থী কোন সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড পছন্দ করতেন না।

'রওনক' ঘরোয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, ঘরোয়াভাবেই তাঁদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। দুই বছরের কিছু বেশি সময় ধরে এটির কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল। এঁরা উদার দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডকে একটি ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। সাহিত্যের কোন সীমা, দেশ-কাল বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে না, এই সত্যটি তাঁরা উপেক্ষা করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, সাংগঠনিক কাঠামোর দুর্বলতা এর বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। ২১ জন সদস্য নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই ২১ জনের মধ্যেই সংগঠন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।[৬১] সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুসারে যার বাসভবনে আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হতো তিনিই আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। ধীরে ধীরে আয়োজকদের মধ্যে ভূরিভোজের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই উৎসাহ এক সময় থিতিয়ে পড়ে। দুই রাউন্ড বা আড়াই বছরের মত চলার পর তৃতীয় বছরের মধ্যে এর অস্তিত্ব আর দৃশ্যমান থাকেনি।[৬২] যে কোন সংগঠনে তরুণ সদস্যের অন্তর্ভূক্তি সংগঠনকে গতিশীল করে। কিন্তু এই সংগঠনের উদ্যোক্তারা তরুণদের প্রতি এক ধরণের অবজ্ঞাসূলভ মনোভাব পোষণ করতেন। আর সবচেয়ে বড় কথা পূর্ববাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রগতিশীল ধ্যানধারণা বিস্তার লাভ করছিল। পাকিস্তানপন্থী ধ্যান-ধারণা তরুণদের বিভ্রান্ত করতে পারেনি। মোটকথা, 'রওনক' সাহিত্যাঙ্গনে পাকিস্তানী ভাবধারা বিকাশের

যে লক্ষ ও উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বিপরীতে আরও বেশি করে পূর্ববাংলায় প্রগতিশীল চিন্তার উন্মেষ ঘটে।

৬.৮ পূর্ববাংলায় চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রসার

চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। চলচ্চিত্র গণমানুষের জীবনধারায় গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। ব্রিটিশ শাসনামলে বাঙালি সংস্কৃতির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল কোলকাতা। তথাপি কলকাতার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পূর্ববাংলার কবি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল। ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগ বাংলাভাষী সাহিত্যিকদের মধ্যে বিচ্ছেদ তৈরি করে। একই সাথে ঢাকা কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি সুযোগও সৃষ্টি করে বটে। বাংলা চলচ্চিত্রের বিকাশ ও উন্নয়নে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের অবদানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। ১৮৯৮ সালে ঢাকার ক্রাউন সিনেমা হলে পূর্ববাংলায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হয়। পূর্ববাংলার সন্তান হীরলাল সেন ১৯০৩ সালে সর্বভারতে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ১৯৩১ সালে ঢাকার নবাব পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ববাংলার প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র 'দি লাষ্ট কিচ' নির্মিত হয়। পূর্ববাংলায় প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র আবদুল জব্বারের 'মুখ ও মুখোশ' মুক্তি লাভ করে ১৯৫৬ সালে। পূর্ববাংলার প্রথম নির্বাক ছবি 'দি লাস্ট কিচ' এ যে সকল নারী শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদেরকে পতিতালয় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং একজন ছিলেন পেশাদার বাঈজী। এটি চলচ্চিত্র সম্পর্কে পূর্ববাংলার মানুষের রক্ষণশীলতার চিত্র উপস্থাপন করে।

পূর্ববাংলার নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণকারী জনাব ওবায়েদ-উল-হক কলকাতায় ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে দেশবিভাগের পূর্বে 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' ছবিটি নির্মাণ করেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালের কলকাতা মহাদাঙ্গার ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতির কারণে মুসলিম পরিচালকের ছবি প্রদর্শনীর প্রতি হুমকির কারণে তাঁর নাম 'কিরণ কুমার' পরিচয়ে কলকাতায় ছবিটি প্রদর্শিত হয়।

পূর্ববাংলার প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' নির্মাণ নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল। ভারতীয়, মার্কিনী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী পেশাদার নির্মাতাদের ছবির ভীড়ে এই ছবিটি নির্মাণের দুরহ কাজকে অনেকে একুশোত্তর বাঙালি মুসলমানদের আত্ম প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৬৩] এর পর পূর্ববাংলায় চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ২০০টি ছবি মুক্তি পায় যার মধ্যে বাংলা ছবির সংখ্যা ১৪৬টি এবং উর্দু ছবির সংখ্যা ৫৪টি। তবে বাণিজ্যিক কারণে ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিন বছর বাংলা ছবির চেয়ে উর্দু ছবি বেশিনির্মিত হয়। পাকিস্তান শাসনামলে সবচেয়ে বেশিছবি মুক্তি পায় ১৯৭০ সালে। এ বছর সর্বমোট

৪১টি ছবি মুক্তি পায় যার মধ্যে উর্দু ছবি ছিল মাত্র ৩টি।[৬৪] এখানে উল্লেখযোগ্য দিক হলো স্বাধিকার আন্দোলনের প্রভাবে উর্দু ছবি নির্মাণের ব্যাপারে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যেও মনস্তাত্বিক পরিবর্তন ঘটে। এ বছরই স্বাধিকার, মুক্তি ও গণ আন্দোলনের পেক্ষাপটে নির্মিত বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিটি মুক্তি পায়। এই ছবিতে রূপকভাবে স্বৈরাচার এবং এক নায়কতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' গানটির মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা, ভাষা শহিদদের কবর এবং আল্পনা অঙ্কিত রাজপথের দৃশ্য ছবিটিকে অত্যন্ত আবেদনময়ী করে তোলে। এই ছবিটি সেন্সর বোর্ড আটকে দেয়। এই ছবি প্রদর্শনের দাবিতে রাজপথ শ্লোগানে শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়। এ ছবির প্রদর্শনীর দাবিতে যে মিছিল হয় সেটি ছিল বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দেলনের ভিন্ন একটি রূপ। আন্দোলনের মুখে সরকার সিনেমাটি প্রদর্শনীর অনুমতি দিতে বাধ্য হয়।

পূর্ববাংলায় চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ বাঙালির আত্ম-জাগরণে সহায়তা করেছে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে চলচ্চিত্র শিল্পকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। এমনকি তারা পূর্ববাংলায় নির্মিত উর্দু ছবি প্রদর্শনীতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[৬৫] সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে পূর্ববাংলার চলচ্চিত্র শিল্প এক পর্যায়ে গণমানুষের শিল্পে পরিণত হয়।

পূর্ববাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতির সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক পত্র-পত্রিকার বিকাশ ঘটে। এ ধরনের প্রকাশনা পূর্ববাংলার অধিবাসীদের মনজগতে সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটতে ভূমিকা রাখে। ১৯৫০ এর দশক থেকে চলচ্চিত্র বিষয়ক মাসিক, পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। এ ধরনের প্রথম প্রকাশনা 'মাসিক সিনেমা' বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। এরপর সিনেমা বিষয়ক যেসকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে উদয়ন (১৯৫০-১৯৫৪), ছায়াবনী (১৯৫১), রূপছায়া (১৯৫১-১৯৬১), চিত্রালী (১৯৫৩-), প্রবাহ (১৯৫৬-১৯৫৬), সচিত্র সন্ধানী (১৯৫৬-), রমনা (১৯৫৬), মৃদঙ্গ (১৯৫৬-১৯৫৯), চিত্রাকাশ (১৯৫৯-১৯৭৫), চলন্তিকা (১৯৫৯-১৯৬৯), পরিচয় (১৯৬০), সিনেমা জগত (১৯৬০-১৯৬০), পাক্ষিক বিচিত্র (১৯৬০-১৯৬১), নকশা (১৯৬১), সাজঘর (১৯৬২), পূর্বাণী (১৯৬৫), শ্রাবন্ত্রী (১৯৬৫), রূপম (১৯৬৬), ঝিনুক (১৯৬৬-), মালঞ্চ (১৯৬৬), দোলনা (১৯৬৬), লিপিকা (১৯৬৭), সাতরং (১৯৬৭০), জোনাকী (১৯৬৯), আবর্ত (১৯৭০), অন্তরঙ্গ (১৯৬৭), সমীপেষু (১৯৭০-১৯৭০), চিত্রিতা (১৯৭০-১৯৭১), শিল্পকলা (১৯৭০-১৯৭৩) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব পত্রিকার মধ্যে অনেকগুলোই ঢাকার বাহির থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কোন কোন পত্রিকা কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। এসকল পত্র-পত্রিকা বাংলা ভাষা ও স্বাধীকার আন্দোলনেও ভূমিকা রেখেছে। চিত্রালী ১৯৬২ সালে ১৭ মে'র সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তান আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলায় অনুষ্ঠান প্রচারিত না হওয়ার প্রতিবাদে একটি খবর প্রকাশ করে। রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন উপলক্ষে পাকিস্তান সরকারের কঠোর

মনোভাব সত্ত্বেও চিত্রালী পত্রিকায় ১৯৬৩ সালের ১৭ মে সংখ্যায় রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী পালনের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, চিত্রালী ১৯৬৬ সালের ৩ মে সংখ্যায় বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার না করায় এর প্রতিবাদ করে খবর ছাপা হয়।[৬৬] চিত্রালীর অন্য একটি সংখ্যায় বাংলা ভাষা ও চলচ্চিত্রের অবমাননার প্রতিবাদ জানিয়ে লেখা একজন পাঠকের মতামত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়।[৬৭] এভাবে চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্র-পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনগুলো বিনোদনমূল লেখা প্রকাশের পাশাপাশি বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণে কাজ করে গেছে।

পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা পূর্ববাংলার চলচ্চিত্রের উন্নয়নে একটি মাইলফলক। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের চলচ্চিত্র শিল্প উন্নয়নে এক কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেন। পূর্ববাংলায় চলচ্চিত্র বিষয়ক কোন সংস্থা না থাকায় পূর্ববাংলা এ ধরণের বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হয়। বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নজরে এলে ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাদেশিক আইন পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন। পরিষদের অধিবেশন শেষ দিন তিনি বিলটি উত্থাপন করেন। এমতাবস্থায় সামান্য কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে বিলটি গৃহিত হয়।[৬৮] পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা পূর্ববাংলার চলচ্চিত্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করেছে।

পূর্ববাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে ষাটের দশকে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালে ঢাকায় একটি ফিল্ম ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। '১৯৬৩ সালে স্টুডেন্টস্ ফিল্ম ফেডারেশন' এবং 'পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ প্রতিষ্ঠার পেছনের কারিগর ছিলেন মুহম্মদ খসরু যিনি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঢাকা সিনে ক্লাব'। পূর্ববাংলায় চলচ্চিত্র শিল্পকে জনপ্রিয় করা, সুষ্ঠধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ উৎসাহিত করা এবং পাকিস্তানী সেন্সর বোর্ডের বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করার জন্য এসকল সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পূর্ববাংলার চলচ্চিত্র শিল্প একদিকে পরিবেশনা শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রেখেছে, অন্যদিকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জাতীয় জাগরণে অংশ গ্রহণ করেছে। চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলা-কুশলীরা জাতীয় দুর্যোগেও ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৭০ সালে দক্ষিণাঞ্চলে ঘুর্ণিঝড়ের আঘাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানী ঘটলেও পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে কোন সহয়তা পাওয়া যায়নি। চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীরা ঘুর্ণিদুর্গত মানুষের স্মরণে 'কাঁদো দেশবাসী কাঁদো' শীর্ষক ব্যানার বহন করে একটি শোকযাত্রা বের করেছিল।[৬৯] বিনোদন জগতের শিল্পী ও কলাকুশলীদের এই কর্মসূচি জাতীয় চেতনা নির্মাণে প্রভাব রেখেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা তৎকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের ওপর বিনোদন জগতের বাসিন্দাদের প্রভাব ছিল আরও গভীর।

চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। সাধারণ মানুষের ওপর এর প্রভাব হয় তাৎক্ষণিক ও ব্যাপক একই সাথে এটি মানুষের মনে নিয়ত ক্রিয়াশীল একটি চেতনার জন্ম দেয়। পূর্ববাংলার চলচ্চিত্র এদেশের মানুষকে একদিকে যেমন বিনোদন প্রদান করেছে, অন্যদিকে অধিবাসীদের মানস গঠনে ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। সংখ্যার বিচারে ১৯৭১ সালের পূর্বে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচিত্রের সংখ্যা হয়তো উল্লেখযোগ্য নাও হতে পারে। কিন্তু এই শিল্প পরোক্ষভাবে পশ্চাৎপদ একটি জনগোষ্ঠীর মানস কাঠামো গঠনে প্রভাব রেখেছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এছাড়া পাকিস্তানী রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জহির রায়হানের 'আলোর মিছিল' চলচ্চিত্রটি পূর্ববাংলার মানুষকে স্বৈরাচার বিরোধী মনোভাব গঠনে সহায়তা করেছিল। এছাড়া চলচ্চিত্র আন্দোলন, চলচ্চিত্র বিষয় ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকাও সংস্কৃতিমনা সচেতন সমাজ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল। রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার কারণে পঞ্চাশের দশকের শুরুতে একজন নারী চলচিত্র কর্মী পাওয়া যেত না সেখানে মাত্র দুই দশকের মাথায় নারী-পুরুষ একসাথে চলচিত্রে কাজ করছে তা-ই না, অন্যান্য বিনোদন মাধ্যম, সংস্কৃতি সাধনা, রাজপথের আন্দোলনসহ সমস্ত ক্ষেত্রে সরব উপস্থিতি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও বেগবান করে। আর এক্ষেত্রে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

৬.৯ নাট্যাঙ্গনে জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির ধারা

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর হিন্দুবিদ্বেষী নীতির কারণে বিপুল সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কিছুটা শূন্যতার সৃষ্টি করে। নাট্যাঙ্গনে এর প্রভাব পড়েছিল। অন্যদিকে এর ফলে মুসলিম নাট্যকারদের জন্য এটি সুযোগও সৃষ্টি হয়েছিল। এসময় সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্য শাখার ন্যায় নাট্যাঙ্গনেও দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো ইতিহাস নির্ভর ইসলামী ধারা, অন্যটি প্রগতিবাদী ধারা। প্রগতিশীল নাট্যকারগণ তাঁদের নাটকে রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনকে উপজীব্য করে এ অঞ্চলের কৃষক, শ্রমিক, মুটে, মজুর ও সাধারণ মানুষের সংগ্রামী জীবনকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বাঙালির জাতীয় চেতনার স্ফুরণ ঘটাতে এসকল নাটক এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মানসপটে গভীর প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ যা পরবর্তী সকল রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ভিত্তি নির্মাণ করে। ভাষা আন্দোলন একদিকে এদেশের মানুষকে আন্দোলিত করে তেমনি একে উপজীব্য করে রচিত হতে থাকে অনেক প্রতিবাদী সাহিত্যকর্ম যা অধিবাসীদের রাজনৈতিক মানস কাঠামো নির্মাণে সহয়তা করে। নাট্যকারগণ এগিয়ে আসেন ভাষা আন্দোলন ও পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিতে নাটক নির্মাণে। মুনীর চৌধুরীর 'নষ্ট ছেলে' (১৯৫০) , 'কবর' (১৯৫৩), আসকার ইবনে শাইখের 'দুর্যোগ' (১৯৫১) এ ধারার কয়েকটি

উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকটিকে বলা হয় এদেশের নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিবাদী চেতনার প্রথম সার্থক রূপায়ণ।[৭০] পাকিস্তান সরকারের ভাষা ষড়যন্ত্র এদেশের ছাত্রসমাজ ও সচেতন মহলে প্রতিবাদী চেতনার বিকাশ ঘটায়। ভাষাকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন যখন দানা বাঁধছে সেই প্রেক্ষাপটে ১৯৫১ সালে আসকার ইবনে শাইখ 'দুর্যোগ' নাটকের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বের দুটি ভিন্ন চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এ নাটকে একদিকে আখতার নামক একটি চরিত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আমলাতন্ত্রের তাবেদারীর চিত্র নির্মাণ করছেন। অন্যদিকে আমজাদ নামক আরেকটি চরিত্র ভাষা আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান হারে যুক্ত হওয়া প্রতিবাদী তরুণ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন।[৭১] ভাষা আন্দোলনের পেক্ষাপটে মুনীর চৌধুরী কবর নাটক ১৯৫৩ সালে রচনা করেন যা ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। সরকার কর্তৃক বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে লাশ সরিয়ে ফেলা এবং রাতের অন্ধকারে গোপনে কবর দেওয়ার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই নাটকের মাধ্যমে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর তল্পীবাহক ও সুবিধাভোগী মুসলিম লীগ নেতাদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে একজন রাজনীতিকের চরিত্র চিত্রায়ণের মাধ্যমে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বশংবদ অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে জনতার রুদ্র রোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আসকার ইবনে শাইখের 'দুরন্ত ঢেউ' নাটকে। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত স্বাধীকার আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন ছিল মূল প্রেরণা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যাঙ্গণেও একই কথা প্রযোজ্য। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭০ সালের ৬-দফা ও ৬৯-এর গণ আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। নাটক ও অন্যন্য প্রতিবাদী সাহিত্য এক্ষেত্রে মানুষের মনস্তত্ত্ব নির্মাণে ভূমিকা রেখেছিল।

পঞ্চাশের দশক জুড়ে ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক সাহিত্য কর্মের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ষাটের দশকেও রাজনৈতিক সংগ্রামী চেতনাভিত্তিক নাটক নির্মাণ নাট্যকাররা এগিয়ে এলেন। আসকার ইবনে সাইখের 'অনেক তাঁরার হাতছানি' নাটটি ১৮৫৭ সালে ঢাকায় সংঘটিত সিপাহী বিপ্লবের ঘটনা থেকে ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনকে একই সূত্রে গ্রোথিত করেছে। পূর্ব পুরুষের সংগ্রামী চেতনার পথ ধরে ১৯৬২ সালের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া এবং শহীদ হওয়ার মধ্য দিয়ে বাঙালির সংগ্রামী চেতনার সার্থক রূপায়ন করা হয়েছে এর মাধ্যমে। প্রচলিত ধারার ইতিহাস নির্ভর নাটকের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার নাটক মানুষের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার বিকাশ ঘটায়। এই চেতনা মানুষকে মুক্তি ও স্বাধিকার আন্দোলনে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে অনুপ্রাণিত করেছে।

৬.১০ গণসঙ্গীত ও কবিতায় জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম

ব্রিটিশ শাসনের শেষপাদে ভারতবর্ষে গণসঙ্গীত জাতীয়তাবাদী চেতনা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। পাকিস্তান শাসনামলে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে পূর্ববাংলার অনেক গীতিকার এ ধরনের

গণসংঙ্গীত রচনায় এগিয়ে এলেন। এ ধারার সঙ্গীতের মূল সুর ছিল অন্যায়ের প্রতিবাদ, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের প্রচেষ্টা, দেশপ্রেমের উজ্জীবন, সামাজিক চেতনা নির্মাণ, গণচেতনা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটানো। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানী শাসনামল জুড়ে গণসঙ্গীত বাঙালির প্রতিবাদী মানস গঠনে প্রেরণাদায়ী ভূমিকা পালন করে। পূর্ববাংলায় বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হলে গণসঙ্গীদের মাধ্যমে এর প্রতিবাদ ও সাম্প্রদায়িক সম্মিলনের প্রচেষ্টায় অনেকে এগিয়ে এসেছিলেন। তবে গানে ও কবিতায় বাঙালি জাতীয় চেতনার স্ফুরণ ঘটে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ভাষার চেতনা সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেয়। এ ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত জিন্নাহর ঘোষণা এদেশের মানুষকে প্রতিবাদী করে তোলে। প্রতিবাদের প্রকাশ ছিল নানাভাবে। একদিকে রাজপথে ছাত্রদের আন্দোলন চলে অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তি সংগ্রামও শুরু হয়ে যায়। জানা যায় সেই রাতেই আনিসুল হক চৌধুরী একটি প্রতিবাদী গান লিখে শেখ লুৎফর রহমানকে সুর করতে দেন। গানের ভাষা ছিল শ্লেষাত্মক,

ওরে ভাইরে ভাই
বাংলাদেশে বাঙালি আর নাই।
যারা ভীড় করে এই পথে ঘাটে
বাঙাল যাদের বল,
এদের স্বদেশে নিজেদের দশা
করে টলমল।।
বাঙালি তো হিন্দুরা
বাংলা ভাষা তাগোর
হুজুর যা কয়, ঠিক কথা,
আলবৎ হইবো জরুর,
বলে বাঙালি খান পাঠান ওরা
মীর জাফরের চাঁই।।
আজব কথা-
গাঁজার নৌকা পাহাড় দিয়া যায়,
জলে ভাসে শিলা,
কিবা বানরে গীত গায়;
ওরা ধানের গাছে খেজুর খোঁজে
লাজে মরে যাই।।...

শোনেন হুজুর-
বাঘের জাত এই বাঙালেরা
জান দিতে ডরায় না তারা,
তাদের দাবি বাংলা ভাষা
আদায় করে নেবেই।।[৭২]

ধর্মের ধ্বজাধারী রাজনীতিকরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে হিন্দুদের ভাষা সংস্কৃতি বলে যে অপব্যাখ্য দেওয়ার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল সে বিষয়টি এখানে উঠে এসেছে। পাশাপাশি বাঙালি যে অন্যায়ের কাছে পরাভব মানে না সে বার্তাটিও শক্তভাবে দেওয়া হয়েছে এখানে। জান দেবে তবু মান দেবে না এটিই বাঙালি চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। একইভাবে আমরা লক্ষ করেছি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে তাৎক্ষণিকভাবে বহু গান, কবিতা রচিত হয়েছে। একুশকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের একটি নিজস্ব ধারাই সৃষ্টি হয়েছে। একুশে হত্যার প্রতিবাদ মিছিল ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। ছাত্ররা নেমে পড়ে রাজপথে। রাজনীতিকরা সোচ্চার হন গণপরিষদে। কৃষক-শ্রমিক, মুটে-মজুর প্রতিবাদ করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে। লেখক-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদী কলম হয় শাণিত। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা সর্বস্তরের মানুষের চেতনাকে আঘাত করে। প্রতিজ্ঞায় অবিচল কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী রোগশয্যায় থেকেও তাৎক্ষণিকভাবে একুশের প্রথম কবিতা 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসিরদাবি নিয়ে এসেছি' কবিতাটি লিখেছিলেন। রাতেই কবিতাটি গোয়ান্দা সংস্থার সতর্ক পাহারা এড়িয়ে ছাপা হয় যা পরের দিন চট্টগ্রামের প্রতিবাদ সভায় পঠিত হয়। দীর্ঘ কবিতাটিতে বাঙালির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের বর্ণনা প্রদানপূর্বক এর প্রতি পাকিস্তানী বিদ্বেষের প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে। এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে শোকে বিহ্বল এবং ক্রোধে উন্মত্ত না হয়ে দেশ প্রেমের প্রতিজ্ঞায় অবিচল থেকে খুনিদের বিচারের দাবি জানানো হয়েছে। এই বিচারের দাবি খুনী সরকারের কাছে জানানো হয়নি। বরং এই রক্তরেখা জনতার হৃদয়ে যে বহ্নিশিখার প্রজ্বলন ঘটাবে সেখানে ভেসে আসবে স্বাধীনতার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। সেই আগামীর জনতার কাছে কবি জালিমের ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছেন।[৭৩] এই কবিতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার এক অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' কবিতাটি লেখেন। প্রথমে আবদুল লতিফ এবং পরে আলতাফ মাহমুদ সুর দিয়ে এটিকে গানে রূপান্তর করেন। ১৯৫৩ সালে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে ঢাকা কলেজের অনুষ্ঠানে গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল।[৭৪] পরবর্তীকালে সারাদেশে প্রভাত ফেরীতে গানটি গাওয়া হতে থাকে। প্রভাত ফেরীর এই গানটি পাকিস্তানীদের অস্থিমজ্জায় আঘাত করে এবং বাঙালিকে একাত্ম করে তোলে। একুশে ফেব্রুয়ারীর পটভূমিতে আরও বহু গান ও কবিতা রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ভাষা সৈনিক গাজিউল হকের 'ভুলবো না ভুলবো না' প্রকৌশলী মোশাররফ হোসেনের 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে' আবদুল লতিফের 'ওরা আমার মুখের কথা

কাইড়া নিতে চায়' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আবদুল লতিফ ও আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী একুশের প্রেক্ষাপটে আরও অনেক গান রচনা করেন।[৭৫] এসব গান ও কবিতা কালজয়ী সাহিত্য কর্ম হিসেবে সংগ্রামী জনতাকে সর্বদা পথ দেখিয়েছে।

একুশের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। একুশের চেতনার প্রতিফলন ঘটে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে। পরবর্তী সকল রাজনৈতিক অন্যায়ের প্রতিবাদের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে একুশের সাংস্কৃতিক চেতনা। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনক কেন্দ্র করে অনেক গান রচিত হয়েছিল। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের সময় অনেক গান রচিত হয়। ১৯৬৪ সালে 'মৌলিক গণতন্ত্র' আইনের ধারায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলে 'সমকাল' সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর 'জনতার সংগ্রাম চলবেই' কবিতাটি লিখে ইত্তেফাক পত্রিকায় ছাপান। কামাল লোহানীর অনুরোধে শেখ লুৎফর রহমান তাতে সুর আরোপ করেন। গানটি রাজপথে জনজোয়ার এনেছিল।[৭৬] এই গানের কথা এত বেশী উদ্দীপনাময় ছিল যে এই গানটি সৃষ্টির পরবর্তী যে কোন প্রতিবাদী আন্দোলনে রাজপথ প্রকম্পিত করে তোলে। গানটির প্রাসঙ্গিকতা কখনো ফুরোবার নয়। ছয় দফার প্রেক্ষাপটে সুখেন্দু চক্রবর্তীর লেখা 'ডিম পাড়ে হাসে, খায় বাগ ডাসে/ শুনছনি ভাই শুনছনি' গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।[৭৭] এই গানগুলি ব্যাঙ্গাত্মক সুরে রচিত। গণ-আন্দোলনে ছাত্রদের ত্যাগের বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে লিল্পী আবদুল লতিফের ১৯৬৮ সালে রচিত একটি গানে।[৭৮] আসলে আগরতলা মামলায় বিচার কাজ চলাকালে রাজনৈতিক অঙ্গনে ভীতির সঞ্চার হয়। এসময়ে ছাত্ররাই রাজপথের আন্দোলনকে জাগরূক রেখেছিলেন। গণ-সঙ্গীত ছাত্রদের অনুপ্রেরণা যোগায়। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে যে গানগুলো সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল তা হলো কবি আবু বকর সিদ্দিকের লেখা এবং শেখ লুৎফর রহমানের সুরে 'বিপ্লবের রক্ত রাঙা ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে', 'পায়রার পাখনা বারুদের বহ্নিতে জ্বলছে...পতাকার পদাতিক পথ কেটে কেটে চলছে' অথবা সাধন সরকারের সুরে 'বাংলার ঘরে ঘরে সংগ্রামী জান কি' ইত্যাদি।[৭৯] গণসঙ্গীত শিল্পী নিজামুল হক শহীদ শামসুজ্জোহা ও আসাদকে নিয়ে লিখেছিলেন-

আসাদ জোহা আর যত শহীদের
রক্তে নিশান দেখেছি
তাইতো মোরা সব কিছু ভুলে
এক মিছিলে মিলেছি।
যত শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না
না না দেব না।
আজ সংগ্রাম শুধু সংগ্রাম

আজ বিপ্লব শুধু বিপ্লব
হাতে মোদের দীপ্ত মশাল
মোরা বজ্র শপথে চলেছি।।[৮০]

গণসঙ্গীত একদিকে সংগ্রামী জনতাকে উদ্দীপ্ত করে অন্যদিকে গণসঙ্গীতকে উপজীব্য করে অনেক শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত। এসব সংগঠন রাজপথের আন্দোলনকে সংগঠিত করে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন গণসঙ্গীত সংস্থার মধ্যে ১৯৫০ সালে গড়ে ওঠে 'প্রান্তিক শিল্পী গোষ্ঠী' অন্যতম।[৮১] এটি একটি আঞ্চলিক সংস্থা। এটি চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন শওকত ওসমান। ১৯৫২ সালে পুরোনো ঢাকার কিছু সংখ্যক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মিলে গড়ে তুলেন 'অগ্রণী শিল্পী সংঘ'।[৮২] ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী। সত্যেন সেন ১৯৬৮ সালে গণসঙ্গীত আন্দোলনের জন্য মানুষের মধ্যে গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে উদীচী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন।[৮৩] এছাড়াও সারা দেশেই বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত ধারার প্রেম-বিরহ, এবং প্রকৃতি নির্ভর গানের পাশাপাশি জীবনমুখী গণসঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষকে জাগ্রত করা। এসকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান গণ-সঙ্গীতকে গণ-আন্দোলনের একটি মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। মানব মনে সঙ্গীতের প্রভাব গভীরতর। গণ-সঙ্গীত পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গণ-আন্দোলনে একাত্ম করেছিল। এ সকল গানের আবেদন এমনি যে মানুষকে রাজপথে নিয়ে এসেছিল নতুবা আন্দোলনকারীদের চেতনার সাথে একই সূত্রে বেঁধে ফেলেছিল।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববাংলা শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছুটা পশ্চাৎপদ অবস্থানে ছিল। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির জাগরণ ঘটে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ দুটি কাজ সফলভাবে করেছে। প্রথমত: তাঁরা শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতির মাধ্যমে বাঙালির আত্ম পরিচয়ের সন্ধান দেন। দ্বিতীয়ত: অন্যায়ের প্রতিবাদে সময়োপযোগী আন্দোলন গড়ে তোলে এবং সেখানে সাধারণ মানুষকে সংযুক্ত করতে প্রেরণা যোগায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যেহেতু গ্রামের কৃষকের সন্তান কাজেই তাঁদের মাধ্যমে যে কোন আন্দোলন গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত। অন্তত পক্ষে গ্রামের মানুষের কাছে তাঁরা বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করত। ফলে গ্রামীণ জনমত তাঁদের পক্ষে থাকত। তৎকালীন সময়ে যোগাযোগ মাধ্যম অত বেশী বিস্তৃত ছিল না। সন্তানদের সাথে বাবা মায়ের পত্র যোগাযোগ শহরের ঘটনাবলী জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষা প্রসারে কাজ করেছে তা-ই নয় এই প্রতিষ্ঠানটি এই অঞ্চলের মানুষের মধে স্বাতন্ত্র্য চেতনা

নির্মাণের বাতিঘর হিসেবে কাজ করে। একে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক বলয় পূর্ববাংলার মানুষের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন উদারনৈতিক মানস কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মধ্য দিয়ে গঠিত বুদ্ধিদীপ্ত নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জোট ক্রমান্বয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও পুঁজিগঠনে প্রেরণা পায়। পাকিস্তানী দমন-পীড়ন তাঁদেরকে আরও বেশী প্রতিবাদী করে তোলে। অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এঁদেরকে ধর্মান্ধতা থেকে বিরত রাখে। এর ফলে মুসলিম প্রধান অঞ্চল হওয়া সত্ত্বে এখানকার জনসাধারণ তথাকথিত 'ইসলামী ভাবধারার' পক্ষে সাঁয় দেয়নি। 'পাক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি' নির্মাণের প্রচেষ্টা রুখে দেয় একুশের আন্দোলনের মাধ্যমে। এর পথ বেয়ে ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা দুটো নৈতিক বিজয় এনে দিয়েছিল। প্রথমত, যে ভাষাকে ধ্বংসের মাধ্যমে পূর্ববাংলায় পাক-ঔপনিবেশিক শাসন পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল, সেই ভাষা বিকশিত হওয়ার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল। পূর্বে ভাষা গবেষণার এধরনের প্রতিষ্ঠান ছিলই না। দ্বিতীয়ত, যেখানে বসে পাকিস্তান সরকারের দুজন প্রধানমন্ত্রী বাঙালি বিরোধী বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেছিল এবং ভাষা আন্দোলন নস্যাৎ করার আদেশ জারি করেছিল সেই বর্ধমান হাউজকে 'বাংলা একাডেমি' হিসেবে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সরকারের নৈতিক পরাজয় হয়েছিল। বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এটি একটি প্রাথমিক বিজয় যা পরবর্তী আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। পূর্ববাংলার পরবর্তী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এই মৌলিক চেতনার ভিত্তিতেই সংঘটিত হয়েছিল। বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের যে সর্বাত্মক রূপ তা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভেতর থেকেই উৎসারিত। এদেশের মানুষের হাজার বছরের বহমান একটি স্বাতন্ত্র্য সাংস্কৃতিক জীবনের উত্তরাধিকার। অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড হয়ত একটি নিয়মতান্ত্রিক বিষয় ছিল। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকদের বাঁধার মুখে এ থেকেই এঁরা আত্ম-পরিচয়ের সন্ধান লাভ করে। আর এই পরিচয়ের সূত্রেই তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক গতিপথ নির্ধারণ করার সুযোগ পায়। কাজেই পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম যুগপৎভাবেই সংঘটিত হয়েছে সে কথা বললে অত্যুক্তি হবে না মোটেই।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ বাংলার মুসলিম ও হিন্দু দলিত সম্প্রদায়ের নিয়তি একই বিবেচনায় মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন দলিত সম্প্রদায়ের নেতা যোগেন মণ্ডল। তিনি বাংলায় ১৯৪৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। দেশভাগের পর পাকিস্তানের মন্ত্রীসভারও একজন সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান রাষ্টে ধীরে ধীরে তাঁর স্বপ্ন বিবর্ণ হতে থাকে। অবশেষে তিনি ১৯৫০ সালের ৮ অক্টোবর পাকিস্তানের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের প্রেক্ষাপট হিসেবে যে দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন সেখানে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের একই অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে বলেন "বাঙালি মুসলমানদের সাথে নমশূদ্রদের অর্থনৈতিক স্বার্থের মিল রয়েছে। মুসলমানরা ছিল মূলত কৃষক-শ্রমিক, অস্পৃশ্যরাও তাই। মুসলমানদের একটি অংশের মত নমশূদ্রদের একটি অংশও ছিল জেলে। তারা উভয়ই লেখাপড়ার দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী। আমাকে বোঝানো হয়েছিল, লীগ এবং এর

মন্ত্রীসভার সাথে আমার সহযোগিতা বিশাল পরিসরে আইনগত এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে। এই পদক্ষেপসমূহ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধাকে আমলে না নিয়ে বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠীর পারস্পারিক উন্নতিতে ভূমিকা রাখবে এবং সাম্প্রদায়িক শান্তি-সৌহার্দ্য আরও মজবুত হবে, এমটিই বলা হয়েছিল।" আলতাফ পারভেজ, *যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৯০-৯১

২ The Dacca University Brochure, *A review of changes and developments during the decade 1958-68*, published-1968, p. 7

৩ ঐ, পৃ. ১৩-১৪

৪ সরদার ফজলুল করিম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজঃ অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক-এর আলাপচারিতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩

৫ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *স্মৃতিকথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯২, পৃ. ৫২

৬ রংগলাল সেন, বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৪

৭ Calcutta University Commission, 1917-19, Report, Vol-IV, Part-II, Recommendation of the Commission, Chapters XXX-XXXIX, Superintendent Gogernment Printing, Calcutta, P. 225-226

৮ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *পূর্বোক্ত*, ২০

৯ The Dacca University Brochure *a review of changes and developments during the decade 1958-68*, published-1968, p. 12-13

১০ সরদার ফজলুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৩

১১ খান সারওয়ার মুরশিদ, কালের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৫-৩৬

১২ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্রঃ* প্রথম খণ্ড, (১৯০৫-১৯৫৮), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২ পৃ. ৩৭৪

১৩ ঐ. পৃ. ৪৪৮

১৪ অধ্যাপক শাহেদ আলী, "বাংলা ভাষার উন্নয়ন" আজাদ, ১৯ আগস্ট, ১৯৬৭

১৫ বশীর আল হেলাল, *বাংলা একাডেমির ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮, পৃ. ৩৮-৩৯

১৬ আসকার ইবনে শাইখ, *নব জীবনের গান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ. ১১-১২

১৭ খান সারওয়ার মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৭

১৮ নজরুল একাডেমির গঠনতন্ত্র (রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ১৯৪৭-১৯৭১*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৫৭)

১৯ সন্‌জীদা খাতুন, "বাঙালির সাংস্কৃতিক মুক্তিসংগ্রাম আর সংস্কৃতি সাধনা" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্বিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ১০৮

২০ খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজঃ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাগেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১১৫

২১ ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই মাহবুব জামাল জাহেদী ইত্তেহাদ পত্রিকায় বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সাপেক্ষে তথ্যবহুল ও দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা সমস্যা শীর্ষক একটি যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন। মাসিক মোহাম্মদীতে পূর্ব

'পাকিস্তানের জবান' শিরোনামে লেখেন আবুল মনসুর আহমদ। ১৯৪৭ সালে কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে এক আলোচনা সভায় ভারত পাকিস্তান উভয় দেশেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। দ্রষ্টব্য- ইত্তেহাদ, ২০ জুলাই ১৯৪৭, দৈনিক আজাদ, ২৯ জুলাই ১৯৪৭, মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৫০, ঢাকা প্রকাশ, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

২২ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, (১৯০৫-১৯৫৮)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৪৯

২৩ রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০

২৪ সন্‌জিদা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

২৫ আনিসুজ্জামান, "খান সারওয়ার মুরশিদ ও তাঁর মূল্যবোধ', মিসেস নূরজাহান মুরশিদ ও প্রফেসর খান সরওয়ার মুর্শিদ ট্রাস্ট ফান্ড বক্তৃতা ২০১৮, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২

২৬ এই বনভোজন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন, জনাব মোখলেসুর রহমান, শামসুন্নাহার রহমান, আহমেদুর রহমান, মীজানুর রহমান, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, কবি সুফিয়া কামাল, সাইদুল হাসান, ফরিদা হাসানসহ আরও অনেকে। এসকল ব্যক্তিবর্গ সেখানে বসেই একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করেন। দ্রষ্টব্য- রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩০

২৭ সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৮৪

২৮ দৈনিক আজাদ, ৩০ জুন, ১৯৬২

২৯ Pakistan International Airlines corporation যে সার্কুলার জারি করে তাতে বলা হয়, 'All comanders are hereby informed that in future whenever a commander make an announcement to passengers; he is to make the announcement in both English and Urdu. দ্রষ্টব্য- দৈনিক আজাদ, ২৭ নভেম্বর ১৯৬৩

৩০ দৈনিক আজাদ, ২৫ মে, ১৯৬৮

৩১ দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

৩২ দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

৩৩ দৈনিক আজাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

৩৪ সন্‌জীদা খাতুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫

৩৫ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ১লা বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে বৈশাখ মাস জুড়ে আরও ২৫টি প্রবন্ধ ও আর অনেক চিঠি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর জন্মজয়ন্তী পালনের সমালোচনা করে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য- সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪

৩৬ রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর আগের দিন ঢাকা জেলা কাউন্সিল হলে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন ফজলুল হক শেলবর্ষী, কবি খান মাইনুদ্দিন, দেওয়ান আবদুল হামিদ, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, গোলাম আজম, মাওলানা মহিউদ্দিন, হাফেজ হাবিবুর রহমান প্রমুখ। বক্তরা তাঁদের বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথকে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর সাধক ও প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের অনুসারী বলে অভিভূত করেন। পাকিস্তানে ইসলাম ভিত্তিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে ও অখণ্ড ভারত ও রামরাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে চালু করার জন্য এক শ্রেণীর তথাকথিত সংস্কৃতিসেবী প্রদেশব্যাপী যে সাংস্কৃতিক অপচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে তার তীব্র নিন্দা করা হয়। দ্রষ্টব্য- দৈনিক আজাদ, ৮ মে, ১৯৬১

৩৭ খান সারওয়ার মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৩৮ দৈনিক আজাদ, ৮ মে, ১৯৬১

৩৯ খান সারওয়ার মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১৭, ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম: সাংস্কৃতিক ধারা, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৬২

৪০ গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ২১৮

৪১ খান সারওয়ার মুরশিদ, *কালের কথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১১৩

৪২ পাকিস্তান অবজারভার, ২৩ জুন, ১৯৬৭, গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ২৩৬

৪৩ সাইম রানা, বাংলাদেশের গণসংগীত: বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০৯, পৃ. ১২৬

৪৪ এই বিবৃতিতে সাক্ষর করেন, মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, কাজী মোতাহার হেসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, শিল্পী জয়নুল আবেদীন, এম এ বারী (গভর্নর এম এ মালিকের সহোদর), মুহাম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, খান সারওয়ার মুরশিদ, সিকান্দর আবু জাফর, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আহমদ শরীফ, নীলিমা ইব্রাহিম, শামসুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমূখ, আজাদ, ২৮ জুন, ১৯৬৭, গোলাম মুর্শিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৭

৪৫ উর্দু কবি ও সাহিত্যিক নওশাদ নূর, আদিব সোহিল, সরওয়ার হোসেন, শায়ের সিদ্দিক, নিয়ার নৌপরভী, জয়েন উদ্দীন আহমদ, আবু সায়ীদ, শাহুদুল হক এবং আহমেদ ইলিয়াস এক বিবৃতিতে বলেন, "We, the Urdu poets and writers, are deeply aggrived and shoked by the recent statement of Khawja shahabuddin to the effect that Tagore's songs are against Pakistan's cultural values and hence should not be broadcast in future. We are of the considered oppinion that without Tagore the continuence of Bengali cultural and literary heritage is reduced to a hazy shadow. We, therefore, appeal to the Government to reseind the decission banning Tagore's songs from the broadcasting programme in larger interest of the country" দ্রষ্টব্য- Pakistan observer, 30 June, 1967, গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪২

৪৬ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

৪৭ সাঈদ-উর-রহমান, *বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১২-১৩

৪৮ Secret Documents of Intelligence Brance on Father of The Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Vol-2 1951-1952, Hakkani Publishers, Dhaka, 2019, P. 141-41

৪৯ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ২৫৭, সন্‌জিদা খাতুন, "বাঙালির সাংস্কৃতিক মুক্তিসংগ্রাম আর সংস্কৃতিসাধনা", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্বিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ১০৩

৫০ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, *জীবনের ঘাটে ঘাটে*, আহসানিয়া বুকস্ ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৭৩

৫১ আবুল কালাম শামসুদ্দিন, *অতীত দিনের স্মৃতি দিনের স্মৃতি*, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ২৫০-২৫১

৫২ সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

৫৩ আয়োজক কমিটির আহবায়ক আবদুর রহমান তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন, 'যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শিল্প ও সঙ্গীত, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনে ইতিপূর্বে যে ইসলামিক আদর্শ

রূপায়নের প্রস্তুতি চলেছিল তা বাধাগ্রস্ত হল। তথাকথিত স্বাধীন চিন্তানায়কদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার ছদ্ম আবরণে বৃহত্তর বাংলার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক একত্রীকরণের অভিশপ্ত প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে ক্রমশঃ পাকিস্তানী আদর্শকে ম্লান ও দুর্বল করতে লাগল। ঢাকা, কুমিল্লা ও কাগমারীতে পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে চিন্তার ও কর্মের সমুদয় ক্ষেত্র কবরস্থ করার আয়োজন প্রায়সম্পূর্ণ করে আনা হয়েছিল। এর প্রতিবাদে আমরা জনকয়েক মিলে স্থানীয় কর্মীদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের জন্মভূমি ইসলামাবাদে বা চাটগাঁয়ে পাকিস্তানী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত দেশ হিতৈষীদের কি করা কর্তব্য, সে সম্বন্ধে উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ খৃস্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনদিনব্যাপী এক সাহিত্য মহফিলের আয়োজন করি'।... পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী লেখক-লেখিকা, কলা-শিল্পী, ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এতে যোগদান করেন। দ্রষ্টব্য- আবদুর রহমান, *যতটুকু মনে পড়ে*, চট্টগ্রাম ১৯৭২, পৃ. ৪৮২

৫৪ দৈনিক আজাদ, ৫ মে, ১৯৫৮, সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬

৫৫ Dr. Hasan Zaman, *Current News*, Journal of Contemporary Events & Ideas, Burea of National Reconstruction, Gov. of East Pakistan, Dacca, 1770, পৃ. ৭৬

৫৬ লর্ড মেকলে লর্ড বেন্টিঙ্ক-এর পরিষদের আইন বিষয়ক সদস্য ছিলেন। বেন্টিঙ্ক তাঁকে 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কমিটি'র প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করেন। মেকলে তাঁর শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক বিখ্যাত মিনিট-এ মূল কথা যেটি বলেন তা হলো- 'We must , at present, do our best to form a class of persons Indian blood and colour, but English in tasre, in opinions in morals and intellect.' see- Suresh Chandra Ghosh, The History of Education in Modern India 1757-2012, Orient Blackswan Private Limited, Delhi, 2016, পৃ. ৩২

৫৭ দৈনিক আজাদ, ৯ এপ্রিল, ১৯৫৬

৫৮ আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর স্মৃতি কথায় এর প্রতিষ্ঠার সময়কাল 'সম্ভবত ১৯৫৯ সালের প্রথমভাগে' বলেছেন সেটা সঠিক নয়, কেননা রওনকের তৃতীয় মাসিক সভার খবর আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩ মে ১৯৫৮ সালের সংখ্যায়। সন তারিখের কিছু বিভ্রাট থাকলেও আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর স্মৃতি কথায় তাঁর স্মৃতি কথায় এর প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য- আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ. ২৭৫-২৭৭

৫৯ দৈনিক আজাদ, ১৩ মে, ১৯৫৮

৬০ দৈনিক আজাদ, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৯

৬১ 'রওনক' এর প্রতিষ্ঠা হয় আবুল কালাম শামসুদ্দিনের বাসভবনে। সেই সভায় মিলিত হন প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, মতীনউদ্দিন আহমদ, মুজিবুর রহমান খাঁ, আকবর উদ্দিন, সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, এম নাসির আলী, মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, কবি আজিজুর রহমান, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি বেনজির আহমদ, আশরাফউজ্জামান খান, কবি তসলিম হোসেন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, আবদুর রহমান, আবদুল মান্নান, শামসুল হুদা চৌধুরী, ডাঃ মোহম্মদ হেসেন এবং সভার আয়োজক আবুল কালাম শামসুদ্দীন এই ২১ জন ব্যক্তিবর্গ। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা আর বৃদ্ধি পায়নি, অথবা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়নি। দ্রষ্টব্য-রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪

৬২ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৭

৬৩ মফিদুল হক, *একুশে ফেব্রুয়ারী ও আমাদের চলচ্চিত্র*, ইন্টারকাট, চতুর্থ সংখ্যা, চট্টগ্রাম ১৯৮৯,

৬৪ মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২০৯

৬৫ ঢাকায় নির্মিত উর্দু ছবি 'তানহা' এবং 'চান্দা' পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদর্শনীতে বাঁধা প্রদান করা হয়। দ্রষ্টব্য- চিত্রালী, ৯ মার্চ ১৯৬২

৬৬ সংবাদের শিরোনাম ছিল, এরূপ- সাড়ম্বরে প্রদেশে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদযাপিত বেতার ও টেলিভিশনে অবজ্ঞা কেন?। বিস্তারিত রিপোর্টে বলা হয়- গত সোমবার বাংলা ভাষাভাষী এবং বাংলা ভাষার অনুরাগীরা পৃথিবীর সর্বত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১০৫তম জন্মবার্ষিক উদযাপন করেন। ... পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি যেন উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এ বছর রবীন্দ্রজন্মতিথিতে রেডিও পাকিস্তান ঢাকার কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্র বিষয়ক কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়নি।... এবছর রেডিও পাকিস্তান এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করে বাংলা দেশের প্রতিটি মানুষকে বিস্মিত ও হতবাক করেছে। দ্রষ্টব্য- চিত্রালী, ৩ মে, ১৯৬৬

৬৭ পত্র লেখক বলেন, জনাব সম্পাদক সাহেব , আমার এই পত্রখানি আপনার বহুল প্রচারিত চিত্রালী'র 'আপনার মতামত; বিভাগে স্থান পেলে বাধিত ও সুখী হব।... বাঙালি প্রযোজক ও পরিচালকগণ কি নিজের মাকে ভুলে যেতে চান? না চান বাংলা চলচ্চিত্রের অপমৃত্যু হোক? দ্রষ্টব্য- চিত্রালী, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

৬৮ মির্জা তারেকুল কাদের, *পূর্বোক্ত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩২৪

৬৯ চিত্রালী, ২০ নভেম্বর, ১৯৭০

৭০ সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, বাংলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ. ২

৭১ সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা (১৯৪৭-১৯৭১)*, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮, পৃ. ১৩০

৭২ শেখ লুৎফর রহমান, *জীবনের গান গাই*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৩-৩৪

৭৩ মাহবুবুল আলম চৌধুরী, *কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি*, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৬-৫০

৭৪ সাইম রানা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৭৫ ঐ. পৃ. ৭৩-৭৯

৭৬ শেখ লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২, শামসুজ্জামান খান, কল্যাণী ঘোষ, গণসঙ্গীত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫,পৃ. ৯৯, কামাল লোহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৭৭ কামাল লোহানী, লড়াইয়ের গান, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ২২৭

৭৮ 'আমার দেশের ছাত্র-ছাত্রী নাই তুলনা নাই/ ওরা বছর বছর মরছে বলে আমরা বেঁচে যাই/ দেইখাছি বায়ান্ন সনে ভুলি নাই তা আছে মনে/ ওরা বাংলা ভাষার কইমান রাখিতে কইরাছে লড়াই/ আইলো দেশে জঙ্গী শাসন আয়ুবশাহী রাজ/ তার বিরুদ্ধে প্রথম তুইলাছে আওয়াজ... দেখুন- আবদুল লতিফ, ভাষার গান দেশের গান, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ৫৮-৫৯

৭৯ কামাল লোহানী, লড়াইয়ের গান, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ১৮০, ১৭৮-১৭৯, সাইম রানা পূর্বোক্ত, ১৪৯

৮০ সাইম রানা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

৮১ শেখ লুতফর রহমান, পৃ. ৫৯

৮২ এই সংস্থা প্রতিষ্ঠায় জড়িত ছিলেন, আবদুল করিম, আনন্দ গুপ্ত, নিতাই গাঙ্গুলী, বিশ্বনাথ রায় মল্লিক, বদরুল হাসান, মন্টু খান, আবদুল রাজ্জাক, মাসুদ আলী খান, আবদার রশিদ, নাসিম আলী খান, আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন, ওয়াহিদুল হক, শামসুল আলম, মেসবাহুল হক প্রমূখ। দ্রষ্টব্য- শেখ লুতফর রহমান, পৃ. ৬১

৮৩ সন্‌জীদা খাতুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১২

সপ্তম অধ্যায়

পূর্ববাংলার অর্থনীতি ও সমাজ

সপ্তম অধ্যায়

পূর্ববাংলার অর্থনীতি ও সমাজ

পূর্ববাংলার অধিবাসীগণ মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির ধারণার চেয়েও বরং অপেক্ষাকৃত উন্নত অর্থনৈতিক জীবন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের ভোটের ফলাফলকে মুসলিম লীগ তাঁদের দাবির সপক্ষে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরে মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির দাবিকে জোরদার করেছিল। বাংলা ছাড়া অন্য কোন প্রদেশে মুসলিম লীগ সরকার গঠনের মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মেছিল যে, নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জমিদার শ্রেণির শোষণ-বঞ্চনা থেকে তাঁরা মুক্তির দিশা পাবেন। মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারণায় জমিদারদের শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হয়েছিল। জমিদার শ্রেণি ব্রিটিশ শাসকদের দোসর হিসেবে সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে দিত। এ কারণে পূর্ববাংলার মানুষ ভেবেছিল জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের বঞ্চনার অবসান হবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোয় পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। নবগঠিত রাষ্ট্রে অচিরেই তাঁদের স্বপ্ন মলিন হতে শুরু করে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের মদদপুষ্ট কিছু সংখ্যক তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির কাছে পূর্ববাংলার মানুষের ভাগ্য জিম্মি হয়ে পড়ে। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা রোহিত হয় বটে।[১] পূর্ববাংলার মানুষের আশা ছিল জমিদারী প্রথা রোহিত হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের জীবনমানের দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে; বস্তবে তা হয়নি। শাসন ব্যবস্থায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মৌলিক পরিবর্তনের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। জনগণের শাসনতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর পরিবর্তে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বিকাশ ঘটে- যেখানে সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা কেউ ভাবেনি। নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি পূর্ববাংলার মানুষ আত্মিকভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি, পাটের মূল্য হ্রাস, কৃষির উৎপাদন খরচ

বেড়ে যাওয়ার ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবন আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। ফলে পূর্ববাংলায় রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে অর্থনৈতিক জীবনেও এক ধরনের পরিবর্তনকামী মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠতে থাকে। বস্তুত, অর্থনীতিই হলো রাজনীতি বা সংস্কৃতির পেছনের চালিকা শক্তি। কাজেই ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক জীবন পরিবর্তিত সময়ের সাথে কিভাবে সমন্বয় করে চলেছে অথবা এর সাথে খাপ খেয়ে চলতে না পেরে কিভাবে তাঁদের মধ্যে নতুন করে পরিবর্তনকামী মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠতে থাকে সেটি অনুসন্ধান করা জরুরি। কেননা, সাধারণ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিই মূলত রাজনৈতিক শক্তির চলক হিসেবে কাজ করে। বর্তমান অধ্যায়ে পূর্ববাংলার মানুষের চিরাচরিত অর্থনৈতিক জীবন এবং পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর গৃহীত নীতি কী ধরনের সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল সেটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিক বঞ্চনা এ অঞ্চলের মানুষকে কিভাবে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে নেমে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল সে বিষয়টিও আলোচনায় স্থান পাবে।

৭.১ গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র

পূর্ববাংলা গ্রাম প্রধান অঞ্চল। পাকিস্তান শাসনামলে এখানকার মোট জনসংখ্যার সিংহভাগই গ্রামে বাস করত। অধিবাসীদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রভাব প্রবলভাবে বিদ্যমান। অসংখ্য নদ-নদীর প্রবাহমান জলধারায় বাহিত পলি মাটি সঞ্চিত হয়ে এদেশের ভূমিরূপ গঠিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া প্রকারন্তরে গঠন করেছে এই জনপদের মানুষের ভাগ্য। নদ-নদীর ভাঙ্গা-গড়ার মতই এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উত্থান-পতনও ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। যুগ যুগ ধরে নবগঠিত পললভূমি এ অঞ্চলে একটি সমৃদ্ধশালী কৃষি অর্থনীতি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত কৃষিই ছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অর্থনীতির মূল যোগানদাতা। এক্ষেত্রে পূর্ববাংলার অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পূর্ববাংলার সমগ্র জনগোষ্ঠীর ৯৬.৭ শতাংশ গ্রামে এবং মাত্র ৩.৩ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করতেন[২]। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রথম আদমশুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৯৬ শতাংশ গ্রামে বাস করতেন।[৩] অর্থাৎ ১০ বছরে শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় মাত্র ০.৭ শতাংশ। এ থেকে পূর্ববাংলার নগরায়নের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। নগরায়নের চিত্র অর্থনৈতিক অবস্থার একটি মাপকাঠি। নগরায়নের দিক থেকে পূর্ববাংলা খুবই পশ্চাৎপদ অবস্থানে ছিল। ১৯৪১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, ১ লক্ষ লোক বাস করে এরকম শহরের সংখ্যা ৪ টি এবং ১ লক্ষের ওপরে জনসংখ্যাসম্পন্ন শহরের সংখ্যা মাত্র ১টি।[৪] ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রধান ১২টি শহরের মধ্যে পূর্ববাংলার ছিল মাত্র ২টি শহর। অবশ্য ১৯০১ সালেও পূর্ববাংলার এ দুটি শহর একই ভৌগোলিক অঞ্চলের ১২টি শহরের মধ্যে ছিল।[৫] ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের প্রধান ১৮টি শহরের মধ্যে পূর্ববাংলার মাত্র ৩টি শহর ছিল।[৬] অর্থাৎ পূর্ববাংলায়

নগরায়নের গতি ছিল মন্থর। বস্তুত, এখানকার জীবনব্যবস্থা গ্রামীণ অর্থনীতির ওপরই নির্ভরশীল ছিল। আর এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও ছিল প্রকৃতি নির্ভর।

কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পও অর্থনীতিতে খানিকটা অবদান রাখত। এসব শিল্পের কাঁচামালের যোগান আসত কৃষিপণ্য থেকে। কাজেই এখানে কৃষি ও শিল্প একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ঢাকা ও চট্টগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগরীর বাইরেও কিছু কিছু গ্রামীণ শিল্পকর্মও গ্রামীণ অর্থনীতিকে চলমান রেখেছিল। আমরা মধ্যযুগে ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, পূর্ববাংলার অর্থনীতি অন্য অঞ্চলের ওপর খুব একটা নির্ভরশীল ছিল না। বরং মুঘলদের পতনের যুগে বাংলার উদ্বৃত্ত যোগান তাদের টিকে থাকার সংগ্রামে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায়, বাংলার সমৃদ্ধশালী অর্থনীতি ভারতবর্ষে বৃটিশদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিল। বাংলাকে কেন্দ্র করেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বৃটিশ শাসনামলে কোলকাতা এবং হুগলি কেন্দ্রিক যে শিল্প-কারখানার বিকাশ ঘটেছিল তা অনেকটা পূর্ববাংলার কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল ছিল। পূর্ববাংলার কৃষিপণ্যের যোগানের ভিত্তিতে কোলকাতার জনজীবন সচল থাকত। এই দেয়া- নেয়ার সম্পর্ক উভয় অঞ্চলের জনজীবনের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্মকে একদিকে যেমন সচল রেখেছিল অন্যদিকে এটি উভয় জনপদের মানুষকে আর্থ-সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধমে আবশ্যিক সম্পর্কের বন্ধনেও আবদ্ধ করেছিল। এভাবে একটি পরস্পর সহযোগিতামূলক একক ও অবিচ্ছেদ্য অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোলকাতার শিল্পকলকারখানা যেমন পূর্ববাংলার কাঁচা পণ্যের যোগানের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তেমনি কাঁচাপণ্যের যোগানের মাধ্যমে পূর্ববাংলার কৃষকদের হাতে আসত নগদ অর্থ। ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষে পরিকল্পিত ও সমন্বিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। বাণিজ্যিক মুনাফা ও স্থানীয়ভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ ঘটেছিল। স্বাভাবিকভাবে পূর্ববাংলায় ব-দ্বীপ সমভূমির বৈশিষ্ট্য অনুসারে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। এই কৃষিপণ্যের বিপণনের জন্য পূর্ববাংলা ভারতবর্ষের অন্য অংশ যেমন কোলকাতা, হুগলি, বোম্বে প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল। বৃটিশ শাসনামলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমতার চেয়ে বাণিজ্যিক মূনাফাই বেশি প্রধান্য পেয়েছে। সে কারণেই ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি। ফলে দেশভাগ আঞ্চলিক অর্থনৈতিতে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছিল। এর বড় শিকার হয়েছিল পূর্ববাংলা। ভৌগোলিক কারণে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। তবে পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল সবচেয়ে বশি। দেশভাগের পরিণতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু অধ্যাপকদের দেশত্যাগের ফলে ব্রিটিশ অধ্যাপক এ. জি. স্টক ১৯৪৭-১৯৫১ পর্যন্ত সময়ে ইংরেজী বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'পূর্ববঙ্গ দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের একটি, কিন্তু দেশ-বিভাগ

তাকে আরও দরিদ্র করেছে'।[৭] একদিকে দেশভাগের অভিঘাত অন্যদিকে পাকিস্তানী শোষণ নীতি পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক জীবনকে পশ্চাৎপদ অবস্থায় নিয়ে যায়।

পূর্ববাংলায় কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী একটি গতানুগতিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিল। এই অর্থনীতি অধিবাসীদের ভাগ্য চক্রের ন্যায় ষড়ঋতুর গতিধারার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। প্রকৃতির বিরূপ প্রভাব যেমন অধিবাসীদের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হতো অনুরূপভাবে অনুকূল আবহাওয়া বিদ্যমান থাকলে প্রকৃতি দুহাত উজাড় করে দিত। ফলে সেসময় গ্রামীণ অর্থনীতিতে চাঙ্গাভাব বিরাজ করত। তখন অধিবাসীরা আনন্দের নতুন নতুন অনুষঙ্গ খুঁজে পেত। যা কিছুই ঘটুক না কেন, সেটিকে মানুষ নিয়তি হিসেবেই মেনে নিত। প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার সাথে পাকিস্তান শাসনামলে মনুষ্য সৃষ্ট রাজনৈতিক বঞ্চনা মানুষের মনোজগৎকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। এর কারণ হলো পূর্ববাংলার একটি সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী অতীত।

ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজ যোগান এবং কৃষি ও ফলজ পণ্যের প্রাচুর্যের কারণে এ অঞ্চলে অতীতে মানুষের মনে স্বর্গের সুখ বিরাজিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন শাসননীতি সমৃদ্ধশালী এই অঞ্চলকে দারিদ্রতম অঞ্চলে পরিণত করে। দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যে সব প্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তাতে বাংলার কৃষকদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ছিল। কৃষির বঞ্চনা থেকেই তারা ব্রিটিশ শাসকেদের দোসর নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। পূর্ববাংলার ভৌগোলিক সীমায় সংঘটিত অনেকগুলো কৃষক আন্দোলন এ অঞ্চলের মানুষের এক ধরণের রাজনৈতিক অগ্রসরমানতার পরিচয় বহন করে। এসব আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। কাজেই পূর্ববাংলার অধিবাসীদের রাজনৈতিক অসচেতনতা ও পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে পাকিস্তানী শাসকদের অবজ্ঞাসূলভ মনোভাব অজ্ঞতাবশত। পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে পরিস্কার চিত্র পাওয়া যায় যে, পূর্ববাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতি কৃষি অর্থনীতির উত্থান-পতনের ওপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল।

পাকিস্তানী শাসনের সূচনালগ্নে পূর্ববাংলা ১৭ টি জেলায় বিভক্ত ছিল। অধিকাংশ জেলাতেই কমবেশি সব ধরনের কৃষিপণ্যে উৎপাদিত হতো। এধরনের ভৌগোলিক সুবিধাজনক অঞ্চল খুব কমই থাকে যেখানে প্রায় সমভাবে অধিকাংশ কৃষিপণ্যের উৎপাদন হতে পারে। নিচের সারণিতে পূর্ববাংলায় কৃষির বিন্যাস দেখানো হয়েছে:

সারণি-৭.১ : প্রধান প্রধান শস্য উৎপাদনকারী জমির পরিমাণ[৮]

প্রধান প্রধান ফসল এবং চাষের জমির পরিমাণ (একর)										
জেলা	ধান	ডাল	গম	যব	আখ	তৈলবীজ	মরিচ	পাট	তামাক	চা
চট্টগ্রাম	৭,৭৯,০০০	১,২০০	-	২,০০০	৬,০০০	৪০০	১৪,১০০	১৩০	২,৫০০	৬,২০০
পার্বত্য চট্টগ্রাম	১,৪০,০০০	১,০০০	-	-	১,৫০০	১৪,৩০০	১,২০০	২,৫৭৫	১,০০০	২০০
নোয়াখালী	৮,৫০,৬০০	২০,৬০০	১০০	-	১,৪০০	১৩,১০০	১৫,১০০	৩৪,১৪৫	১০০	-
ত্রিপুরা	১৪,৬৪,৬০০	২১,৫০০	৩০	১০০	২,৬০০	২৩,৬০০	২৪,১০০	১,৭৬,৪৮০	৪,০০	২০০
সিলেট	১৬,৬০,৩০০	১,২০০	-	-	২,০০০	১০,৭০০	৫,২০০	৩২,৯৩৫	৩,৫০০	৬৮,৩০০
বাকেরগঞ্জ	১৭,৩৪,৫০০	৩৪,৫০০	-	-	১৯,৫০০	২,২০০	৩৬,১০০	৪১,৮৪৫	৬,৫০০	-
ঢাকা	১১,৯৫,০০	৩৬,১০০	৭,৯০০	১২,৩০০	৩৪,২০০	৫৫,৪০০	১১,৭০০	১,৮১,৫০৫	১১,০০০	-
ফরিদপুর	১১,৭৪,৮০০	২৫,৩০০	৩,৯০০	৯,৩০০	১০,৮০০	২৬,৫০০	১২,৯০০	১,৫৮,১১৫	৬,৯০০	-
ময়মনসিংহ	২৮,১২,১০০	৫৪,৯০০	২,৫০০	১০,০০০	৩০,৫০০	১,৪৮,৩০০	১৮,৭০০	৪,১০,৫২৫	১২,০০০	-
বগুড়া	৭,৭২,০০০	৮,৫০০	২,৪০০	৫০০	৭,৫০০	২০,৩০০	৫,১০০	৬৯,৬৭৫	১,৮০০	-
দিনাজপুর	৯,৩০,৩০০	৪,০০০	২,৭০০	৮,০০০	৪০,৩০০	৪০,৩০০	৪,১০০	৮৫,৮৫০	৯,০০০	-
যশোর	১০,১৫,৫০০	২৪,৫০০	২,৭০০	১,৩০০	৫,৪০০	২৪,৬০০	২,৮০০	৬৬,৮৮৫	২,১০০	-
খুলনা	১২,৯১,৫০০	৮,০০০	-	১০০	১,২০০	২৬,০০০	৩,১০০	২২,২৮৫	১,৪০০	-
কুষ্টিয়া	৫,৫৬,০০০	২৫,৯০০	১৫,০০০	৪,৪০০	৮,০০০	২২,৩০০	১,৮০০	৩০,২৮৫	৫০০	-
পাবনা	৮,০৯,১০০	২৪,৪০০	১১,০০০	১২,০০০	৪,০০০	৩৭,৪০০	৩,১০০	৭৬,৭১৫	৩,০০০	-
রাজশাহী	১৩,১৮,৪০০	৪২,৬০০	২৫,০০০	১২,০০০	৩০,৫০০	৩৭,৮০০	২,৯০০	৮৯,১৯৫	৩,০০০	-
রংপুর	১৫,৫৩,০০০	২১,৯০০	২০,০০০	১০,০০০	১,৭৮,০০০	৭৪,২০০	৮,৬০০	২,৩২,৭৫৫	৬০,০০	-
সর্বমোট	২,০০,৫৬,৭০০	৩,৫৬,১০০	৯৩,৫০০	৮২,০০০	২,২৫,৯০০	৫,৭৭,৪০০	১,৭০,৬০০	১৭,১০,৯০০	১,২৮,৩০০	৭৪,৯০০

উপরের সরণিতে জেলাভিত্তিক কৃষি উৎপাদনের যে চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রধান খাদ্যশষ্য ধান এবং প্রধান অর্থকরি ফসল পাট পূর্ববাংলার সব জেলাতেই উৎপাদিত হয়। পূর্ববাংলার কৃষি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, সমতল ভূমি এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাবে অঞ্চলভেদে কৃষিকাজ ও শষ্য বৈচিত্রে খুব বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। পূর্ববাংলার প্রতিটি অঞ্চলেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতিই এখানে একটি সমন্বিত কৃষি অর্থনীতির বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কৃষির উন্নয়নে রাজনৈতিক কোন পরিকল্পনা এখানে সেভাবে কখনো গৃহিত হয়নি। এ অঞ্চলের প্রতি পূর্বতন শাসকদের অবহেলা, হিন্দু জমিদারদের শোষণ-বঞ্চনা মুসলিমদের পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পূর্ববাংলার মুসলমানদের সমর্থনের পেছনে প্রধান নিয়ামক ছিল। জনগণ আশা করেছিল যে, নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যাশা অনুযায়ী পাকিস্তানী শাসকরা পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন রাজনৈতিক পরিকল্পরা গ্রহণ না করায় জনগণ হতাশ হয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের অর্থনৈতিক প্রভাব পূর্ববাংলার জনজীবনে নানাভাবে প্রতিভাত হয়। এর অন্যতম একটি অভিঘাত হলো ফসলী জমি বিভক্ত হয়ে যাওয়া। রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি সীমান্তবর্তী জেলার ভূমি দুইদেশের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৯] এই বিভক্তি যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা সমন্বিত অর্থনৈতিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সীমারেখা না মানায় দীর্ঘদিন ধরে কর্ষিত অংশীদারিত্বমূলক কৃষি ব্যবস্থাপনার ছন্দপতন ঘটায়। এই ঘটনা সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তো বটেই ব্যক্তি ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বিপর্যস্ত করে। সঠিক পরিকল্পনা ও সময়োচিত পদক্ষেপের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব ছিল। কেননা এর অধিকাংশ ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বহুমুখী ব্যবহার করার সুযোগ বিদ্যমান ছিল প্রাকৃতিকভাবে। পাকিস্তানের মোট আয়তনের ১৪.৮ শতাংশ হওয়া সত্বেও কৃষি জমির ৪১.৫ শতাংশই ছিল পূর্ববাংলায়। অধিকাংশ জমিতে বছরে ২/৩ বার ফসল ফলে।[১০] ১৯৪৪-৪৫ সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫ হাজার একর জমির মধ্যে আবাদী জমির ৫৯.৮ শতাংশ জমি চাষের আওতায় এবং ৪০.২ শতাংশ জমি বনায়ন অথবা পতিত ছিল।[১১] মোট জমির মাত্র ১৭.৮ শতাংশ জমি অব্যবহৃত ছিল।[১২] পূর্ববাংলায় মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমান ছিল মাত্র .৬৭ একর।[১৩] জমির উর্বরতা এত বেশি ছিল যে, মাথাপিছু এই সমান্য পরিমান জমিতেও জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় রসদ মিলত। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। প্রাকৃতিকভাবে ফসল ফলে বলে ফসল উৎপাদন খরচও অনেক কম। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এখানকার মোট কৃষি জমির মাত্র ২.২ শতাংশ সেচ সুবিধার আওতায় এসেছিল।

কৃষিপণ্যের বৈচিত্র্য ও উৎপাদনশীলতা প্রাচীনকাল থেকেই পূর্ববাংলাকে সমৃদ্ধশালী কৃষি অঞ্চলের মর্যাদা দান করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন তথ্যে এর সাক্ষ্য মেলে। এখানকার প্রধান ফসল হলো ধান। পাকিস্তানের সর্বমোট উৎপাদনের ৯০ ভাগ ধান পূর্ববাংলায় উৎপন্ন হয়। ১৯৬১ সালের হিসাবে ২২ মিলিয়ন একর জমিতে প্রায় ২৫৯ মিলিয়ন মন ধান উৎপন্ন হয়। এছাড়া ডাল, তৈলবীজ, গম, যব, মরিচ, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি এবং মৌসুমী ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। প্রাকৃতিক কারণে জনজীবন অনেকটা অনিশ্চয়তার দোলাচলে অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এখানে একটি স্বনির্ভর গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই স্বনির্ভরতার মূল কারণ স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে নিত্যপণ্যের যোগান নিশ্চিত হওয়া। নিচের সারণিতে পূর্ববাংলার খাদ্যের চাহিদা ও উৎপাদনের একটি চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে:

সারণি-৭.২ : পূর্ববাংলার খাদ্য পরিস্থিতি[১৪]

সাল	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	প্রাপ্তবয়স্ক (৮৭%) (মিলিয়ন)	মাথাপিছু ১৮ আউন্স হিসেবে খাদ্য (টন)	স্থানীয় উৎপাদন (টন)	উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (টন)	আমদানি (টন)	স্থিতি (টন)	সংরক্ষণ ঘাটতি	চাহিদা ও সরবরাহের পার্থক্য
১৯৪৮	৪১.১০	৩৫.৭৬	৬৫,৫৪,৯৩৫	৬৩,৬১,৯১৫	-১,৯৩০,২০	১,১০,৮৪১	-৮২,১৭৯	৩৬৬,৭৯৭	-৪৪৮,৯৭৬
১৯৪৯	৪১.৪২	৩৬.০৪	৬৬,০৬,২৬০	৭২,২৪,৪১৫	+৬,১৮,১৫৫	২,৯৩,৪৭৭	+৯১১,৬৩২	৩৬৬,৭৯৭	+৫৪৪,৮৩৫
১৯৫০	৪১.৭৪	৩৬.৩১	৬৬,৫৫,৭৫৫	৬৯,৬১,০০৫	+৩০৫,২৫০	১,৪২,৪৯৩	+৪৪৭,৭৪৩	৩৬৬,৭৯৭	+৮০,৯৪৬
১৯৫১	৪২.০৬	৩৬.৫৯	৬৭,০৭,০৮০	৬৯,১১,৮৯৫	+২০৪,৮১৫	৯,২,৬০২	+২৯৭,৪১৭	৩৬৬,৭৯৭	-৬৯,৩৮০
১৯৫২	৪২.৩৮	৩৬.৮৭	৬৭,৫৮,৪০৫	৬৭,৮৭,৬০৫	+২৯,২০০	২,৮৪,৯৬৪	+৩১৪,১৬৪	৩৬৬,৭৯৭	-৫২,৬৩৩
১৯৫৩	৪২.৭০	৩৭.১৫	৬৮,০৯,৭৩০	৬৯,২২,৩৬০	+১১২,৬৩০	১,৯৯,৩৭৫	+৩১২,০০৫	৩৬৬,৭৯৭	-৫৪,৭৯২
বাৎসরিক গড়	৪১.৭৪	৩৬.৩১	৬৬,৫৬,৫৩৯	৬৮,৬৪,১৬২	+২০৭,৬২৩	১,৮৭,২৯২	+৩৬৬,৭৯৭	৩৬৬,৭৯৭	০০,০০০

সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর স্থানীয়ভাবে গড়ে ৬৬,৫৬,৫৩৯ লক্ষ টনের চাহিদার বিপরীতে গড়ে ৬৮,৬৪,১৬২ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিবছর গড়ে ১,৮৭,২৯২ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করা হয়েছে। অর্থাৎ বছরে খাদ্য আমদানির পরিমাণ খুব বেশি

ছিল না। তবে পরিসংখ্যানের চিত্র অনেকটা সহনশীল হলেও বাস্তবে পূর্ববাংলায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই জনসংখ্যার একটি বড় অংশ চাহিদা অনুযায়ী অন্নের সংস্থান করতে পারত না। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সালের খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পারিসংখ্যানিক তথ্যে বৎসরিক গড়ে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ঘাটতি ছিল না। তথাপি এসময়ে কোথাও না কোথাও খাদ্য সংকট দেখা দিত। এর পেছনে কারণ হলো, সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতা, ত্রুটিপূর্ণ বন্টন ব্যবস্থা, বেশি মুনাফা লাভের আশায় মহাজনদের মজুদ করার প্রবণতা, অবস্থা সম্পন্ন কৃষকদের দাম বাড়ার শঙ্কায় খাদ্য শস্য বিক্রি না করা, সর্বোপরি সরকারের কর্ডন প্রথা।[১৫] সরকারের গৃহিত নীতি পূর্ববাংলায় প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থাপনকে বাঁধাগ্রস্থ করে। পণ্যের স্বাভাবিক চলাচলে হস্তক্ষেপ বাজার ব্যবস্থায় অস্থিরতার সৃষ্টি করে। মুনাফালোভী জোতদার গোষ্ঠীর খপ্পরে পড়ে ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসা প্রাত্যহিক জীবন ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ নিদারুণ দুর্ভোগের শিকার হয়। দেশ ভাগের পর প্রতিবছর নিত্যপণ্যের দাম নিয়মিতভাবে দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে ভোক্তাদের মনে একটি আশঙ্কা বিরাজমান ছিল। এই আশঙ্কা থেকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কেনার প্রবণতা বাজার ব্যবস্থাকে আরও অস্থিতিশীল করেছিল। বিপরীতক্রমে রপ্তানি পণ্যের দাম কমতে থাকে।

পাট, চা, তামাক, আখ ইত্যাদি ছিল পূর্ববাংলার প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল। সেময়ে আবাদযোগ্য জমির মাত্র ১০ শতাংশে পৃথিবীর ৫৮ ভাগ পাট পূর্ববাংলায় উৎপাদিত হতো। পৃথিবীর উন্নতমানের পাটের ৯০ ভাগ পাটই পূর্ববাংলায় উৎপাদিত হতো। তৎকালীন সময়ে এটি ছিল পৃথিবীর এক নম্বর পাট রপ্তানীকারক অঞ্চল। পাটই ছিল তৎকালীন সময়ে পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী রপ্তানী পণ্য। এসব অর্থকরী ফসল, বিশেষ করে পাটের উৎপাদনশীলতার ওপর অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে মান নির্ভর করত। উপমহাদেশের ৭০ শতাংশ পাট পাকিস্তানে (পূর্ববাংলায়) উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও দেশভাগের সময়ে এখানে কোন পাটকল ছিল না। ফলে দেশভাগের পর পূর্ববাংলার পাট চাষীগণ পাটের বাজার সংকটে পড়ে। ভারতের সাথে পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে না ওঠা এজন্য দায়ী। পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব দেয় যে সাধারণভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ ডিউটি নিরূপণ না হওয়া পর্যন্ত পাট রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিশেষ শুল্ক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। এতে ভারত রাজী না হওয়ায় ১৯৪৭ সালের ১৪ নভেম্বর পাটের ওপর রপ্তানী শুল্ক আরোপ করা হয়।[১৬] এছাড়া ভারতের সাথে সমন্বয় করে মুদ্রার অবমূল্যায়ন না করায় পাকিস্তানের সাথে বাণিজ্য করতে ভারত অসম্মতি জানায়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলবস্থা তৈরি হয়। এই বাণিজ্য যুদ্ধে পূর্ববাংলার পাট-বাণিজ্য সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্রুত পাটের দর পতন ঘটে।[১৭] ১৯৫৩ সাল নাগাদ পাটের মূল্য অর্ধেকে নেমে আসে। নিচের সারণিতে উৎপাদক ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে পাটজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি-৭.৩ : চাষী, মধ্যস্বত্বভোগী এবং রপ্তানী পর্যায়ে পাটের মূল্য[১৮]

বছর	সর্বমোট রপ্তানী (বেল)	মোট রপ্তানী আয়		চাষী পর্যায়ে প্রাপ্ত মূল্য		বাণিজ্যিক খরচ (পরিবহন, বেলিং, রপ্তানী শুল্ক)	মধ্যস্বত্বভোগীদের লাভ		
		প্রতিমনের মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিমনের মূল্য	মোট মূল্য		ডিলারদের মোট লাভ	পাকিস্তানী ডিলারদের অংশ	নন-পাকিস্তানী-দের অংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		রুপি আনা	রুপি (০০,০০০)	রুপি আনা	রুপি (০০,০০০)	রুপি (০০,০০০)	রুপি (০০,০০০)	রুপি (০০,০০০)	রুপি (০০,০০০)
১৯৪৮-৪৯	৬২লক্ষ বেল	৪৫ ১২	১,৪১,৮২	২৯ ১২	৯২,২২	২৩,১২	২৬,৪৮	৮,৭৫	১৭,৭৩
১৯৪৯-৫০	৩০ "	৩৬ ০	৫৪,০০	২০ ১২	৩০.৭৮	১৪,১৩	৯,০৯	৪,০৯	৫,০৬
১৯৫০-৫১	৬২ "	৩২ ১১	১,০১,৫২	১৮ ১১	৫৮,১২	২৩,২৩	২০,১৭	৮,১৪	১২,০৩
১৯৫১-৫২	৫৮ "	৪৫ ৫	১,৩১,৪০	২৭ ৪	৭৯,০২	২২,৮৫	২৯,৫৩	৯,১৩	১৯,৬০
১৯৫২-৫৩	৪৯ "	২৩ ০	৫৬,৩৫	১১ ০	২৬,৯৫	১৭,৪২	১১,৯৬	৪,১৮	৭,৭৮
গড়	৫২ "	৩৭ ৬	৯৭,০২	২১ ১৫	৫৭,৪২	২০,১৫	১৯,৪৫	৭,০২	১২,৪৩

চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে ১৯৫২-৫৩ সাল পর্যন্ত কৃষক পর্যায়ে পাটের গড় মূল্য ছিল ৫৭ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯৫২-৫৩ সালে এক বছরে কৃষক পর্যায়ে পাটের মোট মূল্য ২৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মূল্য কমার শতকরা হার প্রায় ৫৩ শতাংশ। অন্যদিকে, ঐ বছর মধ্যস্বত্ব পর্যায়ে মূল্যের পতন হয় ২৫ শতাংশ। অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা গেছে যে, মধ্যস্বত্বভোগীদের লাভের ক্ষেত্রে খুব বেশি হের ফের হয়নি। মূলত উৎপাদনকারী কৃষকরাই সব ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানী পণ্যের দাম কমলেও নিত্যপণ্যের মূল্যও লাগামহীনভাবে বেড়ে যায়। একদিকে পণ্য বিক্রির নিরীখেই কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা অর্ধেকের নিচে নেমে আসে অন্যদিকে মূল্য বৃদ্ধি, এই দ্বিমুখী চাপে কৃষক দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষের দুর্দশার খানিকটা চিত্র পাওয়া যেতে পারে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ীর বক্তব্যে। ১৯৫৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পরিষদে আলোচনাকালে তিনি বলেন,

> জনাব স্পীকার সাহেব, আমার বিবরণীতে আমি মোটামুটি দেশের একটা অবস্থার কথা বলেছি। আমার জেলায় আমি আমার জীবনে এরকম অবস্থা কোন দিন দেখি নাই। প্রতি হাট বাজারে ২৫/৩০ জন করে লোক শুধু সোনা, রূপা কেনার জন্য নিক্তি নিয়ে বসে আছে। লোকের সোনা, রূপার গহনা সব কিছুই বিক্রি হচ্ছে। ছয় আনা, আট আনা এবং দশ আনা করে প্রতি তোলা রূপা বিক্রি হচ্ছে, আর সোনা ৪০/৫০ টাকা, উর্দ্ধতন ৭০ টাকা প্রতি তোলা বিক্রি হচ্ছে। যার বাড়িতে যতটুকু গহনা ছিল, তা সবই বিক্রি করছে। এই তো অবস্থা। তাছাড়া, থালা, ঘটি, বাটি, এমন কি চাষের যন্ত্রপাতি-কোদাল, কাস্তে ইত্যাদি হাটে হাটে বিক্রি করছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য এবং দুঃখের বিষয় এই যে জমির উপর যে আখ্ আছে, যা কাটা হবে নভেম্বর মাস থেকে তা এখনই আগাম বিক্রি হয়ে যাচ্ছে নামমাত্র দামে। জমির উপর যে পাট আছে সে পাটও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তারপর জমি তো' বিক্রি হচ্ছেই।[১৯]

সাধারণ কৃষক যারা পূর্ববাংলার তথা পাকিস্তানের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছিল তারা সর্বশান্ত হলেও ব্যবসায়ী এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা তেমন কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। মজার ব্যাপার হলো, এই ব্যবসায়ীদের অধিকাংশের মুনাফা হয় পশ্চিমবঙ্গে অথবা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত কেন না ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশ হিন্দু যাঁরা নিরাপত্তাহীনতার কারণে তাঁদের লভ্যাংশ ভারতে প্রেরণ করতেন এবং অবাঙালি পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা তাঁদের লাভের অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ করতেন। ১৯৬৩ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকার অর্থনৈতিক সংবাদদাতা একটি তথ্য প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়, 'পাটের ব্যবসা করিয়া বছরে ৬০ কোটি টাকার বেশি লাভ করা হয়। পূর্ব্ব পাকিস্তানীরা ইহার মধ্যে এক কোটি টাকাও পায় না। কারণ পূর্ব্ব পাকিস্তানী পাট ব্যবসায়ীরা পাট ব্যবসায় শতকরা একভাগেরও কম ব্যবসা পরিচালনা করে'।[২০] কাজেই দেখা যাচ্ছে পূর্ববাংলার উৎপাদনকারীরা অর্থাৎ কৃষক কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখতে গিয়ে সর্বশান্ত হলেও ব্যবসায়ীরা ঠিকই নিয়মিতভাবে মুনাফা করে গেছে। কিন্তু মুনাফার অর্থ পূর্ববাংলার অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করেনি। ফলে পূর্ববাংলার কৃষক একদিকে সরাসরি ক্ষতির সম্মুখীন হয় অন্যদিকে পূর্ববাংলার সার্বিক অর্থনৈতিক সূচকেও পতন ঘটে।

৭.২ মোহাজের জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন

পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা আসে দেশভাগের সাথে সাথে অর্থনৈতিক বিভাজনের ফলে। সেই সাথে অভিবাসন প্রক্রিয়াটি পূর্ববাংলার জন্য আসে শাখের করাত হয়ে। পূর্ববাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগ এবং মুসলিম মোহাজেরদের অনুপ্রবেশ কোনটিই পূর্ববাংলার অর্থনীতিতে ক্রেডিট যোগ করেনি। উভয় ক্ষেত্রেই অর্জন ছিল ঋণাত্মক। কেন না পূর্ববাংলা ত্যাগকারী হিন্দু জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই ছিলেন শহুরে জনগোষ্ঠী যাদের প্রায় সকলেই অবস্থা সম্পন্ন এবং ব্যবসায়ীক গোষ্ঠী।[২১] এছাড়া পূর্ববাংলার জমিদারদের বেশিরভাগই ছিলেন হিন্দু। এসকল হিন্দু জমিদারদের বেশিরভাগ সম্পদ পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু যে সকল মুসলিম জনগোষ্ঠী ভারত ত্যাগ করে পূর্ববাংলায় প্রবেশ করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই সেখানে কৃষিজীবী ছিলেন।[২২] এদের বেশিলভাগই কপর্দকশূন্য অবস্থায় এদেশে প্রবেশ

করেছিলেন। দেশভাগের পর চার বছরের একটি গড় হিসেবে দেখা যায় দেশত্যাগকারী হিন্দু জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রতিবছর গড়ে ৪০ কোটি রুপি পাচার হয়েছে। পক্ষান্তরে মাত্র ২ কোটি রুপি মোহাজেরদের মাধ্যমে পূর্ববাংলায় প্রবেশ করেছে ফলে এই প্রক্রিয়ায় বছরে গড়ে পূর্ববাংলা থেকে নিট ৩৮ কোটি রুপি পাচার হয়েছে।[২৩] পাট ব্যবসা, বিভিন্ন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, হিন্দু জমিদারদের জমির ইজারা মূল্য, ব্যাংক, ফিল্ম বাণিজ্য, আইনজীবী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ চাকুরীতে হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল একচেটিয়া। নিরাপত্তাজনিত এবং আস্থাহীনতার কারণে দেশভাগের আগে ও পরে এসব আয়ের অধিকাংশই অব্যাহতভাবে ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

পূর্ববাংলায় মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল অনুল্লেখযোগ্য। চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ শিক্ষা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রাধান্য ছিল। এ কারণে হিন্দু জনগোষ্ঠীর অধিকহারে দেশত্যাগ একদিকে নগদ অর্থের সংকট তৈরি করেছে; অন্যদিকে দক্ষ জনবলের দেশত্যাগ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। পূর্ববাংলা নিরাপদ নয় মনে করে দেশভাগের আগে থেকেই হিন্দু জনগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের অর্থ সম্পদ ভারতের 'নিরাপদ জায়গায়' নিয়ে যেতে শুরু করে। মুসলিম লীগের মুখপত্র *Dawn*-এর খবর অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ২০০ কোটি টাকার সম্পদ ভারতে স্থানান্তরিত হয়।[২৪] এই অর্থের অধিকাংশই পূর্ববাংলা থেকে পাচার হয়েছে, কেননা পাকিস্তানের অধিকাংশ হিন্দু জনেগোষ্ঠী পূর্ববাংলায় বসবাস করতেন। পশ্চিম পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.৬ শতাংশ জনসংখ্যা ছিল হিন্দু।[২৫] তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে ১৯৪১ সালের জনসংখ্যা শুমারি অনুযায়ী পূর্ববাংলার মোট জনসংখ্যার ২৮.৮৬ শতাংশ ছিল হিন্দু জনগোষ্ঠী যা ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২.০৪ ও ১৮.৪৫ শতাংশে। পূরো পাকিস্তান শাসনামল জুড়ে হিন্দু জনসংখ্যা কমার হার অব্যাহত ছিল। তবে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত কমে যাওয়ার কারণ শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক অস্থিতিশীলতা সে কথা সরলভাবে বলা যাবে না। এখানে বহুবিদ কারণ বিদ্যমান। যেমন, 'অপশন' দেওয়ার সুযোগ, এক সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের সন্দেহ-অবিশ্বাস, অনিশ্চয়তা, ধর্মীয় উগ্র চেতনা, মুসলিমদের মধ্যে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা, ভারত থেকে মুসলিম মোহাজেরদের আগমন এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ইত্যাদি। তবে এর মধে প্রধান কারণ কোনটি সে বিষয়ে বিতর্ক হতে পারে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশত্যাগী হিন্দুরা ছিল অর্থ-বিত্তশালী। কাজেই পূর্ববাংলা এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, দেশভাগের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল 'অপশন' দেওয়ার সুযোগ। এই সুযোগের কারণে পূর্ববাংলা থেকে হিন্দু ব্যবসায়ী ও ধনিক শ্রেণির লোকেরা দেশ ত্যাগ করে। এর ফলে শিল্প-কলকারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হঠাৎ করে শূন্যতার সৃষ্টি হয় অন্যদিকে

পূর্ববাংলায় আসেন বাস্তুচ্যুত দরিদ্র মোহাজের। এর ফলে কোন কোন অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। অভিবাসীদের পুনর্বাসনে প্রচুর বাজেট বরাদ্দ রাখার আবশ্যকতা দেখা দেয়। ১৯৫১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী সমগ্র পাকিস্তানে মোট ৭২ লক্ষ ২৬ হাজার জন অভিবাসী মোহাজের যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯.৮ শতাংশ। এর মধ্যে পূর্ববাংলায় এসেছিল মোট জনসংখ্যার ১.৭ শতাংশ বা ৬ লক্ষ ৯৯ হাজার জন।[২৬] এই বিপুল জনগোষ্ঠীর পূনর্বাসনে অর্থ যোগান দিতে পূর্ববাংলার বিদ্যমান অর্থ-ব্যবস্থা নানান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। মোহাজের জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের জন্য সরকার ১৯৪৮ সালে 'রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ফাইন্যান্স কর্পোরেশন' গঠন করেছিল। এই কর্পোরেশন মোহাজেরদেরকে সমবায় ভিত্তিক কুটির শিল্প, বিধবাদের জন্য সেলাই মেশিন ক্রয়, সিল্ক, সুতার কারখানা, শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা, কলোনী গড়ে তোলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অর্থ সহায়তা করেছিল।[২৭] সরকার মোহাজেরদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৫০ সালে অর্থ আইন সংশোধন করে বিশেষ ট্যাক্স প্রবর্তন করেন। এই খাতে ১৯৫৩ সালে ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা আয়ের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে। মোট ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার মধ্যে পূর্ববাংলার জন্য বরাদ্দ করা হয় মাত্র ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।[২৮] পূর্ববাংলার জনগণের মাথার ওপর দরিদ্র মোহাজেরদের পুনর্বাসনের বোঝা চেপে বসে। উল্লেখ্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়া মোহাজেরদের মধ্যে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, প্রভাবশালী রাজনীতিক ও অন্যান্য পেশার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা ছিলেন কিন্তু পূর্ববাংলায় আগতরা প্রায় সকলেই দরিদ্র কৃষক অথবা শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৫২-৫৩ অর্থবছরে মোহাজের অভিবাসীদের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে এসেছিল ৭.৭৩ কোটি রুপির সম্পদ। পূর্ববাংলায় এর পরিমাণ শূন্য। অন্যদিকে হিন্দু দেশত্যাগকারীদের মাধ্যমে পূর্ববাংলার সম্পদ নির্গমন হয়েছে ২৮৫.৮৬ কোটি রুপি।[২৯] এই বিপুল পরিমাণ অর্থ নির্গমনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার অর্থনীতি শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এতবড় বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যে ধরনের রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ দরকার তা গৃহীত হয়নি। সামরিক-বেসামরিক আমলা নির্ভর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের পুনর্গঠন ও সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারেই বেশি মনোযোগী ছিল।

৭.৩ বাজেট বৈষম্য

একটি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সামগ্রিক দর্শন প্রতিফলিত হয় সে দেশের জন্য প্রণীত বাজেটে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দেশভাগের পর ১৫ আগস্ট পাকিস্তানের দ্বিতীয় গেজেটের মাধ্যমে পাঞ্জাবী আমলা গোলাম মোহাম্মদকে নতুন রাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[৩০] পাকিস্তানের প্রথম বাজেট ঘোষণা করা হয় ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। এদিন একসাথে দুটি বাজেট ঘোষণা করা হয়। প্রথম বাজেটটি

ঘোষণা কর হয়েছিল ভূতাপেক্ষ (retrospective) অনুমোদনসহ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ৩১ মার্চ ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মাত্র ৭ মাস ১৬ দিনের জন্য। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হয়। পাকিস্তানের প্রথম দিককার বাজেট পর্যালোচনা করলে এই রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যাবে। প্রথম বাজেট বক্তৃতায় পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী পাকিস্তানকে শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করে এর বড় কোন সেনাবাহিনী প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রায় সিংহ ভাগই নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে সাড়ে সাত মাসের বাজেটে নিরাপত্তা খাতে রেভিনিউ বাজেটের প্রায় ৭৮ শতাংশ এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটে প্রায় ৭১ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছিল।[৩১] পরবর্তীকালে এই ব্যয় শতকরা হিসেবে কিছুটা কমেছিল তবে তা মোট টাকার অংকে বৃদ্ধি পেয়েছিল বটে। ১৯৫৭-৫৮, ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে বাজেটে নিরাপত্তা ব্যয়ের পরিমান ছিল যথাক্রমে শতকরা ৫৬ ভাগ, ৫৩.২ ভাগ এবং ৫২.৫ ভাগ। তবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক তিনটি সরকারের গড় হিসেবে ধরলে ১৯৬৩-৬৪ সালে এই ব্যয়ের শতকরা হার ছিল ২৭.৭ ভাগ।[৩২] মোট জাতীয় ব্যয়ের এত বিপুল সংখ্যক সামরিক ব্যয় যে কোন রাষ্ট্রের সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষারই বহিঃপ্রকাশ সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় অর্থমন্ত্রীর ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট বক্তৃতায়। তিনি তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেন, "Certain develoments in the political situation, with which we are all familiar, made it imperative that the defence of the country should be placed above all other consideration".[৩৩] একটি স্বাধীন দেশের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কারও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। তবে কোন দেশের জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সর্বাগ্রে জরুরি। এর সাথে সামগ্রিক নিরাপত্তা জড়িত। কিন্তু অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে নিরাপত্তার বিষয়টি সরকারের প্রথম অগ্রাধিকার বলে ঘোষণা করেন।[৩৪] এ থেকে রাষ্ট্রের দর্শন ও চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও সব কিছুর উর্ধ্বে নিরাপত্তা বিয়য়ে বাজেট বরাদ্দের ফলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের বাজেট বক্তৃতায় অর্থ মন্ত্রী স্বীকার করেন যে সামরিক খাতে বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ দিতে হয়েছে সে কারণে উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমাণ কমে গেছে।[৩৫] একটি নতুন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হচ্ছে সেখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কর্মসূচি গ্রহণ না করে অযৌক্তিকভাবে সামরিক বরাদ্দবৃদ্ধি খুবই দুঃখজনক ছিল। চুক্তির মাধ্যমে যে দেশ জন্ম লাভ করেছে সে দেশে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকি খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। সামরিক বেসামরিক আমলা নির্ভর রাষ্ট্রের সূচনা লগ্ন থেকেই এর আগ্রাসী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সামরিক খাতে বরাদ্দের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা এর সুবিধা পেয়েছে কেননা, সামরিক বরাদ্দের সিংহভাগ অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে। ফলে পশ্চিম পাকিস্থানে মুদ্রা প্রবাহ বেশি ছিল। এছাড়াও সামরিক-বেসামরিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের

হেড অফিস সেখানে থাকার কারণে পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর স্বাভাবিক সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়া সামরিক বাহিনীতে অফিসার পদে তো পূর্ববাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল অকিঞ্চিতকর এবং সৈনিক পদেও পশ্চিমাদের প্রাধান্য ছিল। ফলে সামরিক অর্থনীতির প্রান্তিক সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানীরাই ভোগ করেছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরুতেই কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সংশোধন করে প্রাদেশিক আয়ের মূল উৎস বিক্রয় কর সাময়িকভাবে কেন্দ্রের হাতে ন্যাস্ত করা হয় এই শর্তে যে, আয়ের ৫০ ভাগ প্রদেশগুলিকে দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা ১৯৫১ সালের 'রেইজম্যান রোয়েদাদ' ঘোষণার পর স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৬] রেইজম্যান রোয়েদাদ অনুসারে আয়করের ৫০ শতাংশ প্রদেশগুলোর মধ্যে বন্টন করা হবে যার ৪৫ শতাংশ পূর্ববাংলা এবং অবশিষ্ট ৫৫ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলো পাবে। বিক্রয় করের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রে যাবে এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট প্রদেশের কোষাগারে জমা হবে। পাটের উপর ধার্য শুল্ক থেকে ৬২.৫ শতাংশ পূর্ববাংলা পাবে অবশিষ্ট অংশ কেন্দ্রের কোষাগারে যুক্ত হবে। এই রোয়েদাদ ঘোষণার পর তুলা ও পাটের রপ্তানী মূল্য দ্রুত পতন ঘটে। ১৯৬১ সালে তৎকালীন অর্থ-সচিব এম এ মজিদকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য 'রেভিনিউ বরাদ্দ ও ঋণ একত্রীকরণ রাষ্ট্রপতির আদেশ ১৯৬২' জারি করা হয়। মোটা দাগে বিভিন্ন ট্যাক্সের আয় থেকে পূর্ববাংলার জন্য ৫৪ শতাংশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৪৬ শতাংশ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়। এই আদেশে প্রতিবছর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য 'সাহায্য বরাদ্দ' ২২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা রাখা হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত প্রদেশগুলিকে প্রদত্ত ঋণ দুটি হিসাবে একত্রীকরণ করে পরবর্তী ২৫ বছরে ৩.৫ শতাংশ সুদে পরিশোধ করবে মর্মে আদেশ জারি করা হয়। [৩৭] এভাবে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক আয়ের একটা বড় অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায় অন্যদিকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পূর্ববাংলাকে ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলা হয়। সরকারী বাজেটে আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনে যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হতো সেগুলোও ছিল বৈষম্যমূলক। এক দুষ্টচক্রের আবর্তে পড়ে বৈষম্য না কমে তা অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল পূর্ববাংলার বৈষম্য নিরসনের প্রধান অন্তরায়। তারা অনেক সময় বলার চেষ্টা করেছে যে, পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বৃটিশ শাসনামল থেকে উত্তরাধিার সূত্রে প্রাপ্ত। পশ্চিমাঞ্চলের এ ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। এ ধারণা তাদের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত। কেননা পূর্ববাংলা অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার নিরীখে কোন বন্ধ্যা এলাকা নয়। এখানে একটি গতিশীল কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম চলমান ছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনের ভারসাম্য অধিকাংশ সময় পূর্ববাংলার অনুকূলেই ছিল। দেশবিভাগের ফলে এর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ছন্দ-পতন ঘটে। রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব হলো বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সুষম

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিকদের সুরক্ষা ও সমতা নিশ্চিত করা। মূল সমস্যা হলো তাঁরা পূর্ববাংলাকে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য না করে মনস্তাত্ত্বিকভাবে একে ঔপনিবেশিক অঞ্চল হিসেবে মনে করত। পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কের এই মনস্তত্ত্বটি অনেকেই দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছে। তাঁদের মতে, 'যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান সামরিকভাবে প্রতিরোধযোগ্য নয় এবং রাজনৈতিকভাবেও নির্ভরযোগ্য নয়, কেন্দ্রীয় সরকার এখানে টাকা খাটাতে রাজি নয়। শিল্প গড়ে তুলে, যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতি করে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা বা প্রকল্প নিয়ে একে কেবল আগ্রাসনের জন্যে লোভনীয় করে তোলা হবে'[৩৮]। তঁদের ধারণা ছিল পূর্ববাংলা কখনো না কখনো পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সে ভাবনায় তাঁরা এর উন্নয়নের চেয়ে শোষণের নীতি গ্রহণ করেছিল। পাকিস্তানের বাজেটে আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনের কথা বড় গলায় বলার চেষ্টা থাকলেও বাজেটের চিত্রে এর কোন প্রতিফলন লক্ষ করা যায়নি।

পাকিস্তানের বাজেটে তিন ধরনের আয়-ব্যয়ের খাত ছিল যথা: ১. রাজস্ব হিসাব- এই খাতে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা হতো। ২. ক্যাপিটাল একাউন্ট- এই খাতে দেশি-বিদেশি ঋণ, বিদেশি সাহায্য সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব করা হতো। ৩. আয় ও ব্যয় (ways and means estimates) এটিতে ঋণ ও আমানত সংক্রান্ত হিসাব করা হতো। নিচের সারণিতে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজস্ব ও ক্যাপিটাল খাতের বরাদ্দের একটি চিত্র দেখানো হয়েছে।

সারণি:৭.৪ : পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের বাজেট বৈষম্য[৩৯]

(লক্ষ রুপি)

সময়কাল	রাজস্ব খাত থেকে বরাদ্দ	রাজস্ব খাতের ব্যয়	ক্যাপিটাল বরাদ্দ
১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৭-৬৮			
পশ্চিম পাকিস্তান	১৮০,১২২	১৬৫,১৮২	১১১,৫৯১
পূর্ববাংলা	১১১,৮৩১	১১১,২৫৪	৯৭,৪৭২
দুই অংশের ব্যবধান	৬৮,২৯১	৫৩,৯২৮	১৪,১১৯

এই সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৭-৬৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ২০ বছরে রাজস্ব খাতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ববাংলার বরাদ্দ ৬৮২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা এবং ক্যাপিটাল বরাদ্দ ১৪১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা কম ছিল। একটি দেশের অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য বরাদ্দের ক্ষেত্রে যেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার ছিল সেখানে বরাদ্দ বরং অনেক কম দেওয়া হয়েছে। বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শুরুর দিকে অনেক খাতে পূর্ববাংলার জন্য কোন বরাদ্দই ছিল না। ফলে শুরু থেকে পূর্ববাংলার অর্থনীতি একটি দুষ্ট চক্রের আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। সাধারণ মানুষ যে অর্থনৈতিক আত্মোন্নয়নের স্বপ্ন নিয়ে

পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল, সে স্বপ্ন পূরনো কোন দিশা তাঁদের সামনে উপস্থাপিত হয়নি। পূর্ববাংলার উন্নয়নে যেখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন ছিল তা তো হয়নি বরং একে শোষণ করা হয়েছে প্রতিনিয়ত। এ অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় মানুষের ঘামঝরানো উপার্জনের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাজেট পরিপুষ্ট করতে ব্যয় হতে থাকে। এই বৈষম্য মানুষকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের অনুপ্রেরণা যোগায়।

৭.৪ পূর্ববাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য

পূর্ববাংলা মূলত কৃষি প্রধান এলাকা। তাই এখানকার বাণিজ্যক কর্মকাণ্ডও ছিল মূলত কৃষি নির্ভর। এর পাশাপাশি প্রাচীনকাল থেকেই কিছু ক্ষুদ্র ও কুটি শিল্পের সুবাদে পূর্ববাংলা বহির্বিশ্বে খ্যাতি লাভ করে। বিশেষ করে ঢাকাই মসলিন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ অঞ্চলের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। আরও বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের বস্ত্র এ অঞ্চলে উৎপাদিত হত। এভাবে প্রাচীনকাল থেকে পূর্ববাংলা গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্র শিল্পের মর্যাদা লাভ করে। যথেষ্ট সম্ভাবনা ও কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও এখানে ব্রিটিশ শাসনামলে ভারী শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। পাকিস্তান শাসনামলেও শিল্প-কলকারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ খুব লক্ষ করা যায়নি। শিল্পায়ন তেমন না হওয়ায় মূলধনী যন্ত্রপাতী এবং শিল্প পণ্যের কাঁচামাল আমদানী কম ছিল। কৃষি প্রধান এলাকা হওয়ায় খাদ্য আমদানির পরিমাণও ছিল খুবই কম ছিল। বৃটিশ শাসনামলে পূর্ববাংলার বাণিজ্য নির্ভরতা ছিল পশ্চিম বাংলার ওপর। পূর্ববাংলার প্রধান রপ্তানি পণ্য পাট ও চামড়া পশ্চিম বাংলার শিল্প কারখানার প্রয়োজন মিটিয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল তথা আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করা হত। সেসময়ে পূর্ববাংলা ছিল পৃথিবীর প্রধান পাট রপ্তানীকারক অঞ্চল। এছাড়া চা ও চামড়া রপ্তানীর ক্ষেত্রেও এর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। আমদানি কম হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্য পূর্ববাংলার অনুকূলেই ছিল সবসময়।

স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থা সচল ছিল বলে খাদ্যপণ্য আমদানী নির্ভরতা এখানে খুব একটা ছিল না। উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার যদি পূর্ববাংলায় শিল্প-কলকারখানা স্থাপন করত তাহলে পূর্ববাংলার অর্থনীতি গতিশীল হত। কিন্তু সরকারের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সে উদ্যোগ গৃহীত হয়নি।

নিচের সারণিতে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনামূলক বাণিজ্যিক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে :

সারণি-৭.৫ : পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনামূলক বাণিজ্যিক চিত্র [৪০]

কোটি রুপি

অর্থ-বছর	রপ্তানী আয়	আমদানি ব্যয়				উদ্বৃত্ত
		বেসরকারী হিসাব	সরকারী হিসাব		মোট ব্যয়	
			সামরিক ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়		
১৯৪৮-৪৯						
পূর্ববাংলা	১৪৭.৪৭	২৪.৮০	০.১৩	১.২৬	২৬.১৯	+১২১.২৮
পশ্চিম পাকিস্তান	৬৮.৪১	৯২.৮৭	৮.৯২	৭.৭৬	১০৯.৫৫	-৪১.১৪
১৯৪৯-৫০						
পূর্ববাংলা	৬৫.০২	৪২.৩৫	০.১৭	২.৮২	৪৫.৩৫	+১৯.৬৭
পশ্চিম পাকিস্তান	৬৬.৭৫	৯০.৪৯	১৩.২২	৪.৮২	১০৮.৫৩	-৪১.৭৮
১৯৫০-৫১						
পূর্ববাংলা	১১১.৭০	৩৫.৯৬	০.৪১	২.৭০	৩৯.০৭	+৭২.৬৩
পশ্চিম পাকিস্তান	১৪৬.৬২	৯৯.২৪	১১.৮৭	১৩.৭৮	১২৪.৮৯	+২১.৭৩
১৯৫১-৫২						
পূর্ববাংলা	১৪০.০৬	৫৮.৩০	০.৮৩	৭.৭৮	৬৬.৯১	+৭৩.১৫
পশ্চিম পাকিস্তান	৯৮.৯৯	১২১.৬৬	১৮.০০	৫.১৫	১৪৪.৮১	-৪৫.৮২
১৯৫২-৫৩						
পূর্ববাংলা	৬৭.১৩	৪৫.৫২	০.৮৫	৬.৯০	৫৩.২৭	+১৩.৮৬
পশ্চিম পাকিস্তান	৮৯.৫৭	৯২.৬৬	১৮.৪৩	২৭.০৯	১৩৮.১৮	-৪৮.৬১
সর্বমোট-৪৮-৪৯ থেকে ৫২-৫৩						
পূর্ববাংলা	৫৩১.৩৮	২০৬.৯৩	২.৩৯	২১.৪৭	২৩০.৭৯	+৩০০.৫৯
পশ্চিম পাকিস্তান	৪৭০.৩৪	৪৯৬.৯২	৭০.৪৪	৫৮.৬০	৬২৫.৯৬	-১৫৫.৬২

এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে ১৯৫২-৫৩ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলায় ৫ বছরে মোট ৩০০.৫৯ কোটি রুপি বা বছরে গড়ে ৬০.১১ কোটি রুপি উদ্বৃত্ত ছিল। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫ বছরে ১৫৫.৬২ কোটি রুপি। ১৯৪৮-৪৯ অর্থবছরে পূর্ববাংলার রপ্তানি আয় ছিল ১৪৭.৪৭ কোটি রুপি। ১৯৫২-৫৩ অর্থবছরে রপ্তানি আয় কমে দাঁড়ায় ৬৭.১৩ কোটি রুপিতে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্য পূর্ববাংলার অনুকূলে থাকলেও পূর্ববাংলা এর সুফল ভোগ করতে পারেনি।

পূর্ববাংলার উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্পায়ন করা হলে বহুমানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হত। সে ব্যাপারে তাঁদের কোন আগ্রহ ছিল না। কারণ পূর্ববাংলার উদ্বৃত্ত বাণিজ্য আয় পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্যে সর্বদাই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিকূলে ছিল। সে কারণে ঘাটতি মেটাতে পূর্ববাংলার উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা তারা খরচ করেছে। আমদানির ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং পলিসির মাধ্যমে এমন সব বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল যেন পূর্ববাংলায় আমদানি ৩০ শতাংশের নিচেই থাকত।[৪১] এক হিসেবে দেখা যায় ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত ২১ বছরে পূর্ববাংলা থেকে রপ্তানী বাবদ আয় হয়েছে ২১,৩৯৫.৫ মিলিয়ন রুপি এবং আমদানি বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৭৫৯৭.৩ মিলিয়ন রুপি। এই সময়ে পূর্ববাংলার বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ৩,৭৯৭.৭ মিলিয়ন রুপি। পক্ষান্তরে একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান রপ্তানি থেকে আয় ১৬,৩৪৬.৫ মিলিয়ন রুপি এবং আমদানি ব্যয় ৩৮,০৭০.৬ মিলিয়ন রুপি। অর্থাৎ এময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ২১,৭২৪.১ মিলিয়ন রুপি।[৪২] বলাই বাহুল্য এই ঘাটতি পূরণ করতে পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলার উদ্বৃত্ত এবং বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ কাজে লাগিয়েছে। ১৯৬৪ সালের ২ আগস্ট করাচীতে কাউন্সিল মুসলিম লীগের এক সভায় শেখ মুজিবুর রহমান অভিযোগ করেন যে, 'পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার ৭৫ ভাগই পূর্ব পাকিস্তানের পাট হইতে অর্জিত হয় অথচ, সেই পূর্ব পাকিস্তানীরাই আর্থিক দিক দিয়া বঞ্চিত হইতেছে'।[৪৩] পূর্ববাংলা রপ্তানী উদ্বৃত্তের পাশাপাশি বৈদেশিক ঋণের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হরা হতো। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার জনগণকে সব দিক থেকে শোষণ করেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর থেকে প্রতি বছর স্থানীয় উৎপাদিত এবং আমদানীকৃত উভয় প্রকার পণ্যমূল্য অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এর বিপরীতে রপ্তানি পণ্যের দাম কমে গেছে। বিশেষ করে পূর্ববাংলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান রপ্তানি পণ্য পাটের মূল্য কমে সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে যায়। তবে লক্ষ্যণীয় হলো যে, পাকিস্তানের উভয় অংশে রপ্তানী দ্রব্যের বা নিত্যপণ্য মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি সমান ছিল না।

দেশভাগের পর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শুরুতেই বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে ভারতীয় রুপি ৩০.৫ শতাংশ অবমূল্যায়ন করে কিন্তু পাকিস্তান মুদ্রা অবমূল্যায়ন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই অবমূল্যায়নের পরে পাকিস্তান ও ভারতের মুদ্রার মূল্যমান দাঁড়ায় ১০০:১৪৪ রুপি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের বাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না। ১৯৫১ সালে ঢাকার বাজারে প্রতি তোলা স্বর্ণের দাম ছিল গড়ে ১০২.৩৩ রুপি এবং কলকাতার বাজারে বিক্রি হয়েছে প্রতি তোলো ১১১.৬৭ রুপিতে। অথচ মুদ্রার মূল্যমানের অনুপাতে কলকাতায় এর দাম হওয়ার কথা ছিল গড়ে ১৪৭.৪৪ রুপি। অনুরুপভাবে ১৯৫৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত ঢাকা ও কলকাতার বাজারে প্রতি তোলা স্বর্ণের গড় মূল্য ছিল যথাক্রমে ৯৮.৩৩ ও ৯১ রুপি। অথচ মুদ্রার বিণিময় হার অনুযায়ী কলকাতার বাজারে এর দাম হওয়া উচিত ছিল প্রতি তোলা ১৪১.৩৩ রুপি। [৪৪] দেশভাগের অব্যবহিত পরেই ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য যুদ্ধে পূর্ববাংলা সাংঘাতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বৈধ প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু না থাকায় পূর্ববাংলার রপ্তানী পণ্যের দাম দ্রুত কমে যায়। এছাড়া বিশাল খোলা সীমান্ত দিয়ে অবাধে চলে চোরাকারবারী। অনেক নিত্য পণ্য পশ্চিমবঙ্গে পাচার হয়। এভাবে উভয় দিক দিয়ে পূর্ববাংলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্য পূর্ববাংলার অনুকূলে ছিল। মূলত, পূর্ববাংলায় মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কম ছিল বলে এটা ঘটেছিল। ফলে পূর্ববাংলায় শিল্পায়নের গতি ছিল মন্থর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনুকূলে থাকলেও আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্য পূর্ববাংলার প্রতিকূলে ছিল। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানির পরিমাণ ছিল অনুল্লেখযোগ্য, পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ববাংলায় প্রচুর পরিমাণে পণ্য আমদানি করা হত। এখানেও লক্ষণীয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ববাংলাকে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারে পরিণত করার একটা প্রবণতা ছিল। তাছাড়া পরিবহন ব্যয়ের কারণে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পণ্য আমদানি ব্যয় বেশি ছিল। সেই তুলনায় পশ্চিম বঙ্গ থেকে পূর্ববাংলার জন্য পণ্য আমদানি লাভজনক ছিল। এছাড়া পশ্চিম বাংলার সাথে পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক এর ভৌগোলিক সম্পর্কের মতই প্রাচীন। রাজনৈতিক কারণে দেশবিভাগ হলেও অর্থনৈতিক সম্পর্ক চলমান রাখতে কোন বাঁধা থাকার কথা নয়। কেননা অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় বাণিজ্যিক সুবিধা ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এই আঞ্চলিক বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আবার পূর্ববাংলা থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তান অনুদারতার পরিচয় দিতেন। নিচের সারণিতে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি-৭.৬ : পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আঞ্চলিক বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্য[৪৫]

অর্থ-বছর	পূর্ববাংলায় আমদানি (কোটিরুপি)	পূর্ববাংলা থেকে রপ্তানী (কোটিরুপি)	বাণিজ্য ভারসাম্য (−/+)
১৯৪৮-৪৯	১৩.৯	১,৯	-১২.০
১৯৪৯-৫০	২৩.৫	৪.১	-১৮.৬
১৯৫০-৫১	২৭.২	৬.২	-২১.০
১৯৫১-৫২	২৫.৪	৬.৬	-১৮.৮
১৯৫২-৫৩	২১.৯	১৪.৯	-৭.০
১৯৫৩-৫৪	৩৮.৭	১৫.০	-২৩.৭
১৯৫৪-৫৫	৩০.৫	১৯.৭	-১০.৮
১৯৫৫-৫৬	৩৩.৪	২৩.৭	-৯.৭
১৯৫৬-৫৭	৫৩.২	২৪.৫	-২৮.৯
১৯৫৭-৫৮	৭০.২	২৬.৯	-৪৩.৩
১৯৫৮-৫৯	৬৮.৫	২৮.৪	-৪০.১
১৯৫৯-৬০	৫৬.৩	৩৬.২	-২১.১
১৯৬০-৬১	৮১.৭	৩৬.৪	-৪৫.৩
১৯৬১-৬২	৮৫.৫	৪০.২	-৪৫.৩
১৯৬২-৬৩	৮৬.৫	৪২.৫	-৪৪.০
১৯৬৩-৬৪	৮৯.৫	৫১.১	-৩৮.৪
১৯৬৪-৬৫	৮৭.৫	৫৩.৭	-৩৩.৮
১৯৬৫-৬৬	১২০.৯	৬৫.২	-৫৫.৭
১৯৬৬-৬৭	১৩৪.৪	৭৩.৯	-৬০.৫
১৯৬৭-৬৮	৯২.২	৬১.৯	-৩০.৩

উপরের সারণিতে দেখা যায়, আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্যিক লেনদেনের ভারসাম্য সর্বদা পূর্ববাংলার প্রতিকূলে ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববাংলার সাথে সব সময় ঔপনিবেশিক আচরণ করেছে। এমন নয় যে পূর্ববাংলার কোন রপ্তানি দ্রব্য ছিল না। যদি তাই হবে তাহলে তো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্য পূর্ববাংলার প্রতিকূলে থাকার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ভারসাম্য বেশিরভাগই অর্থবছরেই পূর্ববাংলার অনুকূলে ছিল। উপরোক্ত কারণে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ব্যাপারে পূর্ববাংলার জনগণের আস্থার সংকট তৈরি হয় যা চলমান স্বাতন্ত্র্য চেতনা বিকাশের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করে।

৭.৫ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

পূর্ববাংলার আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করার আগে এর ঐতিহ্যিক গ্রামীণ ক্রেডিট ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এখানে মুদ্রার যোগান ব্যবস্থা ছিল গতানুগতিক। বিধিবদ্ধ কোন আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে না উঠলেও এ সময় কিছু ব্যক্তি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান অর্থলগ্নী করত। এসব লগ্নীকারকদের মধ্যে গ্রামীণ ব্যবসায়ী, বড় বড় ধান চাষীরা ছিল। এসব লগ্নীকারকরা 'বেনিয়া' নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া আত্মীয়-স্বজন গ্রামীণ জমিদার শ্রেণির লোকদের কাছ থেকেও মানুষ ধার করতেন। আইনী কাঠামো দ্বারা প্রবর্তিত আধুনিক মুদ্রা ও ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রতিষ্ঠার পূর্বে এখানে গ্রামীণ জমিদার-জোতদার এবং মহাজনী কারবারীদের দ্বারা এক ধরনের ঋণদান বা দাদন প্রদান প্রথা চালু ছিল। এসব ঋণদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামানত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে 'গলাকাটা' হারে সুদ আদায় করা হত। এই সুদের হার ১৮ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকত। ঋণদাতাদের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে আইনী কোন সুরক্ষামূলক চুক্তি ছাড়াই সহজে ঋণ পাওয়া যেত। ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে আসলের চেয়ে সুদ আদায় করার প্রতি ঋনদাতারা বেশি যত্নশীল ছিলেন। কেননা ঋণগ্রহীতারা তাঁদের কাছে সোনার ডিম পাড়া হাসের ন্যায় মূল্যবান ছিল। জমিদার, বেনিয়া, মহাজন, আড়ৎদার প্রভৃতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ঋণের নামে কৃষকদের শোষণ করত। ঋণগ্রহীতারা কখনো কখনো খাই-খালাসী বন্দকীর মাধ্যমেও ঋণ গ্রহণ করতো। সে ক্ষেত্রে জমি অনধিক ২০ বছর পর্যন্ত ঋণদাতার কাছে খাই-খালাসী বন্ধক রাখতে হত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা বন্ধকী জমির 'বর্গাদার' হিসেবে জমি চাষাবাদ করত। ঋণদাতা উৎপাদিত ফসলের ৫০ শতাংশ পেত। এসকল গ্রামীণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। ফলে তাদের ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে অশিক্ষিত সাধারণ কৃষকরা ঋণের জালে জড়িয়ে গেলে সেখান থেকে কখনোই বের হতে পারত না। এ ধরণের গ্রামীণ জোতদারদের শোষণের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য বিধিবদ্ধ ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান জরুরী হয়ে পড়েছিল। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারী পরিচালনা করতে এসে শিলাইদাহ, শাহজাদপুর এবং পতিসরে দীর্ঘসময়

অবস্থানকালে জমিদার, মহাজন, জোৎদারদের দ্বারা কৃষকদের অত্যাচার এবং শোষণ-বঞ্চনায় গভীরভাবে ব্যথীত হয়েছিলেন। মৌসুমী ঋণ প্রদানের জন্য তিনি সমবায়, হিতৈষী সভা, কৃষিব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।[৪৬] ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে আধুনিক মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। 'ভূমি উন্নয়ন এ্যক্ট ১৮৮৩' এবং 'কৃষক ঋণ এ্যক্ট ১৮৮৪' প্রণীত হলে এই আইনের আওতায় সরকারী এজেন্সীগুলো 'তাকাভি' ঋণ ব্যবস্থা চালু করেছিল। এভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সূচনা হয়। ১৯৫২-৫৩ অর্থ বছরে পাকিস্তান সরকার ১০.৫ মিলিয়ন রুপি ঋণ প্রদান করেছিল।[৪৭] এই ঋণের কত শতাংশ পূর্ববাংলার কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছিল তার সঠিক পরিসংখ্যান অবশ্য পাওয়া যায় না। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হলেও পূর্ববাংলায় অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অশিক্ষা প্রভৃতি কারণে এধরনের প্রতিষ্ঠানের বিকাশের হার ছিল কম। পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৫৬ সালে 'The survey of Rural Credit and Rural Unemployment in East Pakistan' শীর্ষক জরীপের পূর্ববাংলায় গ্রামীন ঋণের ৮ টি উৎস চিহ্নিত কর হয়েছে। সেগুলি হলো ১. সরকার, ২. কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, ৩. পেশাদার অর্থ-লগ্নী প্রতিষ্ঠান, ৪. অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তি, ৫. দোকানদার, ৬. মধ্যস্বত্বভোগী-ফড়িয়া, ব্যাপারী, ৭. বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়-স্বজন এবং ৮.অন্যান্য উৎস।[৪৮] এই সার্ভে অনুসারে এই ঋণের বেশিরভাগ অর্থাৎ ৫৯.৫২ শতাংশ যোগান এসেছিল বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়-স্বজদের কাছ থেকে। এ থেকেই পূর্ববাংলায় গ্রামীন ক্রেডিট সিষ্টেম সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। পাকিস্তান শাসনামলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভাবে অধিবাসীরা মহাজন জোৎদারদের ও অন্যান্য শোষণকারী প্রতিষ্ঠানের দারস্থ হতে বাধ্য হত।

দেশভাগের পর পাকিস্তানের মুদ্রা বাজারে চরম অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা তৈরি হয়। এই অস্থিরতার পেছনে ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা, নাগরিকদের পরিচয় সংকট, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি দায়ী ছিল। মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে জড়িত হিন্দু জনগোষ্ঠীর বাজার থেকে মুদ্রা প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং সম্পদের স্থানান্তর, ভারতীয় মালিকানধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অফিস ভারতে স্থানান্তর এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অভিজ্ঞ হিন্দু নাগরিকদের দেশত্যাগ প্রভৃতি কারণে ব্যাংক ও মুদ্রা বাজারে স্থবিরতা তৈরী হয়। এধরনের পরিস্থিতি নতুন রাষ্ট্রের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে বাঁধাগ্রস্ত করে। এই পরিস্থিতিতে পূর্ববাংলা বেশি ঝুকির মধ্যে পড়ে। কেননা পূর্ববাংলা থেকে ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তা শ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা পশ্চিম বঙ্গে পাড়ি জমায় কিন্তু ভারত থেকে যে সমস্ত মুসলিম ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি এবং উদ্যোক্তারা দেশ ত্যাগ করেছিল তারা প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিল। পূর্ববাংলায় আগত মোহজেরগণ ছিলেন মূলত কৃষক শ্রেণীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী। যাই হোক, বিভিন্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করে তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা

তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ অবস্থানে ছিল। নিচে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও অর্থনীতিতে সেগুলোর ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

৭.৫.১ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা

একটি স্বাধীন দেশের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক অত্যাবশ্যক। নিজস্ব মুদ্রা সার্বভৌমত্বে প্রতীকও বটে। দেশভাগের সময় পাকিস্তানের কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল না। ১৯৪৭ সালের 'রিজার্ভ ব্যাংক আদেশ' অনুযায়ী সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৪৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া'[৪৯] উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা পরিচালনার কথা ছিল। তবে পাকিস্তান এসময়ের দুই মাস আগেই রিজার্ভ ব্যাংক অর্ডার ১৯৪৭ সংশোধন করে ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই থেকে 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' নামে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু করে।[৫০] কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক-নোট চালু, রিজার্ভ গ্রহণ এবং মুদ্রা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং বাজার থেকে ভারতীয় মুদ্রা প্রত্যাহার করার কাজ শুরু করে। করাচী, লাহোর এবং ঢাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ববাংলা থেকে কখনোই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ করা হয়নি। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য নীতি ঘোষণা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর মুদ্রাবাজারে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে।

৭.৫.২ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্রিটিশ ভারতে ব্যাংকিং জগতে হিন্দু সম্প্রদায়ের এককাধিপত্য বিরাজমান ছিল তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশ ভাগের সময় ২টি পাকিস্তানী মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল যার একটির প্রধান কার্যালয় পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। অন্য একটি ব্যাংক ১৫ আগস্টের পর পাকিস্তানে প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে। দেশভাগের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সমগ্র ভারতে তফসিলি ব্যাংকের অফিস ছিল ৩,৪৯৬টি এর মধ্যে যে অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয় সে অঞ্চলে তফসিলি ব্যাংকের শাখা ছিল সর্বসাকুল্যে ৬৩১টি যার ৪৮৭টি পশ্চিম পাকিস্তানে এবং মাত্র ১৪৪টি পূর্ববাংলার অংশে অবস্থিত ছিল।[৫১] দেশভাগের সময়ে এসকল ব্যাংকের অফিস ভারতে স্থানান্তরের হিড়িক পড়ে যায়। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের হিসাব অনুযায়ী ভারতে স্থানান্তরের পর পাকিস্তানে বিভিন্ন ব্যাংকের সর্বমোট ১৯৫টি শাখা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করত।[৫২] দেশভাগের অব্যবহিত পরে এই চিত্র ছিল আরও শোচনীয়। এসময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা অবশিষ্ট ছিল মাত্র ৬৯টি।[৫৩] ব্যাংক ও মুদ্রা বাজারে হিন্দু ব্যবসায়ীদের একাধিপত্য বিরাজিত ছিল। দেশভাগের পর রাষ্ট্রের ধর্মীয় পরিচয়, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, উত্তেজনা, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি কারণে হিন্দুদের ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সম্পদ স্থানান্তর এবং

দেশত্যাগ ব্যাংকিং ক্ষেত্রে অস্থিরতা তৈরি করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নগদ অর্থের অভাব দেখা দেয়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে পাট ব্যবসার ক্ষেত্রে।

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আর্থিক বিশৃঙ্খলা নিরসনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২৫ শতাংশ সরকারি মালিকানা রেখে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নীতি ঘোষণা করে। এর ফলে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে এক 'অর্ডিনেন্স' জারি করে সরকারি-বেসকারী যৌথ মালিকানায় 'ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা করা হয়। শীঘ্রই এটি পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুদ্রার অবমূল্যায়নকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অচলাবস্থার প্রেক্ষাপটে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে এই ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাট, তুলা ও অন্যান্য কৃষি পণ্যের ব্যবসায় ঋণ প্রদান। তবে ১৯৫০ সাল থেকে এই ব্যাংক স্বাভাবিক বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।[৫৪] 'ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলায় পাটের দর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে। এই ব্যাংক পাকিস্তানের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়। ১৯৬৩ সালে তফসিলি ব্যাংকের সর্বমোট আমানতের ২৭.৪ শতাংশ ছিল ন্যাশনাল ব্যাংকের।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার সময়ে পাকিস্তানে ২৯ টি ভারতীয় ব্যাংক তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করত। দেশভাগের পর বেশিরভাগ ভারতীয় ব্যাংক তাদের কার্যক্রম ভারতে স্থানান্তর করে। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় ব্যাংকসমূহের মধ্যে মাত্র ৫৫টি শাখা পাকিস্তানে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল। এসকল শাখার মধ্যে পূর্ববাংলায় ছিল ৩২টি শাখা। পূর্ববাংলায় ভারতীয় ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ছিল মোট বিনিয়োগের ২৩.৭ শতাংশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১২.৩ শতাংশ।[৫৫] পূর্ববাংলায় বেশি বিণিয়োগের কারণ হলো এখানে বেশি সংখ্যক হিন্দু ব্যবসায়ীর ব্যবসা পরিচালনা এবং পূর্ববাংলার সাথে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সরাসরি ব্যবসায়িক যোগাযোগ। একল ব্যাংক ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠী পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিলে এর অর্থনৈতিক জীবন আরও বেশী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হত।

পূর্ববাংলা পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ব্যবসায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল। এসকল ব্যবসায় অংশগ্রহণকারী এবং পুঁজির যোগানদাতা উভয়ই ছিল হিন্দু লগ্নীকারী, বোম্বে ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা। দেশভাগের পর পশ্চিম-পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা এ স্থান দখল করে। ভারতীয় বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এসকল ব্যবসায় পুঁজির যোগান দিত। দেশভাগের পর হিন্দুদের দেশত্যাগ, ব্যাংক থেকে তাঁদের মূলধন উত্তোলন, ব্যাংকের শাখা ভারতে স্থানান্তরের ফলে পূর্ববাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যে ধ্বস নামে। এর কারণ হলো, পূর্ববাংলার নিজস্ব কোন ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স এমন কি রপ্তানিকারক কোন কোম্পানী ছিল না। এই অবস্থা মোকাবেলার জন্য পূর্ববাংলার

উদ্যোক্তাগণ নিজস্ব একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। এর ফলে ১৯৫৯ সালে 'ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল' ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটাই একমাত্র ব্যাংক যার হেড অফিস পূর্ববাংলায় স্থাপন করা হয়।[৫৬] পূর্ববংলার মুলধন ঐতিহ্যিতগভাবেই অর্থনৈতিক তৎপরতা বিমুখ। এখানকার সাধারণ মানুষ পুঁজি বিণিয়োগের চেয়ে জমা রাখতেই বেশি পছন্দ করত। বেসরকারী কোম্পানী গঠনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার অভাব লক্ষণীয়। এই সুযোগে পাকিস্তানী মালিকানাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পূর্ববাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক সরকার ও জনসাধারণের কাছ থেকে বার্ষিক প্রায় দুইশত কোটি টাকা জামানত হিসেবে গ্রহণ করে। এই টাকার প্রায় সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবসায়ে বিণিয়োগ করা হয়। আবার সরকার শিল্পোন্নয়নের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করে তার প্রায় ৭৫ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়। পূর্ববাংলার জন্য যা বরাদ্দ হয় তার অধিকাংশ পূর্ববাংলার বাইরের লোকদের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়।[৫৭] এভাবে পূর্ববাংলার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের একটি বড় অংশ এই প্রক্রিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেত। অর্থাৎ পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের একটি অংশের গন্তব্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। এর ফলে পূর্ববাংলায় শিল্প-কলকারখানা আশানুরূপভাবে গড়ে ওঠেনি।

দেশভাগের সময় পাকিস্তানে বিভিন্ন দেশের ৭টি ব্যাংক 'ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্যাংক' হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করত। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক তথ্যানুযায়ী পাকিস্তানে দেশী-বিদেশী মিলে ২৬টি তফসিলি ব্যাংক তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করত।[৫৮] এসময়ে পূর্ববাংলায় বিভিন্ন ব্যাংকের ৬২টি শাখা চালু ছিল। ঢাকা, নারাণগঞ্জ চট্টগ্রাম, খুলনা, ছাড়া অন্য জেলা শহরগুলোতে ১ থেকে ৩টি মাত্র শাখার কার্যক্রম চালু ছিল।[৫৯] ১৯৬২ সালের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পাকিস্তানে পরিচালিত 'শিডিউল্ড' ব্যাংকের সংখ্যা ৩৩টিতে বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে পাকিস্তানী মালিকানাধীন ছিল ১২টি। একই সময়ে পূর্ববাংলায় বিভিন্ন ব্যাংকের মোট শাখা বৃদ্ধি পেয়ে ২১৭-তে উন্নীত হয়। ফলে সেসময়ের হিসাব অনুযায়ী ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩ শত জন মানুষের জন্য একটি ব্যাংক অফিসের ব্যবস্থা হয়।[৬০] এই পরিসংখ্যান কোনভাবেই একটি গতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র প্রদান করে না। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, লাভজনক না হওয়া এবং সর্বোপরি কিছু কিছু জেলার মানুষ কলকাতার সাথেই ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করত সেসসব কারণে পূর্ববাংলায় ব্যাংক স্থাপনের হার কম ছিল। এ সময় মফস্বল শহরে কোন ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু ছিল না।

বস্তুত, পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের আয় দৈনন্দিন খরচ নির্বাহেই ফুরিয়ে যেত। গ্রামীণ জনপদের সামান্য কিছু মানুষের বাড়তি নগদ অর্থ হাতে থাকত। এসব অর্থ-সম্পদ তাঁরা নিজ বাড়িতেই মজুদ রাখত। অবশ্য পূর্ববাংলায় তফসিলি ব্যাংকের বিস্তৃত কার্যক্রম না থাকলেও ক্ষুদ্র ব্যাংকিং (নন-তফসিলি) কার্যক্রম

পরিচালিত হত। পাকিস্তানে এধরনের ৭০২টি অফিসের মধ্যে ৫০০টিই পূর্ববাংলায় অবস্থিত ছিল। বাণিজ্যিক ব্যাংকের অনুপস্থিতিতে এধরনের ব্যাংক, দাদন ব্যবসা এবং মহাজনী কার্যক্রমের মাধ্যমে পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষকে নানাভাবে ঠকাতো।

বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি কো-অপারেটিভ ব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও পূর্ববাংলার অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। ১৯০৪ সালে 'কো-অপারেটিভ সোসাইটি এ্যাক্ট' প্রণয়ণের মাধ্যমে উপমহাদেশে কো-অপারেটিভ ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।[৬১] এধরনের ক্রেডিট কর্মসূচি গ্রাম পর্যায়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বাধীনতার সময়ে পাকিস্তানে শীর্ষ তিনটি কো-অপারেটিভ ব্যাংক ছিল পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাহয়ালপুরে অবস্থিত। বাংলার একটিমাত্র কো-অপারেটিভ ব্যাংক ছিল যা কলকাতায় অবস্থিত ছিল কাজেই পূর্ববাংলায় স্বাধীনতার পর কোন কো-অপারেটিভ ব্যাংক ছিল না।[৬২] তবে পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সালে 'ইস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ব্যাংক' স্থাপিত হয়।[৬৩] এই ব্যাংকের প্রধান কাজ ছিল কাঁচা পাট বাজারজাতকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে ঋণ প্রদান করা। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গ্রামীন ক্রেডিট সিষ্টেমের মাধ্যমে মুদ্রার প্রবাহ চালু রাখার ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ ব্যাংক কিছুটা ভুমিকা রাখলেও ধীরে ধীরে এধরণের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমতে থাকে। নিচের সারণিতে এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি-৭.৭ : পাকিস্তান শাসনাামলে পূর্ববাংলায় কো-অপারেটিভ ক্রেডিট কার্যক্রমের চিত্র[৬৪]

সন	সোসাইটির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা (হাজার)	মূলধন (লক্ষ রুপি)
১৯৪৮-৪৯	২৭,৫৫৯	৮২৫.৫	৩৯৮.৯
১৯৫৩-৫৪	১৬,১৪৩	৮১৯.৯	২৮৯.৯

উপরের চিত্র অনুযায়ী পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ববাংলায় কো–অপারেটিভ আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে শুরু করে। তবে দেশভাগের অব্যবহিত পরে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্রান্তিকালে কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলো স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রা বাজারে অর্থের যোগান চালু রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৯ সালে পাক-ভারত বাণিজ্য যুদ্ধের সময় এসব ঋণ সঙ্কট উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলোকে ১৯৫১ সালে কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রভৃতি কাজে বিতরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ দিতে শুরু করে। ১৯৬২ সালের এক হিসেবে কো-অপারেটিভ ব্যাংকের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৬৫.৬ মিলিয়ন রুপি এবং অন্যদিকে পূর্ববাংলায় মাত্র ১৪৯.৪ মিলিয়ন রুপি ঋণ বিতরণ করা হয়।[৬৫]

পাকিস্তানের অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়ার ফাইনান্স কর্পোরেশন' যা পরবর্তীকালে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান' হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৫২ সালে 'হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ১৯৫৭ সালের 'পাকিস্তান ইন্ডস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩ সালের জুন পর্যন্ত এক হিসাবে 'কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক' পশ্চিম পাকিস্তানে ১৮৭.২ মিলিয়ন এবং পূর্ববাংলায় ১৭১.১ মিলিয়ন রুপি ঋণ প্রদান করে একই সময়ে 'হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৫.৪৯ মিলিয়ন রুপি এবং পূর্ববাংলায় ৩৫.২৮ মিলিয়ন রুপি ঋণ প্রদান করে। পূর্ববাংলায় হাউস বিল্ডিং কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য এই একটি মাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস করাচি থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়।

পূর্ববাংলা শিল্প-কল-কারখানার দিক থেকে পশ্চাৎপদ অবস্থানেই ছিল। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করে ব্যাংক ঋণ। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ববাংলা ছিল কলকাতার কল-কারখানার কাঁচামালের যোগানদাতা। দেশভাগের পর এটি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক যোগানদাতায় পরিণত হয়। পাকিস্তান শাসনামলে শিল্পায়নের গতি ছিল মন্থর। ১৯৫৭ সালের ৩০ জুন নাগাদ একটি হিসাবে পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শিল্প গোষ্ঠীকে ৯৭৫ মিলিয়ন রুপি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এই ঋণের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে পেয়েছে ৬৭৪ মিলিয়ন রুপি এবং পূর্ববাংলা পেয়েছে মাত্র ৩০১ মিলিয়ন রুপি যা মোট প্রদত্ত ঋণের মাত্র ৩০.৮৭ শতাংশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্ধেকের ও কম।[৬৬] অথচ পূর্ববাংলার জনসংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি। শিল্পায়নের সাথে কর্মসংস্থানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শিল্পায়ন না হওয়ায় যেসময় পূর্ববাংলার জনসংখ্যার অধিকাংশই বেকার ছিল।

৭.৬ পূর্ব-পশ্চিম উন্নয়ন বৈষম্য ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৪৭ সালে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্ম-প্রকাশের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ রাষ্ট্রের দুটি অংশের মধ্যে ভারসাম্যমূলক ও পক্ষপাতশূন্যভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুদারতার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত, দেশভাগের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে থেকেই এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি ছিল। এই রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বাস্তবতা ছিল একেবারে ভিন্নতর। সে কারণে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাকে সামনে রেখেই সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা, দক্ষ জনবল, অভিজ্ঞ প্রশাসন ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের অভাবে এর যাত্রা শুরু হয় অনেকটা অ্যাডহক ভিত্তিতে। উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাড়া বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে এর কর্মকান্ড চলতে শুরু করে। পাকিস্তানে ১৯৪৮ সালে একটি 'উন্নয়ন বোর্ড' গঠিত হয়। ১৯৫০ সালে প্রণীত হয় ষষ্ঠ-বার্ষিক পরিকল্পনা। এর কর্ম-পরিধি ছিল স্বাধীনতার পরে উন্নয়ন পর্যালোচনা, সম্পদ ও জনশক্তির পরিমাপ ও পরবর্তী উন্নয়ন

পরিকল্পনায় তা কাজে লাগানোর কৌশল প্রণয়ন, সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

ষষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন থাকাকালে ১৯৫২ সালে সরকার একটি 'অর্থনৈতিক মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করে। মূল্যায়ন কমিটি অস্থায়ী ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনার পরিবর্তে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি দক্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন।[৬৭] এই প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকার ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে একটি 'পরিকল্পনা বোর্ড' গঠন করে। ষষ্ঠ-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন সময় ছিল ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত। কিন্তু 'পরিকল্পনা বোর্ড' ১৯৫৪ সালের ১ লা এপ্রিল থেকে বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জনবলের স্বল্পতা ও প্রস্তুতির অভাবের কারণে এক বছর পিছিয়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয় ১ এপ্রিল ১৯৫৫ সাল থেকে।[৬৮] সকল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বরাদ্দের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা হয়। বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বাস্তবতা এবং আয়-বৈষম্যকে আমলে নেওয়া হয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে আমলে নেওয়া হয়নি।

পাকিস্তানের রুঢ় বাস্তবতা ছিল এর বেশিরভাগ অধিবাসী বাস করত তুলনামূলক কম আয়ের অঞ্চলে। এছাড়া স্বাধীনতার পর থেকে কম আয় অঞ্চল থেকে বেশি আয়ের অঞ্চলে অব্যাহতভাবে সম্পদ পাচার হয়েছে । সেটি হয়েছে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আবার অর্থনীতির একটি সাধারণ ধর্ম হলো অনুন্নত এলাকা থেকে উন্নত এলাকায় শ্রমের গতিশীলতা। কিন্তু ভৌগোলিক বাস্তবতা এবং সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সেটি ঘটেনি। আবার কাঁচামালের সহজ যোগান, সুলভ মূল্যে শ্রমের সহজলভ্যতা সত্ত্বেও পূর্ববাংলায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অনীহার কারণে এখানে শিল্পায়ন আশানুরূপ হয়নি। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উন্নয়নের পূর্বশর্ত শিল্পায়ন। শিল্পায়ন একদিকে অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করে অন্যদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্ববাংলায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতি বিশেষ নজর না দেওয়ায় পূর্ব-পশ্চিম জনগোষ্ঠীর আয় বৈষম্য অব্যাহতভাবে বেড়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে পরিকল্পনাবিদগণ আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনের মৌলিক দাবীকে উপেক্ষা করেন। পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নকালে পূর্ববাংলায় অর্থনীতিবিদদের সুপারিশসমূহ উপেক্ষা করা হয়। পূর্ববাংলার সরকারের তরফ থেকেও এ বিষয়ে অসন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৭ সালের ৮ জানুয়ারী পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান পূর্ববাংলার অসন্তোসের কথা জানিয়ে খসড়া পরিকল্পনায় সংশোধন আনার জন্য পূর্ববাংলার সংশোধনী প্রস্তাব 'প্ল্যানিং বোর্ডে'-এর কাছে জমা দেওয়ার কথা সংবাদ মাধ্যমকে জানান।[৬৯] পূর্ববাংলার সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং অর্থনীতিবিদদের প্রস্তাবনা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উপেক্ষিত থেকে যায়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে দেখা যায় পূর্ববাংলার মানুষের মাথাপিছু আয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পূর্ব সময়ের চেয়ে অবনমন ঘটেছে। [৭০] প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাপূর্ব সময়ে পূর্ববাংলার মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল ২৬২ রুপি। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে পূর্ববাংলার মানুষের মাথাপিছু আয় ৩ রুপি কমে দাড়ায় ২৫৯ রুপিতে। মাথাপিছু ক্রয় ক্ষমতা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পূর্বে যেখানে ২৫৩ রুপি ছিল সেখানে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে হয় ২৫১ রুপি। এভাবে পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সূচকের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবনমন ঘটে। এখন কথা হলো, পাকিস্তানের উভয় অংশে যদি একই ধারা প্রতিফলিত হতো তাহলে হয়তো বলা যেতে পারতো স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনাটি ঘটেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কিন্তু মাথা পিছু আয় এবং ক্রয় ক্ষমতা উভয়ই ৩১৪ এবং ২৭৪ রুপি থেকে বেড়ে যথাক্রমে ৩৩৪ ও ৩১০ রুপি হয়।[৭১] পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই পূর্ববাংলা আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার হয়। নিচের সারণি লক্ষ করলে উন্নয়ন বরাদ্দের ক্ষেত্রে পার্থক্যের চিত্রটি খানিকটা বোঝা যায়–

সারণি-৭.৮ : পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন বৈষম্য[৭২]

সময়কাল	রেভিনিউবরাদ্দ (কোটি রুপি)		উন্নয়ন বরাদ্দ (কোটি রুপি)		মোটবরাদ্দ (কোটি রুপি)		শতকরা হার		মাথাপিছু বরাদ্দ (রুপি)	
	প. পাক	পূ. বাং	প. পাক	পূ. বাং	প. পাক	পূ. বাং	প.পাক	পূ. বাং	প. পাক	পূ. বাং
১৯৫০/৫১-৫৪/৫৫	৭২০	১৭১	৪০০	১০০	১,১২৯	২৭১	৮০%	২০%	৩০৯.৯৭	৫৯.৮৩
১৯৫৫/৫৬-৫৯/৬০	৮৯৮	২৫৪	৭৫৭	২৭০	১,৬৫৫	৫২৪	৭৪%	২৬%	৩৯১.২২	১০০.৭৮
১৯৬০/৬১-৬৪/৬৫	১,২৮৪	৪৩৪	১,৮৪০	৯২৫	৩,৩৫৫	১,৪৭৪	৬৮%	৩২%	৬৮৩.৩৩	২৩৫.৩৬
১৯৬৫/৬৬-৬৯/৭০	২,২২৩	৬৪৮	২,৬১০	১৬৫৬	৫,১৯৫	২,১৪১	৬৪%	৩৬%	৯১১.৪০	৩১০.২৯

এখানে দেখা যায়, ১৯৫০-৫১ অর্থবছর থেকে ১৯৫৪-৫৫ অর্থবছর পর্যন্ত অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পূর্ব সময়ে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় মিলে পূর্ববাংলায় মোট বরাদ্দের ২০ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৫৯-৬০ অর্থবছরে ২৬ শতাংশ, ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক সময়ে ৩২ শতাংশ এবং ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক সময়কালে মোট বরাদ্দের ৩৬ শতাংশ পূর্ববাংলায় ব্যয় করা হয়।

পূর্ববাংলার ব্যাপারে সরকার এত বেশি উদাসীন ছিল যে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা হলেও এ বিষয়ে কোন ধরনের ভ্রুক্ষেপ করেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির ১৭ বছর পর ১৯৬৪ 'পাকিস্তান ন্যাশনাল ইনকাম কমিশন'-এর তত্বাবধানে 'সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস' আঞ্চলিক আয় সম্পর্কে প্রথম একটি গবেষণা পরিচালনা করে। পূর্ববাংলায় ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ সালে কৃষিতে বেসামরিক শ্রমিক ৮৩.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৫.৩ শতাংশ হয় (পশ্চিম পাকিস্তানে ৬৫.১ থেকে কমে ৫৯.৩ শতাংশ হয়)। পূর্ববাংলার শ্রম-শক্তির ২০ শতাংশ বেকার পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে মোট শ্রম-শক্তির মাত্র ৮ শতাংশ ছিল বেকার। কৃষিতে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ দাঁড়ায় বেকারত্বের হার দিন দিন কমে যাওয়ার চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই তথ্য পূর্ববাংলার প্রতি শাসকগোষ্ঠীর চরম অবহেলার একটি আংশিক চিত্র উপস্থাপন করে। প্রকৃত বাস্তবতা এর চেয়েও খারাপ ছিল।

পাকিস্তানের উন্নয়ন বৈষম্য দূর করার জন্য পদক্ষেপ এবং নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব যাদের হাতে সেই সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের আঞ্চলিকতার বৈষম্যও ছিল প্রবল আকারে। আসলে বৈষম্য শব্দটি অসমতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তো পূর্ববাংলার অংশগ্রহণই ছিল না। ১৯৬০ সালে সরকারের সচিব ও যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ৫৩ জন অফিসারের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিল পূর্ববাংলার। সরকারী কাজে কর্মরত প্রথম শ্রেণির ২,৭৭৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৮৭ শতাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থাৎ পূর্ববাংলার মাত্র ৩৬১ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মরত ছিল।[৭৩] কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী এবং প্লানিং কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ পদে কখনোই পূর্ববাংলা থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। কাজেই মানব সত্তার স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে নিজ অঞ্চলের প্রতি পক্ষপাত করাটা অস্বাভাবিক নয়। আবার ফেডারেল রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ার এর একটি সুবিধাও পশ্চিম পাকিস্তানীরা পেয়েছে। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোক্তা, সাধারণ নাগরিক সকলেই এর একটি প্রান্তিক সুবিধা ভোগ করেছে, যেটি পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে ঘটেনি। পূর্ববাংলা এমনিতেই তুলনামূলকভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা পিছনে ছিল, সরকারের নীতি ও কর্মপরিকল্পনার ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির ফলে পূর্ববাংলার যে স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি সেটাও আর চলমান থাকেনি। শিল্প-কলকারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী সহযোগিতা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের কেন্দ্র করাচী হওয়ায় ভারত থেকে আগত ব্যবসায়িক মোহাজের এবং অন্যান্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের গন্তব্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। এসকল কারণে পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আয়-বৈষম্য অব্যাহতভাবে বেড়েছে।

সারণি-৭.৯ : আঞ্চলিক আয়ের তুলনামূলক চিত্র[৭৪]

	১৯৫১-১৯৫২		১৯৫৯-১৯৬০	
	পূর্ববাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ববাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
মোট আঞ্চলিক আয়(মিলিয়ন রুপি)	১১,১০০	১০,৬০০	১৩,৩০০	১৪,৪০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৪৩.৪	৩৫.১	৫০.১	৪২.০
মাথাপিছু আয়	২৫৬	৩০২	২৬৫	৩৪৩

উপরের সারণি অনুসারে ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় পূর্ববাংলার মোট আঞ্চলিক আয় এবং মাথা পিছু আয় দুটোই কমেছে। কেননা ১৯৫১-৫২ সালে পূর্ববাংলার মোট আঞ্চলিক আয় পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে ৫০০ মিলিয়ন রুপি বেশি ছিল কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সালে এসে পূর্ববাংলার মোট আঞ্চলিক আয় পশ্চিম পাকিস্তানের মোট আঞ্চলিক আয়ের চেয়ে ১,১০০ মিলিয়ন রুপি কমে গেছে। অন্যদিকে ১৯৫১-৫২ সালে পূর্ববাংলার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় বেশি ছিল ১৭.৯৬ শতাংশ কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সালে এই বৈষম্য বেড়ে দাঁড়ায় ২৯.৪৩ শতাংশে। কাজেই কোনভাবেই এই বৈষম্য প্রাকৃতিক নয়, এই বৈষম্য মানবসৃষ্ট। এছাড়া উপরের সারণিতে প্রদর্শিত আয় বৈষম্যের প্রকৃত চিত্র আরও বেশি কেননা, পাকিস্তানের তুলনায় নিত্য পণ্যের দাম পূর্ববাংলায় অনেক বেশি। একই মুদ্রানীতি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ববাংলায় নিত্যপণ্যের দাম সবসময়ই বেশি ছিল। নিচের সারণিতে প্রদর্শিত তথ্য প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে কিছুটা ধারণা প্রদান করে।

সারণি-৭.১০ : পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে নিত্য পণ্যের মূল্যের তুলনামূলক চিত্র[৭৫]

খাদ্য পণ্য	টন প্রতি মূল্য (রুপি)	
	পূর্ববাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
ধান	৫১৮	৩৩৪
গম	৫১৭	২৬৭
বার্লি	৩৯৭	২১০
ছোলা	৩০৬	২১৭
চিনি	৬৩০	৫১৩

উপরের সারণিতে ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫২-৫৩ সালের গড় বাজার মূল্যের আলোকে পণ্যমূল্য নির্ধারিত হয়েছে। এখানে যে চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে সেখানে খুবই আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, পূর্ববাংলা প্রধান ধান উৎপাদকারী অঞ্চল হলেও ধানের দাম পাকিস্তানে কম। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান প্রধান গম উৎপাদনকারী অঞ্চল। এক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানে গমের দাম পূর্ববাংলার চেয়ে কম। এছাড়া বার্লি, চিনি, ছোলা প্রভৃতি নিত্য-পণ্যের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে।

পরিসংখ্যানের তথ্য দৃশ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র উপস্থাপন করে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, কেন্দ্রীয় রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় ঐ অঞ্চল অদৃশ্যমান অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। এসব কারণে ভারতে দেশত্যাগকারী মোহজেরদের মধ্যে যারা ব্যবসায়ী শ্রেণির ছিলেন তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে অভিপ্রয়াণ করে। আরও যেসব কারণে উন্নয়নের ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা পিছিয়ে পড়ে তা হলো ১৯৪৯ সালে ভারতের সাথে সমন্বয় করে মুদ্রামানের অবমূল্যায়ন না করায় পশ্চিমবঙ্গের সাথে চলমান বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৫২ সালে 'পাকিস্তান ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন' এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল আর্থিক এবং সামরিক-বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করায় পশ্চিম পাকিস্তানীরা এর সুবিধাভোগী হয়। পূর্ববাংলার অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগীতা ও বিদেশী বাণিজ্যে অভিজ্ঞতার অভাব, ১৯৪৮ সালে জেনারেল লাইসেন্সি ব্যবস্থা উন্মুক্ত করে দেওয়া, এতে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা বেশি সুবিধা ভোগ করে। লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার প্রতি বিমাতাসূলভ আচরণ, পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের প্রশাসনিক নৈকট্যের সুবিধা প্রাপ্তি, এবং প্রশাসনে পূর্ববাংলার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার ব্যবসায়িক প্রসারে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের দৃশ্যমান বাস্তবতাকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর জন্য অস্বস্তির কারণ হলেও লোকলজ্জার মাথা খেয়ে বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থা চালু রেখেছিল। এক্ষেত্রে তাঁরা লোক দেখানো কিছু আশাব্যঞ্জক কথা-বার্তা বলে জনগণের সাথে প্রতারণার আশ্রয় নিত। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন,

> If the past has not produced what was hoped for, no good will come from blinking the fact. Better far to find out where the error was and how it can be corrected. Some factors which led the unsatisfactory performance were outside our control; others were well within it. Both must be recognized as such, examined carefully and assessed critically. Self-knowledge remains for the nation, as the individual, the first step is wisedom.[৭৬]

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বক্তব্যে সত্য বেরিয়ে এসেছে। সত্যকে আস্বীকার না করে তিনি ভুল খুঁজে বের করে তা সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যের বাস্তব প্রতিফলন পরবর্তী পরিকল্পনায়

লক্ষ্য করা যায় কি? তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশকালেও তিনি একই পদ্ধতি অবলম্বন করে খুব ভাল ভাল কথা বলেছেন। তিনি এবারও পূর্ববর্তী পরিকল্পনার ভুল-ভ্রান্তি ভুলে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে সমতা বিধানের প্রচেষ্টার কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

> One of the fundamental objectives of our Policy is to bring about a better cohesion between East and West Pakistan in all fields of economic political and social. We are finally commited to eliminate disparities in percapita income in the shortage possible time and this has been made a specefic objective of the perspective plan. But process of national integration has to extend far beyond the economic field and must embrace all the phases of an individual life.[৭৭]

এই বক্তব্যের মধ্যেই অর্থনৈতিক বৈষম্যের বাইরে ভাষা সংস্কৃতিসহ সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিম বিভেদের বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় সমস্যা শুধু অর্থনৈতিক বৈষম্যই নয়। এর বাইরের জাতীয়তাবাদী চেতনার মুল জায়গাটিই নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। জেনারেল আইয়ুব খান পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য দূর করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংযোগ ও সংহতি বিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁদের দর্শনের দৈন্যতাটাই এখানে মুল সমস্যা। আইয়ুব খান অবশ্য পূর্ববাংলার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নয়নের সূচনা করেছিলেন। সেটিও ছিল তাঁর শাসন ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টা হিসেবে। তিনি ক্ষমতা দখল করার পর মানুষের মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য উন্নয়ন দশক ঘোষণা করেন।

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খান তাঁর প্রিয়ভাজন সেনাপ্রধান মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। ইতোমধ্যে পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়। পাকিস্তানের কাছে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার আর কিছু অবশিষ্ট থাকেনি। এরকম একটি পরিস্থিতিতে ১৯৭০ সালে চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ শাসকের পরিবর্তন ঘটালেও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ পাকিস্তানের রাজনীতির আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাস লক্ষ করছিলেন। রাজনৈতিক এ পরিস্থিতিতে অর্থনীতিবিদগণও আঞ্চলিক বৈষম্য প্রশ্নে এক একাডেমিক বিতর্কে লিপ্ত হন। মতবিরোধ এমন চরমে পৌঁছায় যে, দুই অঞ্চলের অর্থনীতিবিদগণ চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার রিপোর্ট পৃথকভাবে প্রদান করেন।[৭৮] পূর্ববাংলার অর্থনীতিদগণ অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে বরাদ্দ প্রদানের দাবি জানান। পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় কমিয়ে নয় কমিয়ে নয় বরং পূর্ববাংলার মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে বৈষম্য দূর করতে হবে বলে তাঁর মত দেন। তাঁদের যুক্তি অনুসারে পূর্ববাংলার মাথাপিছু আয় বাড়াতে যে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন সেই পদ্ধতিগত বিষয়ে একমত হননি। পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের গবেষণা মতেই মাথাপিছু আয় বৈষম্য ১শতাংশে কমিয়ে আনতে ৫০ বছর, ১.৫ শতাংশে ৩৫ বছর, ২ শতাংশে ২৮ বছর, ৩ শতাংশে ২০ বছর এবং ৪ শতাংশে কমিয়ে আনতে লাগবে ১৭ বছর সময়। [৭৯] কাজেই যে গতিতে বৈষম্য বাড়ছিল তাতে আঞ্চলিক বৈষম্যহীন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল সুদূর পরাহত।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকীর প্রথম বছরের জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। ৬৯'এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে প্রণীত বার্ষিক পরিকল্পনায় সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় বিচার এবং কল্যাণমূলক সেবা নিশ্চিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। পূর্ববাংলার সার্বিক উন্নয়নে কিছুটা অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। সব মিলে পূর্ববাংলার জন্য বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয় ৪,১৫০ মিলিয়ন রুপি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৩,৫৫০ মিলিয়ন রুপি। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের বরাদ্দবৃদ্ধি পায় মাত্র ১৫০ মিলিয়ন রুপি কিন্তু পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায় ১,৩৫০ মিলিয়ন রুপি শতকরা হিসেবে যা ৯০ শতাংশ।[৮০] এ তথ্য অতীতে পূর্ববাংলা প্রতি নিদারুণ বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে। পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলোতেও পূর্ববাংলার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করা হতো না। এখানেও একটি শুভঙ্করের ফাঁকি ছিল। নিচের সারণিতে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথা পিছু আয় বৈষম্য তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি-৭.১১ : পূর্ববাংলা-পশ্চিম পাকিস্তানের মাথা পিছু জিডিপি[৮১]

অর্থ-বছর	মাথাপিছু জিডিপি, পূর্ববাংলা	মাথাপিছু জিডিপি, পশ্চিম পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান-পূর্ববাংলা বৈষম্য অনুপাত	বৈষম্যের সূচক
১৯৫৯-৬০	২৬৯	৩৫৫	১.৩২	১০০
১৯৬০-৬১	২৭৭	৩৬৩	১.৩১	৯৭
১৯৬১-৬২	২৮৬	৩৭৬	১.৩১	১৯৭
১৯৬২-৬৩	২৭৭	৩৯৩	১.৪২	১১১
১৯৬৩-৬৪	২৯৯	৪০৮	১.৩৬	১১৩
১৯৬৪-৬৫	২৯৩	৪২৬	১.৪৫	১৪১
১৯৬৫-৬৬	২৯৫	৪২৭	১.৪৫	১৪১
১৯৬৬-৬৭	২৯০	৪৪৮	১.৫৪	১৬৯
১৯৬৭-৬৮	৩০৭	৪৬৮	১.৫২	১৬৩
১৯৬৮-৬৯	৩১২	৪৯০	১.৫৭	১৭৮
১৯৬৯-৭০	৩১৪	৫০৪	১.৬১	১৯১
এক দশকে বৃদ্ধির হার	১৭%	৪২%	-	-
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে বৃদ্ধি	৭%	১৮%	-	-

উপরের চিত্রে দু'টি (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালীন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন সময়ে জিডিপির গড় বৈষম্য ছিল ১০৫ টাকা যা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে বেড়ে দাঁড়ায় ১৬৩.৮ টাকায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার জনগণকে আশার আলো দেখানোর জন্য যত ভাল ভাল কথাই বলুন না কেন ফলাফল শূন্য। এই সারণিতে ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত এক দশকে দু'এক বছর ছাড়া ধারাবাহিকভাবে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৯-৬০ সালে মাথাপিছু জিডিপি'র বৈষম্য যেখানে ৮৬ টাকা ছিল ১৯৬৯-৭০ সালে এসে সেটি বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০ টাকা হয়েছে। মাথাপিছু জিডিপি'র পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর কোন প্রতিশ্রুতি বা পরিকল্পনাই কাজে আসেনি।

পূর্ববাংলার জন্য এমনিতেই কম বরাদ্দ করা হতো তার উপর নানা অজুহাতে পুরো অর্থ খরচ করা হতো না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্ধকৃত অর্থের চেয়ে ৮৪ কোটি টাকা কম ব্যয় করা হয়। অর্থ ছাড়ে বিলম্ব করা, বিদেশী অর্থ ও যন্ত্রপাতি যথাসময়ে না আসা ইত্যাদি এর জন্য দায়ী ছিল।[৮২] তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা র সময় সরকার বৈষম্য কমিয়ে একটি সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে কিন্তু বাস্তবে এর কোন প্রতিফলন লক্ষ করা যায়নি। এই পরিকল্পনার বেসরকারী খাতের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জন্য পূর্ববাংলার বরাদ্দ হতে ১ শত ৬ কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের বরাদ্দ প্রায় ৪১ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়।[৮৩] জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর পর্বে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জানান যে, শিল্পোন্নয়ন বাবদ ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সরকার পূর্ব্ব পাকিস্তানকে ৯২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা এবং পাকিস্তানকে ২৫৮ কোটি ৬ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করেন।[৮৪] এই অবস্থা সর্বত্র একইভাবে বিদ্যমান ছিল। পাকিস্তানের আইন সভায় আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে বহুসংখ্যক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।[৮৫] পূর্ববাংলার সদস্যগণ আঞ্চলিক বৈষম্য বিষয়ে জোরালো বক্তব্য প্রদান করে।[৮৬]

রাজনৈতিক অঙ্গনের বক্তব্যকে দেশ-বিদেশে বিশ্বাসযোগ্য করেছিল বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ গবেষণার মাধ্যমে বৈষম্যের চিত্রটি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তুলে ধরেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে এই বৈষম্যের প্রতিবাদে রাজপথের আন্দোলন সূচনা করেন।[৮৭] বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচি পরবর্তীকালে আওয়ামীলীগের কাউন্সিলে অনুমোদনের মাধ্যমে এটিকে দলীয় কর্মসূচিতে পরিণত করা হয়।[৮৮] বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা মূল ভিত্তি ছিল আঞ্চলিক বৈষম্য। আওয়ামী লীগ ৬-দফা প্রচারে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। ৬-দফা দাবীর মূল লক্ষ হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ। শেখ মুজিবের মতে, শুধুমাত্র পূর্ববাংলায় নয়, ৬-দফা'র মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের অনগ্রসর প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্যও দূর হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক রাজনৈতিক নেতা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার

উপায় হিসেবে ৬-দফা কর্মসূচিকে সমর্থন করেন।[৮৯] শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ পল্টনের জনসভায় বলেন, ১৯ বছরের তিক্ত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার পটভূমিকে ৬-দফা প্রণীত হয়েছে।[৯০] কাজেই এ থেকে বোঝা যায় আঞ্চলিক বৈষম্যই শেখ মুজিবকে ৬-দফা কর্মসূচি প্রণয়নে উৎসাহিত করেছিল যার মধ্যে বাঙালির মুক্তির পথ নিহিত ছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফার রাজনৈতিক বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করতে এগিয়ে এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একদল শিক্ষক। এদের বেশীরভাগই ছিলেন অর্থনীতিবিদ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমান, আখলাকুর রহমান, মুশাররফ হোসেন ডক্টর সাদিক প্রমুখ। এঁদের মধ্যে ডক্টর সাদিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নন। এসকল অর্থনীতিবিদদের 'টু-ইকোনমি' থিওরি অর্থনৈতিক অঙ্গনে সাড়া যাগায়। তাঁদের গবেষণায় উঠে আসে পশ্চিম পাকিস্তানীরা ক্রমাগতভাবে পূর্ববাংলাকে বঞ্চিত করে পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল ব্যয় বরাদ্দের মাধ্যমে উন্নয়নের উল্লম্ফন ঘটায়। 'এরা এক দেশ দুই অর্থনীতি'র আলোকে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস দাবি করেছিলেন।[৯১] ক্লাস-রুম এবং ক্লাস রুমের বাইরে, গবেষণায় এবং রাজপথের মিছিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে আঞ্চলিক বৈষম্য মূল প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। একই সাথে ৬-দফা নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর গণ-সংযোগ চূড়ান্ত জনমত গঠন করে। ৬-দফাকে বানচাল করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা মামলায় আসামী করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ছাত্র সমাজের সূচিত আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষকে একাত্ম করে।

পরিশেষে বলা যায় যে পূর্ববাংলা ছিল মূলত কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর একটি ভৌগোলিক অঞ্চল যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভূগোলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি কোনোভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পূর্ববাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করাটা একটি অপরিণত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত মাত্র। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা ধর্মীয় অনুভূতির অবাস্তব বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে। ফলে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের এ অংশের প্রতি কায়েমী শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বার্থ নিহিত থাকলেও দায়িত্ববোধের জায়গাটি ছিল খুবই সংকীর্ণ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববাংলার প্রতি অবচেতন মনে আবার কখনো কখনো সচেতনভাবেই ঔপনিবেশিক ধাঁচের অর্থনৈতিক নীতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববাংলা প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল। পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় কৃষি উৎপাদনে সেচ নির্ভরতা এখানে কম। এখানকার কৃষি ব্যবস্থা জনজীবন, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেরও প্রধান নিয়ামক। পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট হলেও এর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় কাছাকাছি। এছাড়া এ অঞ্চলে ভূমির উর্বরতা এবং জলবায়ুর

প্রভাবে প্রায় সারা বছরব্যাপী এর উৎপাদন ব্যবস্থা চলমান থাকে। বছরের প্রতিটি মৌসুম কোন না কোন ফসলে মাঠ থাকে পরিপূর্ণ থাকে। এতদসত্ত্বেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভৌগোলিক পুনর্বিন্যাস, রপ্তানী পণ্যের প্রচলিত বাজার হারানো, নিত্যপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া, হিন্দু পুঁজিপতি এবং ব্যবসায়ীক গোষ্ঠীর দেশত্যাগ এবং ভারতে পুঁজি স্থানান্তর, ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা প্রায় ভেঙ্গে পড়া এবং সর্বোপরি বিপুল সংখ্যক মোহাজের জনগোষ্ঠীর চাপ পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে। নতুন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সরকার দেশের পশ্চিমাঞ্চলের মত পূর্বাঞ্চলের প্রতি সমানভাবে নজর দেননি। বলা যেতে পারে, পূর্ববাংলা শুরু থেকেই উপেক্ষার শিকার হয়। এছাড়া অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামরিক ব্যয় বরাদ্দ দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকে বাধাগ্রস্ত করে। জনসংখ্যার অনুপাতে বাজেটে বরাদ্দ না রেখে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমানভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে বাজেটের সিংহভাগ খরচ করায় পূর্ববাংলার অর্থনীতি বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় শুরু থেকেই। আলোচ্য সময়ে প্রাকৃতিক আঁশ পাটের ব্যবহার বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত এবং এক নম্বর পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল ছিল পূর্ববাংলা। এছাড়া পাটের পাশাপাশি চামড়া ও চা রপ্তানী থেকে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতো। ফলে বাণিজ্যিক ভারসাম্য ছিল পূর্ববাংলার অনুকূলে। পূর্ববাংলাকে বঞ্চিত করে এই বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করে। যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে পূর্ববাংলায় শিল্পায়নের কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। পূর্ববাংলায় প্রথাগত কিছু ক্রেডিট সিস্টেম চালু থাকলেও আধুনিক মুদ্রা এবং ব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল। এখানে একটি মাত্র ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ছিল যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৯ সালে। এছাড়া অন্যান্য আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিকাশের ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা পশ্চাৎপদ অবস্থানে ছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারী নীতি পূর্ববাংলায় প্রতিষ্ঠান তৈরির ক্ষেত্রে অনুকূল ছিল না। যে কোনো রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় একটি উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনে কোন নীতি প্রতিফলিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে মন ভোলানো কিছু কর্মসূচি ও বরাদ্দ প্রস্তাব করা হলেও এর বাস্তবায়নের গতি ছিল মন্থর। উল্টো উন্নয়ন বরাদ্ধ খরচের ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার সক্ষমতার প্রশ্ন তোলা হত। পাকিস্তান শাসমামলে যতসামান্য শিল্প-কলকারখানার বিকাশ ঘটেছিল তাও মূলত কৃষিভিত্তিক। শিল্পের কাঁচামালের মূল যোগান আসত অভ্যন্তরীণ বাজার থেকেই। পুরো পাকিস্তান শাসনামল জুড়ে পূর্ববাংলার অর্থনীতিতে মূল অবদান ছিল কৃষির। আধুনিক রাষ্ট্রে শিল্পের অগ্রগতিই মূলত উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে। কিন্তু পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির কারণে জনগণের অধিকাংশই ছিল বেকার অথবা অর্ধ-বেকার। অর্থনৈতিক বঞ্চনার ধারণা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হতে কিছুটা সময় লাগে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন পাকিস্তানের আসল চেহারা উন্মুক্ত করে। পরবর্তীকালে অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র সামনে চলে আসে। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলে প্রথমবারের মত আঞ্চলিক

বৈষম্যের রাজনৈতিক প্রতিকারের বিষয়টি সামনে চলে আসে। এই কর্মসূচির ব্যাপক প্রচারণার ফলে মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি সংসদ বিতর্কে বৈষম্য ও বঞ্চনার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচিত হতে থাকে। সংবাদপত্রও অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র জোরালোভাবে প্রচার করে। এসব কারণে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের আস্থা এবং বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। সাধারণ মানুষের জাগরণ রাজনৈতিক আন্দোলনকে গতিশীল করে। জনগণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনভাবেই অর্থনৈতিক সমতা ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ফলে পূর্ববাংলার জনগণ ১৯৭১ সালে আরেকটি বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ আসলে জমিদারী প্রথা রোহিত হওয়ার ভিতর দিয়ে ভূমি-ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন সূচিত হয়। বৃটিশদের প্রবর্তিত জমিদারী প্রথা অনুযায়ী কৃষক ও সরকারের মাঝে অনেকগুলো মধ্যস্বত্বভোগী ছিল। এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রথম ১৯৪০ সালে 'রেভিনিউ কমিশন' চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বাতিল করার সুপারিশ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই সুপারিশ বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। ১৯৪৪ সালে 'বেঙ্গল এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি' ১৯৪০ সালের রিপোর্টকে সমর্থন করে। ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার আইন সভায় 'বেঙ্গল স্টেট এ্যাকুইজিশান এ্যন্ড টেনান্সি বিল' উত্থাপিত হয়। দেশভাগের কারণে সেটি পাশ হয়নি। স্বাধীনতার পর পূর্ববাংলা সরকার 'পূর্ববাংলা স্টেট এ্যাকুইজিশান এ্যন্ড টেনান্সি বিল ১৯৫০' পাশ করে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ১০৫ টি জমিদারী এস্টেটের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে ৪৩২ টি জমিদারী এস্টেট সরকার গ্রহণ করে। তবে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকার নানাভাবে বাধার সম্মূখীন হন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা হাইকোর্টে একটি মামলার কারণে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন স্থগিত করা হয়েছিল। ১৯৫০ সালের এ্যাক্ট অনুযায়ী ১ রুপির নীচে খাজনা হতে পারে সেরকম জমির বিভাজন রোহিত করা হয়। এই আইন প্রবর্তনের মধ্যদিয়ে মধ্যস্বত্বভোগীদের সরিয়ে কৃষক ও সরকারের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দ্রষ্টব্য- *The First Five Year Plan 1955-60*, Volume-II, Government of Pakistan Press, Karachi, 1956, p.123, 124, 131

২ *Statistical Abstract for District in East Bengal*, Provicial Stastical Board, Dhaka, 1950, p.19

৩ *Census of Pakistan, 1951*, Census bulletin.1, p.8

৪ *Statistical Abstract for District in East Bengal*, Provicial Stastical Board, Dhaka, 1950, p.29

৫ *Census of Pakistan, 1951,* Volume-1, Report & Table, p. 44

৬ *Census of Pakistan, 1961*, Census Bulletin No.1, p.14.

৭ এ. জি. স্টক (ভাষান্তর মোবাশ্বেরা খানম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি, ১৯৪৭-১৯৫১, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৮৬

৮ Census of Pakistan, 1951, Volume-3, East Bengal, Report & table, p. 12

৯ একল জেলার মধ্যে জলপাইগুড়ির মোট ৩,০৫০ বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে ৫২৫ বর্গমাইল পূর্ববাংলার অংশে পড়ে (৪২৪ বর্গমাইল দিনাজপুর জেলার সাথে যুক্ত হয়, ১০১ বর্গমাইল রংপুর জেলার সাথে যুক্ত হয়)। অবিভক্ত দিনাজপরে জেলার মোট ৪,০২৩ বর্গমাইলের মধ্যে ১,৪৫৫ বর্গমাইল এলাকা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরের সাথে যুক্ত হয় বাকি ২,৫৬৮ বর্গমাইলের এলাকা পূর্ববাংলার সাথে যুক্ত হয় (এর মধ্যে ২,১১১ বর্গমাইল দিনাজপুর অংশে এবং ৪৫৭ বর্গমাইল রাজশাহী জেলার সাথে যুক্ত হয়। মালদহ জেলার মোট ২,০০৪ বর্গমাইল এলাকা থেকে মাত্র ৬১৩ বর্গমাইল এলাকা পূর্ববাংলার (রাজশাহী) সাথে যুক্ত হয়। অবিভক্ত নদীয়ার মোট ২,৮৪১ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ১,৩৭১ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে কুষ্টিয়া জেলার জন্ম হয়। যশোর জেলার ২,৯২৩ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ২,৬০৩ বর্গমাইল এলাকা পূর্ববাংলায় এবং বাঁকিটা পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হয়। বিভাগপূর্ব আসামের সিলেট জেলার মোট ৫,৪৪৪ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ৪৮৮২ বর্গমাইল এলাকা পূর্ববাংলার সাথে যুক্ত হয়। দেখুন-*Census of Pakistan, 1951*, Vol. 3, p.25

১০ *Census of Pakistan, 1961*, Vol. 1, p.39

১১ *Statistical Abstract for District in East Bengal*, Provicial Stastical Board, Dhaka, 1950, p.9

১২ ঐ. পৃ. ১০

১৩ *Statistical Abstract for District in East Bengal, Provicial Stastical Board*, Dhaka, 1950, p.11

১৪ ১৯৩১ সালে পূর্ববাংলার জনসংখ্যা ৩৫.৬০ মিলিয়ন এবং ১৯৪১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪২.০৬ মিলিয়ন। সে হিসাবে ২০ বছরে জনংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৪৬ মিলিয়ন অর্থাৎ বার্ষিক গড় বৃদ্ধি ০.৩২ মিলিয়ন। বর্তমান সারণিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৮ সাল হতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার খাদ্য পরিস্থিতির একটি চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। (সারণিতে ভুলবশত ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ চিত্রে কলাম ৬-তে যথক্রমে ১,৯৩,০২০ স্থলে ১,৯৩০,২০০ এবং ৬,১৮,১৫৫ এর স্থলে ৬,১৮১,১৫৫ লক্ষ টন এবং ১৯৫২ সালের চিত্রে কলাম ৫-এ ৬৭,৮৭,৬০৫ এর স্থলে ৬৭,৮৮৭,৬০৫ টাইপ করা হয়েছে) দেখুন- *The Economic Emergence of Pakistan with special emphasia on East Pakistan,* Part-1, East Bengal Government Press, Dacca, 1954, Table-VII

১৫ 'কর্ডন' প্রথা সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বলেছেন, সরকার কর্ডন প্রথা চালু করেছিল। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় খাদ্য যেতে দেওয়া হত না। ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার লোক, খুলনা ও বরিশালে ধান কাটবার মরশুমে দল বেঁধে দিনমজুর হিসাবে যেত। এরা ধান কেটে ঘরে উঠিয়ে দিত। পরিবর্তে একটা অংশ পেত। এদের 'দাওয়াল' বলা হত।... যখন দাওয়ালরা ধান কাটতে গেল, তখন কেউ তাদের বাধা দিল না। এরা না গেলে আবার জমির ধান তুলবার উপায় ছিল না। একসাথে প্রায় সব ধান পেকে যায়, তাই তাড়াতাড়ি কেটে আনতে হয়। স্থানীয়ভাবে এত কৃষাণ একসাথে পাওয়া কষ্টকর ছিল। বহু বৎসর যাবৎ এই পদ্ধতি চলে আসছিল।... যখন তারা দুই মাস পর্যন্ত ধান কেটে তাদের ভাগ নৌকায় তুলে রওয়ানা করল...তাদের পথ রোধ করা হলো 'ধান নিতে পারবে না, সরকারের হুকুম', ধান জমা দিয়ে যেতে হবে, নতুবা নৌকাসমেত আটক ও বাজেয়াপ্ত করা হবে।... এরকম শত শত ঘটনা আমার জানা আছে। এদিকে ফরিদপুর, ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার অনেক নৌকা ব্যবসায়ী ছিল যারা বড় নৌকায় করে ধান চাউল ঐ সমস্ত জেলা থেকে এনে বিক্রি করত, তাদের ব্যবসাও বন্ধ হল এবং অনেক লোক নৌকায় খেটে খেত তারাও বেকার হয়ে পড়ল'। দ্রষ্টব্য- শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস

লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১০৩-১০৪, কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান কৃষকদের সংগঠিত করেছিলেন, খুলনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো ঘেরাও করে দাওয়ালদের ধান বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার দাবী জানিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের গোয়ন্দা সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'On 28.1.49 the subject (Sheikh Mujibur Rahman) addressed a gathering of about 350 paddy reapers of Faridpur, Dacca, and Comilla at Khulna. He also led them in a procession to the D.M.'s bunglow for demanding permits for carrying their earned paddy to their house. As the D.M. did not issue such permits, he adviced the reapers not to visit Khulna again for reaping paddy'. see- *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*, Volume-1, 1948-1950, p. 152

১৬ *Budget of the Central Government of Pakistan, 1947-48* (15th August to 31st March) to 1951-1952, p. 6-7

১৭ Dr. S. A. Meenai, *Banking System of Pakistan*, Printed at the State Bank of Pakistan Press, Karachi, 1964, P.17, J. Russel Andrus, Ph.D. and Azizali F. Mohammed, The Economy of Pakistan, Oxford University Press, London, Karachi, Dacca, 1958, P.422

১৮ A. Sadeque, *The Economic Emergence of Pakistan (with special emphasis on East Pakistan)* Part I, East Bengal Government Press, Dacca, 1954, p. Table- IV

১৯ Assembly Proceedings official Report, East Pakistan Assembly, Second Session 1957, 21st to 24th September, 1957, East Pakistan Government Press, Dacca, p. 72

২০ *দৈনিক আজাদ*, ১৯ নভেম্বর, ১৯৬৩

২১ পূর্ববাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ শহরে সববাস করতেন এবং তাঁদের অধিকাংশই ব্যবসা করতেন। এর একটি বড় প্রমাণ হলো পূর্ববাংলার তিনটি প্রধান শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনার জনসংখ্যার তুলনা করা। ১৯৫১ সালে এই তিনটি শহরের জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার, ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার এবং ১ লক্ষ ২৮ হাজার। ১৯৬১ সালের আদম শূমারী অনুযায়ী এই তিনটি শহরের জনসংখ্যা কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার, ২ লক্ষ ৯৪ হাজার এবং মাত্র ৪২ হাজারে। যদিও ১৯৫১ সালের শূমারীতে ক্যাম্প-এ অবস্থানকারী মোহাজের জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত ছিল তথাপি ধারণা করা যায় এই অবনমন এর একটি বড় কারণ হিন্দু জনগোষ্ঠীর দেশ-ত্যাগ। দেখুন- *Census of Pakistan, 1961*, Census Bulletin No.1, p. 13

২২ *Constituent Assembly of Pakistan (Legislature)* CAP Vol. 1 (3) 28-29 February, 1948

২৩ A. Sadeque, *The Economic Emergence of Pakistan, with special emphasis in East Pakistan*, Part- 1, Bengal Government press, Dacca, 1954, p. 23-24

২৪ Muhammad Ghulam Kabir, *Minority Politics in Bangladesh* House, Vikas Publising house PVT. LTD, 1980, 2

২৫ *Census of Pakistan, 1951*, census bulletin-2 (Population according to religion , Table-6)

২৬ *Census of Pakistan, 1951*, Vol. 1(Report & Tables) p. Statement 2-F (Reference paragraph 2.9)

২৭ J. Russel Andrus, Ph.D. and Azizali F. Mohammed, *The Economy of Pakistan,* Oxford University Press, London, Karachi, Dacca, 1958, p.404

২৮ *Budget of the Central Government of Pakistan, 1952-53*, p.12

২৯ A. Sadeque, *পূর্বোক্ত*, পৃ. Table- IX

৩০ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট প্রকাশিত প্রথম গেজেটের মাধ্যমে ৭ জন মন্ত্রী নিয়োগ প্রদান করা হয় এর মধ্যে একজনমন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান পূর্বপাকিস্তান থেকে মনোনীত ছিলেন। একই দিন প্রকাশিত দ্বিতীয় গেজেটের মাধ্যমে মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন করা হয়। অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয় পাঞ্জাবী আমলা গোলাম মোহামদকে। পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে তা নতুন রাষ্ট্রের প্রথম দিন প্রতিভাত হয়। বড় ধরনের বৈষম্যমূলকভাবেই পাকিস্তানের মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়। দেখুন- জি অ্যালানা, *পাকিস্তান আন্দোলন: ঐতিহাসিক দলিলপত্র*, (অনুবাদ, কে এম ফিরোজ খান), খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৫৯-৩৬০

৩১ *Budget of the Central Government of Pakistan, 1947-48* (15th August to 31st March) to 1951-1952, p. 27

৩২ Anwar Iqbal Qureshi, Economic Adviser to the Government of Pakistan, Ministry of Finance, Rawalpindi, *Pakistan Budgets,* Government of Pakistan Press, Karachi, 1964, p. 20

৩৩ *Budget of the Central Government of Pakistan, 1947-48* (15th August to 31st March) to 1951-1952, p. 62

৩৪ *Budget of the Central Government of Pakistan*, 1952-53, p.11

৩৫ *Budget of the Central Government of Pakistan, 1955-56*, p.1

৩৬ ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্র ও প্রদেশের দায়িত্ব ও কর্তব্যের নিরীখে রাজস্ব বরাদ্দের পদ্ধতি নিরূপনের জন্য অবিভক্ত ভারত সরকারের সাবেক অর্থ-সদস্যকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি যে রিপোর্ট প্রদান করেন সেটি 'Raisman Award' নামে পরিচিত। দ্রষ্টব্য- *Pakistan Budgets*,Economic, Ministry of Finance, Government of Pakistan press, Karachi, 1964, পৃ. ৩

৩৭ *Pakistan Budgets*,Economic, Ministry of Finance, Government of Pakistan press, Karachi, 1964 পৃ. ৪৫

৩৮ এ. জি. স্টক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭

৩৯ *Pakistan Budgets, 1967-68,* Government of Pakistan, Ministry of Finance, Islamabad,1967, p. 270- 71, 272-73, 274-75, 278-79, 780-81, 282-83 (Table: 5, 6, 7, 9, 10, 11)

৪০ A. Sadeque, *পূর্বোক্ত*, পৃ. Table- IX

৪১ *The Fourth Five Year Plan 1970-75,* Volume-I, Islamabad, 1970, p. 26

৪২ *Statistical Digest of East Pakistan,* No. 5, Government of East Pakistan, Published by East Pakistan Bureau of statistics, Dacca, p. 186-87

৪৩ *দৈনিক আজাদ* ৩ আগস্ট, ১৯৬৪

৪৪ A. Sadeque, *পূর্বোক্ত*, পৃ. Table- V

৪৫ *Statistical Digest of East Pakistan* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫

৪৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে শিলাইদহে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে সুধীর সেন বলেন "Silaidah in the district of Nadia was selected as the centre for his experiment. A part of nucleus for rural was already available there. An agricultural bank had been founded (In1300 B.S. 1893-94 A. D.) to advance loans particularly seasonal to the cultivators on reasonable rates of interest.) শিলাইদহ কৃষি ব্যাংক স্থাপনের ১১ বছর পরে পতিসরেও তিনি ১৯০৫ সালে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। কৃষি ব্যাংক স্থাপনের জন্য তিনি তাঁর ধনী বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে সহযোগীতা নিয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরুস্কার পেলে এই পুরুস্কারের সমুদয় অর্থ (১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা) পতিসর কৃষি ব্যাংকে জমা দেন। দ্রষ্টব্য- Sudhir Sen, Rabindranath Tagore on rural reconstraction, Calcutta, p. 93, ড. আনোয়ারুল করিম, রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ, মনন প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮ পৃ. ৬৩, ১৫৯, অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের সমাজচিন্তা, প্রফেসর শফিকুর রহমান স্মারক বক্তৃতা ২০১৮, বাংরাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ৬ জুলাই ২০১৯ পৃ. ৮

৪৭ *The First Five Year Plan 1955-60,* Volume-II, Government of Pakistan Press, Karachi, 1956, p. 95

৪৮ Report on The Rural Credit and Rural Unemployment in Pakistan 1956, Dhaka University Socio-Economic Survey Board, Dhaka, 1956, p. 57

৪৯ ১৯২০ সালে বোম্বে, বেঙ্গল ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাংক একত্রিত করে 'দি ইমপিরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এই ব্যাংক ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করত। ১৯৩৫ সাল থেকে 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' সরকারের ব্যাংকিং কার্যক্রমের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে।

৫০ Statistics on Scheduled Banks in Pakistan, State Bank of Pakistan Department of Statistics, 1963, Karachi, p. 3

৫১ J. Russel Andrus, Ph.D. and Azizali F. Mohammed, *The Economy of Pakistan*, Oxford University Press, London, Karachi, Dacca, 1958, p. 375

৫২ Dr. S. A Meenai,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩-৪

৫৩ Statistics on Scheduled Banks in Pakistan, State Bank of Pakistan Department of Statistics, 1963, Karachi, p. 2, J. Russel Andrus, Ph.D. and Azizali F. Mohammed, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৬

৫৪ ঐ. পৃ. ৩৯০

৫৫ State Bank of Pakistan *Bulletin*, February, 1956, cited in J. Russel Andrus, Ph.D. and Azizali F. Mohammed, *The Economy of Pakistan,* Oxford University Press, London, Karachi, Dacca, 1958, p. 391

৫৬ *দৈনিক আজাদ*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৬৩

৫৭ *দৈনিক আজাদ*, ১৯ নভেম্বর, ১৯৬৩

৫৮ W. Nelson Peach, Ph.D. et. al. *Basic Data of the Economy of Pakistan*, Oxford University Press, Karachi, 1959, p. ১১৭

৫৯ *ঐ*. পৃ. ১১৬

৬০ *দৈনিক আজাদ*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৬৩

৬১ *The First Five Year Plan 1955-60*, Volume-II, Government of Pakistan Press, Karachi, 1956, p. 95

৬২ Dr. S. A Meenai, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

৬৩ J. Russel Andrus, Ph.D. and Azizali F. Mohammed, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৮

৬৪ *The First Five Year Plan 1955-60,* পূবোক্ত, পৃ. ৯৬

৬৫ Dr. S. A Meenai, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১

৬৬ W. Nelson Peach, Ph.D. et al, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬

৬৭ কমিটি মতামতে বলেন যে, "that though certain targets in different fields have been laid down, they have not been considered in relation to the overall resources and requirements, and consideration and approval of schemes has proceeded essentially on an *ad hoc* basis...[The committee thought that]... initially this was anavoidable and did not prove harmful, because the field of development was so large and the needs so obvious that any project was bound to bring in substantial benefits... [However]...more orderly and integrated planning should be done than hitherto. For the successful procecution of the development programme... an adequate and efficient planning organization is essential. see *Report of the Economic Appraisal Committee*, p. 174 and 203, in Albert Wasterston, *Planning in Pakistan: Organization and Implimentation,* Johns Hopkins Press, Baltimore, 1963, p. 20

৬৮ *The Fourth Fiv Year Plan 1970-75,* Volume-I, Islamabad, 1970, p. 26

৬৯ *The Pakistan observer*, 10 January, 1957

৭০ *The First Five Year Plan 1955-60,* Volume-II, Government of Pakistan Press, Karachi, 1956, p. i

৭১ Mahbub UL Haq, *The Strategy of Economic Planning: A case Study of Pakistan*, Oxford University Press, Karachi, Lahore, Dacca, 1963, PP.98-99 (Table-15)

৭২ *The Fourth Five Year Plan 1970-75*, Volume-I, Islamabad, 1970, PP. 25, 29 (Table- 2 & 3)

৭৩ Md. Anisur Rahman, *East and West Pakistan: A Problem in the political Economy of Regional Planning*, p. 15

৭৪ Mahbub Ul Haq, *The Stratagy of Economic Planning: A Case Study of Pakistan*, Oxford University Press, Karachi, Lahore, Dacca, 1963, p. 92

৭৫ ঐ. পৃ. ৯৩

৭৬ *Planning Commission, Objective of the Scond Five Year Plan*, p. i (in planning in pakistan Albert weterson p.2)

৭৭ *The Third Five Year Plan 1965-70*, Government of Pakistan Press, Karachi, 1967, p.VI

৭৮ রিপোর্ট জমাদানকালে প্যানেল চেয়ারম্যান মাজহারুল হক প্লানিং ডিভিশনের সেক্রেটারীকে লেখেন, 'I have the honour to enclose two reports prepared by the pannel of economists constitued by you to examine the outline of the Fourth-Five-Year Plan. The pannel held five meetings jointly at Islamabad, Dacca, Karachi. Since agreement could not be reached on a number of issues, it was decided that the two separate reports should be prepared and submitted. See- *The Fourth Five Year Plan 1970-75*, Volume-I, Islamabad, 1970, pp. 9

৭৯ ঐ. পৃ. ১১২

৮০ *Annual Plan 1970-71,* Planning Commission, Government of Pakistan, p. 2

৮১ *The Fourth Five Year Plan 1970-75*, Volume-I, Islamabad, 1970, PP. 22 (Table- I)

৮২ *দৈনিক আজাদ*, ২৮ আগস্ট, ১৯৬৭

৮৩ *দৈনিক আজাদ*, ২৪ মে, ১৯৬৮

৮৪ *দৈনিক আজাদ*, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৩

৮৫ পাকিস্তানের গণ-পরিষদের ১০ আগস্ট ১৯৪৭ সাল থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত '*Constituent Convention*' হিসেবে পরিচিত ছিল। এটি ছিল পাকিস্তানের প্রথম গণ-পরিষদ, পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণ-পরিষদ *'Constituent assembly'* নামে ৭ জুলাই ১৯৫৫ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। সংবিধান প্রণয়নের পর ১৯৫৬ সালের প্রথম সংবিধান বহাল থাকাকালে ইহা *'National assembly'* নামে ২৩ মার্চ ১৯৫৬ থেকে ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ এবং দ্বিতীয় সংবিধান প্রণয়নের পর ৮ জুন ১৯৬২ থেকে ২৪ মার্চ ১৯৬৯ পর্যন্ত বহাল ছিল।

৮৬ পাকিস্তান গণ পরিষদে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত যেসকল অধিবেশন চলেছে তাতে সর্বমোট প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে ৩২,৯১০টি। এসকল প্রশ্নের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য সংক্রান্ত প্রশ্ন ছিল ১১,৩৬০টি যা মোট প্রশ্নোত্তরের প্রায় ৩৫ শতাংশ। বিস্তারিত দেখুন- মোঃ হাবিবউল্লাহ্ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯): পার্লামেন্টের ভাষ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১২১-১২৪

৮৭ লাহোরে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা কালে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের অনুকূল ছয় দফা দাবী ভিত্তিক একটি প্রোগ্রাম বিবেচনা তো হয়নি, এমনকি আলোচনা পর্যন্ত করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে'। *দৈনিক আজাদ*, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

৮৮ ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগের ওয়ার্কি কমিটির সভায় এবং ১৯ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করা হয় এবং এই কর্মসূচিকে আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। দ্রষ্টব্য- *দৈনিক ইত্তেফাক* ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ এবং ২০ মার্চ ১৯৬৬

৮৯ কায়েদে আজম মুসলিম লীগ প্রধান খান আবদুল কাইয়ুম খান ১৪ জুন পূর্ব পাকিস্তানের দাবীর প্রতি সমর্থন করেন- আজাদ ১৫ জুন, ১৯৬৭, জাস্টিস পার্টি প্রধান এয়ার মার্শাল আজগর খান ১৯৬৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বেগম মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ইফতার পার্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে প্রচুর টাকা খরচ হইয়াছে বলে জেনারেল আইয়ুব খান যে বক্তব্য প্রদান করেছেন, তাকে তিনি ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে মন্তব্য করেন- আজাদ, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৬৮। এছাড়া ১৯৬৮সালের ১৪ ডিসেম্বর করাচী আওয়ামী লীগ সম্মেলনে শেখ মুজিব প্রণীত ছয় দফা কর্মসুচির বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে বলে ঘোষণা করা হয়- দৈনিক আজাদ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

৯০ *দৈনিক ইত্তেফাক* ২১ মার্চ ১৯৬৬

৯১ খান সারওয়ার মুরশিদ, কালের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৫, Rehman, Sobhan, From Two Economies To Two Nations: My Journey to Bangladesh, Daily Star Books, Dhaka, 2015, p. II-III

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

বর্তমান অভিসন্দর্ভে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে কোনো অঞ্চলের সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মকে কয়েক বছর অথবা কয়েক দশকের তথ্যাবলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুরোপুরি অধ্যয়ন করা একবারেই অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে একটি আংশিক চিত্র উপস্থাপিত হতে পারে মাত্র। কেননা বহুদিনের চর্চার ফলে সামাজিক রীতিনীতি বা প্রথা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যা ঐ নির্দিষ্ট সমাজের মানুষের হৃদায়ানুভূতির গভীরে স্থান করে নেয়। এভাবেই তৈরি হয় একটি জাতির রুচি ও মূল্যবোধ। রাষ্ট্রীয় আইনের চেয়েও সমাজাচারের প্রতি অধিবাসীদের অনুভূতি থাকে প্রবল । রাজনৈতিক ইতিহাস যেমন কোনো নির্দিষ্ট সময় ও ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; অন্যদিকে সামাজিক ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি অতীতের চলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও রীতিনীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। একেবারে নির্ধারিত সময়ের মাপকাঠিতে কোনো সমাজকে সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। সে কারণে এই গবেষণার সময়কাল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অতীত ঐতিহ্যকেই তথ্য-উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আবার এ কথাও সত্য যে, কোনো সমাজের রাজনৈতিক ঘটনাবলি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনার পেছনে এক একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতি মূল্যবোধ চলক হিসেবে কাজ করে। বর্তমান গবেষণায় অনুসন্ধানের মূল বিষয় ছিল, ধর্মীয় ঐক্যগত চেতনাকে ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলেও এই রাষ্ট্র সৃষ্টির মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান করা। আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এই অনুধ্যানের পেছনে কাজ করেছিল। যেমন, বাঙালির রাজনৈতিক জাগরণের পেছনে কোন্ কোন্ জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছিল? এছাড়া

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাবলি আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলি দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তা নিরীক্ষা করা।

প্রতিপাদ্য বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করে পূর্ববর্তী সাতটি অধ্যায়ের বিভিন্ন শিরোনাম ও উপ-শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। এই অনুসন্ধানের প্রাপ্ত ফলাফল নিচে উপস্থাপন করা হলো:

এক

পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনা সৃষ্টির প্রধান অন্তরায় এর ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে নিহিত। একদিকে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত হওয়ায় আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে অভিন্ন সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল না। এই সীমাবদ্ধতার খানিকটা কাটিয়ে ওঠা হয়তো সম্ভব হতো যদি রাষ্ট্র তার সকল অংশের প্রতি সমতা ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে নীতি এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতো। এক্ষেত্রে এ অঞ্চলের স্বাধীনতা হয়তো কিছুটা বিলম্বিত হতো। এখানে লক্ষ্যণীয় হলো যে, রাষ্ট্রযন্ত্র ও শাসকগোষ্ঠী নিজেরাই একটি পক্ষভুক্ত হয়ে যায়। ফলে যে সকল মৌলনীতির ভিত্তিকে একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তা এখানে ক্রিয়াশীল ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ববাংলার ভৌগোলিক অঞ্চলকে ধারণ করেছিল পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক শাসনের ধারাবাহিকতায় এ অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতির অপার সম্ভাবনাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে কাজে লাগানোর জন্য। কিন্তু এর অধিবাসীদেরকে তাঁরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেনি তথাকথিত উদ্ধত জাতিগত দাম্ভিক মনোভাবের কারণে। অন্যদিকে পূর্ববাংলার অধিবাসীরাও পাকিস্তান রাষ্ট্র বা শাসকগোষ্ঠী বা অধিবাসী কোনটিকেই মেনে নেয়নি স্বাভাবিক কারণেই।

দুই

অন্যদিকে পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলের মাঝখানে তৃতীয় একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ যেন এর দুটি অঞ্চলের অধিবাসীদের মিলনের পথে এক অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া এবং অবাধ মেলামেশা অধিবাসীদের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ চেতনার জন্ম দেয়। পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এ সুযোগ ছিল একেবারেই সীমিত। বার'শ মাইলের আকাশ পথ অথবা প্রায় তিন হাজার মাইলের সমুদ্র পথের ভৌগোলিক দূরত্বের চেয়েও এ দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব ছিল ঢের বেশি। আবার উভয় অঞ্চলে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল একদিকে ব্যয়বহুল অন্যদিকে সময়সাপেক্ষ। পূর্ববাংলার অধিবাসীরা পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদেরকে 'পাকিস্তানী' বলে মনে করত অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা পূর্ববাংলার অধিবাসীদের পাকিস্তানী হিসেবে না ভেবে 'বাঙালি' হিসেবে ভাবত।

শুধু কি তা-ই, এই উভয় শব্দের মধ্যে একটি নেতিবাচক বা ঘৃণাসূচক ব্যঞ্জনা নিহিত ছিল। এছাড়া বাঙালির স্বাতন্ত্র্য চেতনা নতুন নয়। সুলতানী ও মোগল আমলের ঐতিহাসিকগণও ভৌগোলিক কারণে এ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে বর্ণনা করেছেন। উভয় অংশের অধিবাসীদের ভৌগোলিক দূরত্ব এবং সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে অধিবাসীদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রাজনৈতিক কারণে সাময়িকভাবে গড়ে ওঠা ধর্মীয়-রাজনৈতিক (religio-political) ঐক্যগত চেতনা এক বছরও টেকেনি।

তিন

পূর্ববাংলার সামাজিক কাঠামো পশ্চিম পাকিস্তানের অনুরূপ নয়। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সমন্বয়ে এখানে একটি কাঠামোবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। এই সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল প্রথা ও ঐতিহ্য। পূর্ববাংলার অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষক অথবা যাঁরা ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তাঁরাও কোনো না কোনোভাবে কৃষক পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই সূত্রে সমাজের সবচেয়ে বড় অংশটি অভিন্ন মানবীয় অনুভূতি ও ঐক্যবদ্ধ সামাজিক জীবনের অংশীদার। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তাঁরা ছিল সর্বদা একাট্টা। পেশা এবং জীবন ধারণের সাধারণ উৎস ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই সামাজিক ঐক্য বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল।

চার

রাজা-প্রজা ধারণার প্রতীক জমিদার শ্রেণির অভিজাততন্ত্রের পতনের ফলে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের খুব একটা পরিবর্তন না হলেও তাঁদের মনজগতে প্রজাসূলভ নিঃশর্ত আনুগত্যের স্থলে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকারের ধারণা বিকশিত হতে শুরু করে। ব্রিটিশ শাসনের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণিতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না বললেই চলে। একই কথা প্রযোজ্য আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে। এসকল কারণে পূর্ববাংলা তার রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। পূর্ববাংলার অধিবাসীদের রাজনৈতিক সক্ষমতা নিয়ে পাকিস্তানীদের তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব গোপন থাকেনি। অন্যদিকে পূর্ববাংলা ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় অবস্থান ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। দেশভাগের ফলে বাঙালি হিন্দুদের ব্যাপকহারে বাস্তুত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থান পূরণ করে অবাঙালি মুসলিম ব্যবসায়ীরা। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এই অঙ্গনেও পূর্ববাংলার প্রাপ্য অংশীদারিত্ব যথাযথ ছিল না। ব্যবসায়ীক গোষ্ঠীর লোকেরা রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি প্রভাব বলয় তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রভাবের ফলে অর্জিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুনাফা পশ্চিম পাকিস্তানের হিসাবকেই স্ফীত করেছিল। অংশীদারিত্ববিহীন এই

সমাজ ব্যবস্থা পূর্ববাংলার অধিবাসীদের মধ্যে বঞ্চনা বোধের জন্ম দেয় যা পৃথক বাঙালি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

পাঁচ

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের ফলে পূর্ববাংলায় একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণকারী কৃষক পরিবারের সন্তানরাই মূলত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ধারায় এ পর্যায়ে এসে পরিবর্তনের সূচনা হয়, যার নেতৃত্ব দেয় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এর সাথে যুক্ত হয় সাধারণ বলে খ্যাত কৃষক-শ্রমিক ও অন্যান্য উৎপাদক শ্রেণির মানুষ। পূর্ববাংলার জনগণের অধিকাংশই এই শ্রেণিভুক্ত। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এই শ্রেণি সম্পর্কে অবজ্ঞার সীমা ছিল না। কিন্তু অবশেষে দেখা গেল এরাই পূর্ববাংলার রাজনৈতিক শক্তির প্রধান উৎস। এই শ্রেণিকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে মূল ভূমিকা পালন করে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই পরিবর্তনের অনেকগুলো প্রতিকী সূচক লক্ষ করা যায়। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক পূর্বতন রাজনৈতিক দল কৃষক-প্রজা পার্টির নাম পরিবর্তন করে কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠন, জনগণের দল আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির প্রতীকি গুরুত্ব আছে। প্রজা শব্দের মধ্যে প্রভুত্বের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ব্যঞ্জনা নিহিত ছিল। কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠনের মধ্য দিয়ে অন্ধ আনুগত্যের ধারণাগত মনস্তত্ত্বের স্থলে শ্রেণি-অধিকার কেন্দ্রিক ধারণার জন্ম লাভ করে। যদিও এই রাজনৈতিক দলটি ব্যক্তি কেন্দ্রিক নেতৃত্বের কারণে ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের বিজয়কে রাজনৈতিক পুঁজিতে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে এই দলটিও অল্পদিনের মধ্যে মুসলিম লীগের পরিণতি বরণ করে। রাজনৈতিক এই ঘাটতি পূরণ করে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ শব্দের অর্থ জনগণের লীগ বা সংঘ। এর মাধ্যমে রাজনীতিতে জনগণের মালিকানার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পূর্বে রাজনীতি শব্দটির মধ্যে শুধুমাত্র ওপর তলার মানুষের অংশ গ্রহণের ধারণা বিদ্যমান ছিল। সাধারণ মানুষ ছিল আবশ্যিকভাবে তাদের যোগানদাতা। সাধারণ মানুষের জাগরণের মধ্য দিয়ে তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির প্রতি অন্ধ আনুগত্যের দিন শেষ হয়। জাতীয় পরিষদে অনেক আসন ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে জমিদার শ্রেণির প্রতিভূ খুররম খান পন্নী সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি শামসুল হকের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আর কোনো উপনির্বাচনের দিকে পা বাড়ায়নি। তাঁদের মধ্যে একটি নির্বাচনভীতি ঢুকে গিয়েছিল। অবশেষে জনগণের আন্দোলনে বাধ্য হয়ে ১৯৭০ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর পর সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হলে সেই নির্বাচনে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক উত্থান সূচিত

হয় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। বাস্তবিক পক্ষে এটি ছিল পাকিস্তানী কফিনে শেষ পেরেক। আর এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় জনগণের মাঝ থেকে উঠে আসা গণ-মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সাধারণ মানুষের দল আওয়ামী লীগের ব্যানারে এটি সংঘটিত হয়। জনগণের দল জনতার মুক্তি এনে দিল সাধারণের মিছিল থেকে উঠে আসা এক অসাধারণ নেতার নেতৃত্ব। সাধারণ জনগণের মাঝেই পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদী শক্তির ভিত্তি নিহিত ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণে সাধারণ মানুষের বিক্ষিপ্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। এভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তিনি তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে।

ছয়

পূর্ববাংলা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জাতি,ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নৃ-গোষ্ঠীর মানুষকে অবাধে তার সমাজে একীভূত করে নিয়েছে। এখানে শক-কূষাণ, হুণ, ভোট-চীনা, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মোগল, পাঠান, শিখ, উজ্বেগ, আরমানী, ইংরেজ, পর্তুগীজ,ওলন্দাজ, মারাঠী, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, মুলতানী, কাশ্মিরী, মাড়োয়ারী, উচ্চ বর্ণ, দলিত, শিয়া, সুন্নি, কাদিয়ানী, মগ, ফিরিঙ্গি, আদিবাসী, উপজাতি নির্বিশেষে সবার স্থান হয়েছিল। এদিক থেকে এখানে একটি বহুত্ববাদী (pluralistic) সংস্কৃতির বিকাশ লাভ করে। কালের পরিক্রমায় এসকল মানবগোষ্ঠী ভাষাভিত্তিক বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে বিলিন হয়ে একটি সমপ্রকৃতির (homogenous) সমাজ বিনির্মাণ করে। পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তি হলো এই বাঙালি সংস্কৃতি। বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উদার নৈতিকতা ও সমন্বয়বাদ। এর মূল সুর হলো 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও'। এখানকার মুসলিমদের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত। কাজেই ধর্ম নির্বিশেষে অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালী, সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতিতে ভিন্নতা খুব একটা ছিল না। পাকিস্তানী শাসকরা পূর্ববাংলার সমন্বয়বাদী দর্শনের বিপরীতে পূর্ববাংলা থেকে হিন্দু ধর্মবলম্বীদের বিতাড়নের যে ভেদনীতি গ্রহণ করেছিল তা বাঙালির অসাম্প্রদায়িক ও ঐক্যগত চেতনাকে আন্দোলিত করে। বাঙালিকে হিন্দু ও মুসলিম হিসেবে বিভাজনের এই নীতি এদেশের অধিবাসীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এখানে ক্রমবিবর্তন আর ঐতিহ্যের ধারায় উন্নত-সমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ লাভ করেছিল। দীর্ঘদিনে গড়ে ওঠা হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা এবং বাঙালির অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও উন্নত সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে দুর্বল করে পাকিস্তানী ভাবধারার সংস্কৃতি নির্মাণের পাকিস্তানী প্রচেষ্টায় বাঙালিরা আরও বেশি করে ঐক্যবদ্ধ হয়। এভাবে বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনা জাতীয়তাবাদী চেতনায় রূপান্তরিত হয়।

সাত

বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক চর্চা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। বাঙালির সাংস্কৃতিক ধারার চর্চা, প্রচার ও প্রসারের কয়েকটি দিক লক্ষ করা যায়। পৌষ-পার্বন, বর্ষবরণ, মেলা, যাত্রাপালা, কবিগানের আসর, পিঠা-পুলি উৎসব, গ্রামীণ বিনোদন ইত্যাদি বাঙালি সংস্কৃতির আবহমান ধারা। পাকিস্তানী ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির জোয়ারে পূর্ববাংলার আবহমান সাংস্কৃতিক চর্চায় কিছুটা ধাক্কা খায়। ভাষা ও সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার প্রতিবাদী ধারার সূচনা হয়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এর সূচনা হয়। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়কে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয় তার মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এ সময়ে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হতে থাকে। এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্রমান্বয়ে সর্বস্তরের মানুষের সংযোগ হয়। ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী শহীদ মিনার কেন্দ্রিক যে সাংস্কৃতিক ধারার সূচনা হয় সেখানে নারীদের অংশ গ্রহণ একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে যা বাঙালির আত্মজাগরণের সংগ্রামকে পূর্ণতা দান করে। ভাষা আন্দোলনের বাইরেও ভাষাকে কেন্দ্র করে জাগরণের আরেকটি দিক আছে। সেটি হলো ভাষা সংস্কারের নামে ভাষার সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সর্বস্তরের বাংলা ব্যবহারের প্রচারণা এবং বাংলাভাষার চর্চা ও প্রতিবাদী সাহিত্য রচনায় মধ্য দিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনাকে আরও শাণিত করে। প্রকারন্তরে ইহা জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপ পরিগ্রহ করে।

আট

পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পূর্ববাংলায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের আত্ম প্রকাশ ঘটে। যেমন- বাংলা একাডেমী, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, নজরুল একাডেমী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পরিবেশনা শিল্পের বিকাশ বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাফা, ছায়ানট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান পরিবেশনা শিল্পকে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। বিশেষ করে পাকিস্তানী শাসনের ধর্মীয় উন্মাদনায় বাঙালির আবহমান সংস্কৃতি চর্চা যখন ম্রিয়মান সেই সময়ে ছায়ানটের উদ্যোগে বাংলা বর্ষবরণের সার্বজনীন এই উৎসব প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। গ্রামীণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য এই সাংস্কৃতিক ধারাকে নাগরিক জীবনের সাথে একীভূত করে। বর্ষবরণ বাঙালির সবচেয়ে বড় সার্বজনীন উৎসব। বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে মেলা, হালখাতা, যাত্রাপালা, কবিগানের আসর, লাঠিখেলা, পালাগান, সার্কাস, ভোজবাজীর যে আয়োজন হতো তাঁর মধ্যে বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনার আসল রূপ লুকিয়ে ছিল। সংস্কৃতির এই অসংগঠিত উপাদানকে সংগঠিত শক্তিতে রূপান্তরিত করে ছায়নট। ছায়ানটের এই উদ্যোগের ফলে বর্ষবরণ উৎসব জাতীয় উৎসবের

রূপ পরিগ্রহ করে এবং এর সার্বজনীন আবেদন পাকিস্তান বিরোধী রাজনৈতিক মনস্তত্ব নির্মাণে সর্বোতভাবে সাহায্য করে।

নয়

পূর্ববাংলায় পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ ধর্ম ভিত্তিক বিভাজিত চেতনা নির্মাণে ক্রিয়াশীল ছিলেন। কবি গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, ইবরাহিম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, আলী আহসান, মোহাম্মদ আজরফ, সৈয়দ মুহম্মদ আফজল, আবুল হাসনাত, প্রমূখ কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ পাকিস্তানী ভাবধারায় 'পাক বাংলা' ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি এবং বাংলা ভাষা সংস্কারের প্রয়াস নিয়েছিলেন। এঁদের সাথে আরও অনেকে যুক্ত ছিলেন। এঁরা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন, রওনক প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে তাঁদের কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যান। এঁরা সরকারের সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে কাজ করেন। এসকল খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক পাকিস্তানী ভাবাদর্শের মোহে নিজেদের সম্ভ্রম বিসর্জন দেন। মজার ব্যাপার হলো, এই নেতিবাচক শক্তির প্রতিক্রিয়ায় শুভ শক্তির ঐক্য আরও বেশি সুদৃঢ় হয়। তবে এসকল তৎপরতা উদ্যোক্তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ ছিল না বলে এসব সংগঠন একটা পর্যায়ে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে। পূর্ববাংলার সামগ্রিক পরিবেশ সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি বিকাশের জন্য উর্বর ছিল না। এখানকার সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং অসাম্প্রদায়িক দর্শন এ সমস্ত ষড়যন্ত্র বানচাল করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির ধারাকে আরও গতিশীল করে। ফলে সরকার ও তাঁদের দোসরদের বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের এ সকল অপতৎপরতা সফল হয়নি।

দশ

পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেও জাতীয়তার সূত্র নিহিত ছিল। এখানকার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। আর এই কৃষি ব্যবস্থার সাথে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই জড়িত ছিলেন। কৃষির উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ার মধ্যেও অধিবাসীদের মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কৃষি ব্যবস্থাপনার সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের অংশীদারিত্বের চেতনা বিদ্যমান ছিল। গ্রামীণ অর্থনীতির বিনিময় কেন্দ্র গ্রামীণ হাট-বাজার, আড়ং ইত্যাদিও জনপদের মানুষের এক ঐক্যবদ্ধ মিলন কেন্দ্র। এখানে যেমন অর্থনৈতিক লেনদেন চলে একই সাথে চলে আত্মিক বিনিময়। ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামীণ জনপদ এভাবে সর্বদা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর থাকে। এই প্রক্রিয়া অধিবাসীদেরকে এক ধরনের আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে। এটি ছিল পূর্ববাংলার ঐক্যবদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের প্রাথমিক স্তর।

এগার

পূর্ববাংলার অধিবাসীরা জমিদারি শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। বঞ্চনাবোধ থেকে মুসলিম লীগের প্রণীত মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি গঠনের আন্দোলনে সমর্থন যুগিয়েছিল। পূর্ববাংলার জমিদারদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। এ কারণে সাধারণ মানুষের ভাবনায় হিন্দুত্ববাদ ও শোষক শ্রেণীর জমিদারের ধারণা একাকার হয়ে গিয়েছিল। নিম্নবর্গের হিন্দুরাও একই মনোভাব পোষণ করতেন বলে তাঁরাও পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছিলেন অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তির আশায়। পূর্ববাংলার অধিবাসীরা ভেবেছিল নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাঁদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনা লগ্ন থেকেই তাঁদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। পাকিস্তান একটি জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি অভিজাততন্ত্রের সূচনা করে। এই অভিজাততন্ত্রের সুবিধাভোগীরা হলেন সামরিক-বেসামরিক আমলা তথা হাতে গোনা কিছু রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক অভিজাত। জমিদারী ব্যবস্থার অবসান হলেও এখানে অধিবাসীদের প্রতি জমিদারী দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটেনি মোটেই। পূর্ববাংলার অধিবাসীদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোয় তাঁদের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন কখনোই সম্ভব নয়। সে কারণে তাঁদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তিতে নিজেদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের মনোভাব বিকশিত হয় ধীরে ধীরে।

বার

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বলে সর্বদা প্রচার চালাতো। এ কথা সত্য যে, শিল্পায়নের দিক থেকে পূর্ববাংলা খানিকটা পশ্চাৎপদ অবস্থানে ছিল। কিন্তু পূর্ববাংলার কৃষি অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে অগ্রসর ছিল। তৎকালীন সময়ে পৃথিবীর এক নম্বর পাট উৎপাদন ও রপ্তানীকরণ অঞ্চল ছিল পূর্ববাংলা। শ্রমের সহজ যোগান ও কাঁচামালের সহজলভ্যতার কারণে পূর্ববাংলায় পাট, চা, এবং চামড়া, চিনি ও কাগজ শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে সে রকম কোনো পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। শিল্পায়নের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রয়োজন পড়ত। এতে পূর্ববাংলার বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যবহার করার সুযোগ কমে যেত। বৈদেশিক বাণিজ্যের সমগ্র তথ্য সাক্ষ্য দেয় যে, বাণিজ্যিক লেনদেনের ভারসাম্য সর্বদা পূর্ববাংলার অনুকূলে ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিকূলে ছিল। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলাকে বৈদেশিক আয়ের ন্যায্য হিস্যা না দিয়ে নিজেদের অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করতে ব্যস্ত থেকেছে। আবার সরকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমন নীতি গ্রহণ করেছিল যে, পূর্ববাংলার অধিবাসীরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে খুব একটা সুবিধা পেত না। ফলে পূর্ববাংলার বাণিজ্যিক অর্থনীতির অধিকাংশ অবাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানীদের দখলে ছিল। এটি অবশ্যই বাঙালিদের আঞ্চলিক বঞ্চনাবোধের একটি বড় কারণ। শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে সুবিচার

প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। এই অবস্থা আর্থ-বাণিজ্যের জগতের মানুষকে পূর্ববাংলায় ইতোমধ্যে উত্থিত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জাগরণের সাথে একাত্ম করে।

তের

পূর্ববাংলার আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে তর্কবিতর্ক চলছিল। এই বৈষম্যের বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা কিছুটা হলেও দেরীতে শুরু হয়। কেননা, কোনো ঘটনার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া যতটা তাৎক্ষণিক ও দ্রুত প্রকাশ পায় তার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া হতে কিছুটা সময় লাগে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে কিছু আলোচনা চলছিল বটে তবে এই বৈষম্য যে এত ব্যাপক ছিল তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে অনেক দেরীতে। পাকিস্তানে আঞ্চলিক আয় বিষয়ে প্রথম কোনো কাঠামোবদ্ধ গবেষণা হয় ১৯৬৪ সালে 'পাকিস্তান ন্যাশনাল ইনকাম কমিশন'-এর তত্ত্বাবধানে 'সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস' কর্তৃক। এই গবেষণায় বেরিয়ে আসে ১৭ বছরের পাকিস্তানী শাসনের পর পূর্ববাংলায় কৃষিতে শ্রমিকের সংখ্যা কমার চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে পূর্ব বাংলার মোট শ্রমশক্তির ২০ শতাংশ বেকার। কৃষিতে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রবণতার নির্দেশক। উপরন্তু ক্রমবর্ধমানহারে বেকারত্বের কাতারে যোগ হওয়া হতাশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামনে কোন আশার আলো ছিল না। ফলে এরা চলমান মুক্তি আন্দোলনের মিছিলে যোগ দিয়েছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এভাবে বঞ্চিত ও হতাশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল যারা পূর্ববাংলায় সূচিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তাঁদের মুক্তির মঞ্চ হিসেবে ভেবে সেখানে একাত্ম হয়েছিল। সাধারণ এই মানুষকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত করতে ভূমিকা রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকরা গবেষণার মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্র সামনে নিয়ে আসেন এবং ছাত্ররা তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে।

চৌদ্দ

পূর্ববাংলার জন্য পাকিস্তানী শাসকদের প্রণীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল ঔপনিবেশিক ধাঁচের। পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে শাসকসূলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয় বরং ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হয়। এটি নিয়ে পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর মাঝে অসন্তোষ ধুমায়িত হচ্ছিল। প্রয়োজন ছিল এটি প্রকাশের একটি যথাযথ প্ল্যাটফরম। সঠিক সময়ে এটি তাঁরা পেয়েও যায়। পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য আঞ্চলিক বৈষম্যের রাজনৈতিক প্রতিকারের বিষয়টি সামনে আসে ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে। সত্তরের দশকের শুরুতে ছাত্রদের নেতৃত্বে শিক্ষা আন্দোলন ছাড়া রাজনৈতিক অঙ্গনে তেমন উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতা ছিল না। এমতাবস্তায় ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রতিকারের দাবিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের

কনফারেন্স-এ ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলে রাজনৈতিক অঙ্গন আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। পাকিস্তান সরকারও নড়ে চড়ে বসে। ৬-দফাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি চূড়ান্ত উপায় হিসেবে বললে অত্যুক্তি হবে না। পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদী ধারার সব পথ গিয়ে মিশে ৬-দফায়। ৬-দফায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ভাবনার সকল দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছিল। কাজেই ৬-দফা প্রচারের যে কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল সেটি ছিল সর্বস্তরের মানুষকে চূড়ান্ত আন্দোলনে শামিল করার একটি প্রচেষ্টা। আর এই প্রচেষ্টা সফল হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থাকলেও আত্মিকভাবে তিনি ছিলেন জনতার মিছিলে। এভাবে সকল মিছিল এক সাথে মিশে জাতীয়তাবাদী মিছিলের রূপ পরিগ্রহ করে যার চূড়ান্ত পরিণতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উৎপত্তি।

পনের

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গরদ এবং পরবর্তীকালে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তন হিন্দু-মুসলিমদের মনে অবচেতনভাবে স্বতন্ত্র চেতনার জন্ম দেয়। এই প্রেক্ষাপটে অবাঙালি মুসলিমদের সাথে বাঙালি মুসলিমদের একটি ন্যূনতম রাজনৈতিক ঐক্য গঠিত হয়। তবে তা ছিল সাময়িক। এটিকে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে সাধারণ অভিপ্রায় পূরণের এক অসংযত আবেগের বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে। বাঙালিদের ধারণা ছিল এর মাধ্যমে বাঙালিদের একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। কিন্তু পূর্ববাংলার অধিবাসীরা অচিরেই বুঝতে পারে যে, তারা প্রতারিত হয়েছে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ব্রিটিশদের দুটি চন্ডনীতি তথা- ভাষানীতি ও পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল করতে চেয়েছিল। কিন্তু পূর্ববাংলার তরফ থেকে এই উভয় ক্ষেত্রে প্রবল আপত্তি ওঠে। বিশেষ করে ভাষাকে কেন্দ্র করেই পূর্ববাংলার অধিবাসীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন সূচিত হয় যা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে। পূর্ববাংলার প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ঘটনার পেছনে রয়েছে এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির প্রেরণা। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তি কখনো একে-অপরের সহায়ক শক্তি হিসেবে, কখনো পরিপূরক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, আবার কখনো একে অপরকে ছাপিয়ে গেছে। কাজেই রাজনৈতিক অঙ্গনে একটির সাময়িক অনুপস্থিতি বা দুর্বলতার জায়গা অপরটির দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। আমরা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেতে পারি। এ দুটি আন্দোলনে ছাত্র-শিক্ষক, কবি-সহিত্যিক, সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী, ফেরিওয়ালা, হকার, শ্রমিকসহ প্রায় সকল স্তরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। তবে এতে নেতৃত্ব দিয়েছিল ছাত্ররা। পাকিস্তান শাসনামলে সংঘটিত রাজনৈতিক ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করলে পরিস্কারভাবে বোঝা যায় যে, বাঙালি শুধু আঞ্চলিক সমতার প্রশ্নে আন্দোলন করেনি এর প্রত্যেকটির পেছনে ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুপ্রেরণা। আঞ্চলিক বৈষম্যে ও রাজনৈতিক বঞ্চনা জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে আরও প্রগাঢ় করে তোলে।

ষোল

পূর্ববাংলার অধিবাসীদের মধ্যে ক্রমবিকাশমান রাজনৈতিক দর্শন তথা বাঙালি জাতীয় চেতনা, জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যেটাই বলি না কেন, এ সকল রাজনৈতিক দর্শনের প্রেরণা ভাষা আন্দোলন। পাকিস্তানী শাসকদের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রকল্প, বাংলা ভাষার সংস্কার এবং পাক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসের ফলে সৃষ্ট প্রতিবাদী আন্দোলন পূর্ববাংলার পিছিয়ে পড়া অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করে। দেশ বিভাগের আগে থেকেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হলেও তা আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ প্রথম রাজনৈতিক প্রতিবাদ সংঘটিত হয়। কাকতালীয় হলেও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এদিন যুবক শেখ মুজিব গ্রেফতার বরণের মধ্য দিয়ে বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে তাঁর ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করেন। আবার প্রায় ২৩ বছর পর ২৫ মার্চ মাধ্যরাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাঙালিকে নিয়ে গেলেন মুক্তির অভিষ্ঠ লক্ষ্যে, যা ছিল তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন। ১১ মার্চ ১৯৪৮ থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালে সংঘটিত সকল আন্দোলন সংগ্রামের প্রেরণা হলো ভাষা আন্দোলন। আর এ সকল আন্দোলন সংগ্রামের পরিণতি হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যার মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে বাংলাদেশের।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের কারণে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ ভারতর্ষকে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির উন্মাদনায় ভেঙ্গে যাওয়া বাংলার পূর্বাঞ্চল কার্যত পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। এই অসঙ্গত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অচিরেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। কয়েক মাসের মধ্যে মধ্যে সূচিত হওয়া বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিণতি পেতে সময় নেয় মাত্র দুই যুগ। এই সময়ের মধ্যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভব হয়। এত কম সময়ে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে কোন জাতির স্বাধীনতা অর্জন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এত বড় বিপ্লবের পেছনে কোন সামরিক শক্তি নয় বরং পূর্ববাংলার অধিবাসীদের নৈতিক শক্তি মূল ভূমিকা পালন করেছে। আর এই নৈতিক শক্তির ভিত্তি হলো কালের পরিক্রমায় গড়ে ওঠা এর অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী দর্শন। আর এই দর্শনের ভিত্তি পূর্ববাংলার ব-দ্বীপ সমভূমির ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রতিটি উপাদানের মধ্যে নিহিত ছিল। এর মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি তথা জীবনী শক্তি। এর থেকে জন্ম নেয় রাজনৈতিক শক্তি। শিক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক চর্চা সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটায়। পাশাপাশি অধিবাসীদের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে পূর্ববাংলায় জন্ম নেওয়া রাজনৈতিক দলসমূহ বাঙালির মুক্তির আন্দোলনকে গন্তব্যে পৌছে দেয়। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এই জনপদের সর্বস্তরের মানুষ যথা, ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, কবি-সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, মুটে-মজুর, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক এবং অভিন্ন শক্তিতে পরিণত করে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করে। এ কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। পরিশেষে বলা যায়, পূর্ববাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তির সাথে রাজনৈতিক শক্তির মিলিত বন্ধনই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির মূল প্রেরণা।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের নূতন সীমনা

পশ্চিম বঙ্গে ৩৪টি মুস্লিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা ও পূর্ববঙ্গে ৫৪টি অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা

—::—

বঙ্গীয় সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যানের সিদদ্ধান্তের ফলে ৩৪টি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুস্লিম খানা পশ্চিম-বঙ্গের এলাকাভূক্ত হইয়াছে এবং ৫৪টি সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-মুসলিম অধ্যষিত থানা পূর্ব-বঙ্গের এলাকাভূক্ত হইয়াছে। এই এলাকাগুলির আয়তন এবং জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক অনুপাত নিম্নে দেওয়া হইল:-

	পশ্চিম-বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুস্লিম অধ্যষিত থানা	পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-মুসলমান অধ্যষিত থানা
থানার সংখ্যা	৩৪	৫৪
আয়তন, বর্গমাইলে	৩৮৫০	৯৭৩৭
মুসলমান	১,৮৩,৫৭৪	১৮,০১,৫২২
অ-মুসলমান	১০,৮৭,১০৬	২৫,৮৪,২৬২
মোট	২৯,০০,২৭৬	৪৩,৮৫,৭৮৪
মুসলমানের শতকরা হার	৬২-৫২	৪১.০৮
অ-মুসলমানের শতকরা কার	৩৭-৪৮	৫৮.৯২

সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের ফলে মুস্লিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ৩টা সহর পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে এবং ৪৯টা অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সহর পূর্ববঙ্গে পড়িয়াছে। এই শহরগুলির আয়তন ও জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক অনুপাত নিম্নে দেওয়া হইল:-

	পশ্চিম-বঙ্গে মুস্লিমসংখ্যাগরিষ্ঠ সহর	পূর্ববঙ্গে অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সহর
সহরের সংখ্যা	৩	৪৯
আয়তন, বর্গমাইলে	১০০৪২	১৬০-৮১
মুসলমান	৬৩০৫৩	৩৬৭৭৫১
অ-মুসলমান	৫১৬৫১	৬৭০২২৯
মোট	১১৪৭০৪	১০৩৯৯৮০
মুসরমানের শতকরা হার	৫৪.৯৭	৩৫.৩৬
অ-মুসলমানের শতকরা কার	৪৫.০৩	৬০.৬৪

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুস্লিম এলাকা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-মুসলমান এলাকার আয়তন এবং মুসলমান ও অ-মুসলমানদের অনুপাত নিম্নে দেওয়া হইতেছে। বাঙ্গালার ৩৫৫টি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুস্লিম থানা পরস্পর সংলগ্ন না হইলেও একসঙ্গে মুস্লিম এলাকা এবং বাঙ্গালার ২৫৫টি অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-মুসলমান থানা পরস্পর সংলগ্ন না হইলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-মুসলমান এলাকারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে:-

	সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসস্লিম এলাকা	সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-মুসলমান এলাকা	মোট	সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসস্লিম এলাকার শতকরা অনুপাত	সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-মুসলমান এলাকার শতকরা অনুপাত
মুসলমান	২৭৭১৫৫৮৬	৫২৮৯৯৪৮	৩৩০০৫৪৩৪	৮৩.৯৭	১৬.০৩
অ-মুসলমান	৯৯০৯১৭৮	১৭৩৯১৯১৩	২৭০০১৯২	৩৬.৩০	৬০.৭০
মোট	৩৭৬৬২০৬৬৬৪	২২৬৮১৮৬১	৬০৩০৬৫২৫	৬২.৩৯	৩৭.৬১
মুসলমানদের শতকরা হার	৭৩.৬৬	২৩-৩২	৫৪.৭৩	-	-
অ-মুসলমানদের শতকরা হার	২৬-৩৪	৭৬-৬৮	৪৫-২৭	-	-
আয়তন বর্গমাইলে	৪৩৪৬২	৩৩৯৮০	৭৭৪৪২	৫৮.১২	৪৩-৮৮
প্রতিগর্গমাইলে জনসংখ্যা	৮৭৬	৬৮৮	১৫০৪	-	-

কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সীমানা নির্ধারণ পরামর্শদাতা কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক বি. এন ব্যানর্জ্জির বিবৃতি
সূত্র: ঢাকা প্রকাশ, ২৪ শে আগস্ট, ১৯৪৭

পরিশিষ্ট ২

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন নারী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। প্রভাতফেরীতে এরকম একটি স্থানীয় নারী সংগঠনের অংশগ্রহণ এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

সূত্র: The Pakistan Observer, 24 February, 1957

দমননীতি ও গ্রেফতারের প্রতিবাদ। ঢাকার রাজপথে ছাত্রদের বিক্ষোপ মিছিল। এই মিছিলে ছাত্ররা 'সকল বিরোধী দলের ঐক্য চাই' লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করে।

সূত্রঃ দৈনিক আজাদ, ২০ নভেম্বর, ১৯৬৮

পরিশিষ্ট ৪

Summary Statement Showing Year wise Commitments and their Respective Progressive Disbursement and Pipeline on 30-06-1969 in Respect of Guaranteed Debt for East Pakistan Projects

(Million US $)

Year	Allocation	Amount Disbursed upto 30-06-1969			Pipeline as on 30-06-1969		
		Public Sector	Private Sector	Total	Public Sector	Private Sector	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1954-55	4.200	-	4.200	4.200	-		
1955-56	5.416	-	5.416	5.416	-		
1956-57	-	-	-	-	-		
1957-58	20.806	20.556	20.806	0.250	-		
1958-59	0.383	-	0.383	0.353	-		
1959-60	14.256	8.255	6.001	14.256	-		
1960-61	17.903	2.215	15.688	17.903	-		
1961-62	4.504	4.504	-	4.504	-		
1962-63	24.527	11.315	13.212	24.527	-		
1963-64	30.320	1.982	28.262	30.244	0.043	0.033	0.076
1964-65	28.801	13.127	8.745	21.872	6.879	0.050	6.929
1965-66	82.903	56.323	16.813	73.136	9.481	0.286	9.767
1966-67	30.941	23.791	4.023	27.814	2.324	0.803	3.127
1967-68	62.714	4.486	17.403	21.889	34.535	6.290	40.825
1968-69	64.846	4.604	0.223	4.827	21.638	38.381	60.019
Total (East Pakistan):-	**392.520**	**151.158**	**120.619**	**271.777**	**74.890**	**45.853**	**120.743**

সূত্র: Reports of the Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan, Islamabad, 1970, p. 302

পরিশিষ্ট ৫

Summary Statement Showing Yearwise Commitments and their Respective Progressive Disbursement and Pipeline on 30-06-1969 in Respect of Guaranteed Debt for West Pakistan Projects

(Million US $)

Year	Allocation	Amount Disbursed upto 30-06-1969			Pipeline as on 30-06-1969		
		Public Sector	Private Sector	Total	Public Sector	Private Sector	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1953-54 1954-55	14.000	-	14.000	14.000	-	-	-
1955-56	13.777	-	13.777	13.777	-	-	-
1956-57	51.570	14.701	36.869	51.570	-	-	-
1957-58	-	-	-	-	-	-	-
1958-59	43.686	23.045	20.641	43.686	-	-	-
1959-60	53.109	48.543	4.566	53.109	-	-	-
1960-61	18.858	-	18.858	18.858	-	-	-
1961-62	47.450	22.728	24.722	47.450	-	-	-
1962-63	23.204	-	23.204	23.204	-	-	-
1963-64	48.823	-	48.823	48.823	-	-	-
1964-65	81.719	23.012	47.750	70.762	10.957	-	10.957
1965-66	35.656	18.284	16.699	34.983	0.652	0.021	0.673
1966-67	60.686	30.030	24.978	55.008	2.917	2.761	5.678
1967-68	86.687	24.105	24.358	48.463	26.556	11.663	38.224
1968-69	39.616	2.268	11.381	13.649	12.706	13.261	25.967
	101.965	0.030	5.335	5.356	13.330	83.270	96.600
Total (West Pakistan):-	**720.806**	**206.746**	**335.961**	**542.707**	**67.118**	**110.981**	**178.099**

সূত্র: Reports of the Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan, Islamabad, 1970, p. 303

পরিশিষ্ট ৬

Summary Statement Showing Disbursement of Commodity Grant and PL-480 Since Inception to 30-06-1969

(000.U.S. dollars)

Sl. No.	Country/Agency		East	West	Centre	Total
1.	USA (Other than under PL-480-I)	..	211,354	423,219	15,054	649,627
2.	Canada	..	39,246	83,729		122,975
3.	Australia	..	7,377	7,816		15,193
4.	Other Countries	..	4,905	410		5,315
	Total	..	**262,882**	**515,174**	**15,054**	**793,110**
	Total Aid	..	**319,118**	**654,824**	**215,532**	**1,189,474**
	PL-480-I	..	**445,401**	**791,435**	**5,008**	**1,241,844**

সূত্র: Reports of the Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan, Islamabad, 1970, p. 306

পরিশিষ্ট ৭

Summary Statement Showing Disbursement of Eoreign Project and Technical Assistance since Inception to30-06-1969

(Thousand .U.S. $)

GRANT (Project grant and Technical Assistance).

Sl. No.	Country/Agency		East	West	Centre	Total
1.	U.S.A	..	19,943	47,958	119,377	187,278
2.	Canada	..	25,124	67,133	6,082	98,339
3.	Australia	..	1,601	11,552	4,901	18,054
4.	Newzealand	..	2,508	3,920	440	6,868
5.	U.K.	..			14,435	14,435
6.	Japan	..			2,550	2,550
7.	Ford Foundation	..	3,823	5,057	24,299	33,179
8.	U.N.S.F	..	1,897	787	3,185	5,869
9.	Sweden	..	1,340	2,930	8,726	12,996
10.	West Germany	..		313		313
11.	U.N. and its Specialised Agencies.	..			16,417	16,417
12.	Other Countries	..			66	66
	Total	..	**56,236**	**139,650**	**200,478**	**396,364**

সূত্রঃ Reports of the Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan, Islamabad, 1970, p. 305

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রাথমিক উৎস

১.ক সংসদীয় কার্যবিবরণী

Assembly Proceedings, Official report, East Bengal Legislative Asembly, Third Session, 26th March, 1949

*Assembly Proceedings, Official report, East Bengal Legislative Asembly,*First Session, 23 March, 1948

Assembly Proceedings, Official report, East Bengal Legislative Asembly, Fourth Session, 1950, Vol.IV-No. 8

Assembly Proceedings, Official report, East Bengal Legislative SobhanAsembly,Fourth Session, 9th March, 1950

Assembly Proceedings official Report, East Pakistan Assembly, Second Session 1957, 21st to 24th September, 1957, East Pakistan Government Press, Dacca

Cnstituency Assembly of Pakistan, Debates, vol-5(2), 8 March 1949

Constituent Assembly of Pakistan (Legislature) CAP Vol. 1 (3) 28-29 February, 1948

Constituent Assembly of Pakistan Debates, official Report, 13th July 1955

Constituent Assembly of Pakistan, Debates, Official report, 22nd September 1955

Constituent Assembly of Pakistan, Debates, Vol.XV, 14, October, 1953

*The Constituent Assembly Orde*r, 1955 (G. G. O. 12/1955)

১.খ বাজেট

Budget of the Central Government of Pakistan, 1947-48 (15th August to 31st March) to 1951-1952

Budget of the Central Government of Pakistan, 1952-53

Budget of the Central Government of Pakistan, 1955-56

Pakistan Budgets, 1967-68, Government of Pakistan, Ministry of Finance, Islamabad, 1967

Pakistan Budgets, Economic, Ministry of Finance, Government of Pakistan press, Karachi, 1964

১.গ আদমশুমারি রিপোর্ট

Cencus of Bengal, 1872, General Statement 1B

Cencus of India, 1901, Vol: II Table V

Censu of Pakistan, 1951, Census Bulletin No. 4

Census of Pakistan, 1951, Bulletin-2

Census of Pakistan, 1951, East Bengal, Report and Tables

Census of Pakistan, 1951, Volume-8, (East Bengal)

Census of Pakistan, 1951, Vol. 1 (Report & Tables)

Census of Pakistan, 1951, Vol.3 (East Bengal, Report and Table)

Census of Pakistan, 1961

Census of Pakistan, 1961, Census Bulletin No.1

Census of Pakistan, 1961, Vol. 1

Census of Pakistan, 1961, Volume-2, (East Pakistan, Tables & Report)

১.ঘ বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রিপোর্ট

The First Five Year Plan 1955-60, Volume-II, Government of Pakistan Press, Karachi, 1956

The Second Five Year Plan 1960-65, Government of Pakistan Press, Karachi, June 1960

The Third Five Year Plan 1965-70, Government of Pakistan Press, Karachi, 1967

The Fourth Five Year Plan 1970-75, Volume-I, Islamabad, 1970

Annual Plan 1970-71, Planning Commission, Government of Pakistan, Planning commission, Government of Pakistan,

Planning Commission, Objective of the Scond Five Year Plan

১.ঙ অনলাইন ডকুমেন্টস

D.O. Secret & Personal No. 5705/3/GSI (b), HQ. Eastern Command, Calcutta, 12 A.P.O Dated 24 Aug. 46

www.nationalarchieves.gov.uk/wp-content/uploads/2014/03/wo216-6621.jpg

www. nationalarchieves.gov.uk/wp-content/uploads/2014/03/cab21-2038ii1.jpg

১.চ বিবিধ

Calcutta University Commission, 1917-19, Report, Vol-IV, Part-II, Recommendation of the Commission, Chapters XXX-XXXIX, Superintendent Gogernment Printing, Calcutta, India, 1919

Draft Constitution and Rules of The the East Pakistan Awami Muslim League

Popultion Census of Pakistan, 1961 Vol-1, Ministry of Home and Kashmir affair

Report of the Economic Appraisal Committee, pp. 174 and 203

Report on The Rural Credit and Rural Unemployment in Pakistan 1956, Dhaka University Socio-Economic Survey Board, Dhaka, 1956

State Bank of Pakistan *Bulletin*, February, 1956

Statistical Abstract for District in East Bengal, Provicial Stastical Board, Dhaka, 1950

Statistical Digest of East Pakistan, No. 5, East Pakistan Bureau of Statistics, Dacca, 1968

Statistics on Scheduled Banks in Pakistan, State Bank of Pakistan Department of Statistics, Karachi, 1963,

File no. 4L-B/1950, B Proceedings 142-5, Home Political, September 1951, BNA

২. দ্বৈতীয়িক উৎস

২.ক ইংরেজি

A. F. Pollard, *Factors in Modern History*, G. P. Putnam's Sons, New Yeark, 1907

A. K. Nazmul Karim, *Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh*, Nawroz Kitabistan, Dhaka, 1956

A. M. A. Muhit, *Bangladesh Emergence of a nation*, The University press Limited, Dhaka, 1992

A. R Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal*, Dhaka, 1977

A. Sadeque, *The Economic Emergence of Pakistan (with special emphasis on East Pakistan)* Part I, East Bengal Government Press, Dacca, 1954

A.K Nazmul Karim *Changing Society in India and Pakistan and Bangladesh,* Nawroz Kitab Bitan, Dhaka, 1976

Abdul Monin Chowdhury, *Religious Pluralism in ancient Bengal*, Dr. Anwar Dil and Dr. Afia Dil Trust Fund Lecture 2016, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2017

Ahmed Kamal, *State Against the Nation, the decline of the Muslim League in pre-independence Bangladesh, 1947-1954*, The University Press Limited, Dhaka, 2009

Albert Wasterston, *Planning in Pakistan: Organization and Implimentation,* Johns Hopkins Press, Baltimore, 1963

Ali Tayyeb, *Pakistan: A Political Geography*, London, Oxford University Press, 1966

Anwar Iqbal Qureshi, *Pakistan Budgets,* Government of Pakistan Press, Karachi, 1964

Archer K Blood, *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat*, Dhaka, The University Press limited, 2002

Azizali F. Mohammed, *The Economy of Pakistan,* Oxford University Press, London, Karachi, Dacca, 1958

B. M Morison, *Political Centers and Cultural Regions in Early Bengal*, Tucson: University of Arizona Press, 1970, Reprint Rawat Oublications, Delhi, 1994

Bhabagrahi Misra, James Preston (ed.), *Community, self, and Identity*, Mouton Publishers, Paris, 1978

Bipan Chandra, *Communalism in Modern India*, Vani Educational books, New Delhi, 1984

Br.Stallo A. M. *General principles of the philosophy of nature*, W.B Crosby, Boston, H.P nichols, Washington, 1848

D. R. Mankekar, *Pak Colonialism in East Bengal*, Somaiya Publications Pvt. Ltd. Bombay, 1971

S.P. Varma, Virendra Narain, Edited. Pakistan political System in Crisis: Emergence of Bangladesh, South Asian Studies Centre, University of Rajasthan, 1972

Delwar Hassan (Edited), *Commercial History of Dhaka,* Dhaka, Chember of Commerce and Industry, Dhaka, 2008

Dr. Hasan Zaman. (Ed.), *Current News, Journal of contemporary Events & Ideas*, Bureau of National Reconstruction, Govt. of East Pakistan, Dacca, 1970

Dr. Manisha Deb Sarkar (ed.) *Geo-political Implications of partition in Bengal,* K P Bagchi & Company, Kolkata, 2009

Dr. S. A Meenai, *Banking System of Pakistan*, State Bank of Pakistan press, Karachi, 1964

E.L. Hamza, *Pakistan: A Nation*, Lahore, Kashmiri Bazar, 1944

Fazal, A. Allami, (translated by Beveridge), *Akbar Nama*, Vol.III, Delhi, Low price Publication, Reprint 1989

Haimanti Roy. *Partitioned Lives, Migrants, Refugees, Citizens in India and Pakistan, 1947-1965,* oxford University Press, New Delhi, 2012

Francois Barnier, (Translated by Archibald Constable), *Travel in Mogul Empire AD 1656-1668*, Delhi, Low Price Publication, 1934

Gustav Papanek, *Pakistan's Development: Social Goals and Private Incentives*, Harvard University Press, Cambridge, 1967

H. Beveridge, B. C. S. *The District of Bakarganj: Its History and Statistics*, Trubner & Co. Ludgate Hill, London, 1876

H.M. Matin, *National Languge of Pakistan,* Marsh publishing House, Karachi, 1954

Hamid Khan, *Constitutional and Political History of Pakistan,* Oxford University Press, Karachi, 2011

Haroun Er Rashid, *Geography of Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka, 1991

Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947*, The University Press Limited, Dhaka, 1987

Ibn Batuta (Trnslated by Mahdi Husain), *The Rehla of Ibn Batuta (India, Maldives and Ceylon)*, Orient Institute of Baroda, 1953

Iftekhar Iqbal, *The Bengal Delta: Ecology, State and Social Change, 1840-1943*, England, palgrave macmillan, 2011

J. Russel Andrus, Ph.D. and Azizali F. Mohammed, *The Economy of Pakistan, O*xford University Press, London, Karachi, Dacca, 1958

Jack Nobs, et.al. *Sociology*, Macmilan, London, first print, 1975

James J. Novak, *Bangladesh: Reflection on the water*, Dhaka, The University Press Ltd, 2008

Joya Chatterji, *Bengal Devided, Hindu communalism and partition, 1932-1947*, Cambridge University Press, Delhi, 1994

Kabir U Ahmad, *Breakup of Pakistan: Bacground and prospects of Babgladesh,* London, The Social Science Publishers, 1972

Karl Mannheim, *Man and Society in the age of Reconstruction: Studies in Modern Social Structure,* with a biographical Guide to the study of Modern Society, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1940

Karl Marx, *Notes on Indian History, The First Indian war of Independence*, 1857- 1859, Foreign Languages, Moscow, 1947

Keith Callard, *Pakistan: A Political Study,* George allen & Unwin Ltd. London, 1957

Latif Ahmed Sherwani, (Ed.) *Pakistan Resolution to Pakistan, 1940-1947: A selection of documents presenting the case for Pakistan,* Days Publising House, Delhi, Reprint, 1985

M. Abdur Rahim, *An appraisal of census populations of East Pakistan from 1901 to 1961, Research monograph* No. 2, Instirute of Statistical Research and Traing, University of Dhaka

Mahbub Ul Haq, *The Stratagy of Economic Planning: A Case Study of Pakistan*, Oxford University Press, Karachi, Lahore, Dacca, 1963

Mahmudul Huque, *American Policy towards the Bangladesh Liberation War in 1971: A collection of Essential Documents*, Asiatic society of Bangladesh, 2018

Marta R. Nichollas, Philip Oldenburg, *Bangladesh: the birth of a nation*, M. Seshachalam & Co, Madras, 1972

Maulana Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom,* Oriental Longmans, Calcutta, 1959

Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bebgladesh, Dhaka, 2009

Md. Anisur Rahman, *East and West Pakistan: A Problem in the political Economy of Regional Planning*

Muhammad Ghulam Kabir, *Minority Politics in Bangladesh*, Vikash Publishing House PVT LTD, Delhi, 1980

Nazrul Islam, *National Atlas of Banglades, Asiatic Society of Bangladesh*, 2018

Nitish Sengupta, *Land of Two Rivers,* New Delhi, Penguin Books, 2011

P. C Choudhury, *The History of Civilization of the People of Assam,* Department of historical and Antiquarian Studies in Assan, Guahati, 1959

R.C. Majumdar. M.A. Ph.D, *History of the freedom movement in India, Vol. III,* Firma KLM private Limited, Calcutta, 1963

Rafiuddin Ahmed. *The Bengal Muslim1871-1906: A Quest for Identity*, Oxford University Press, Delhi, 1981

Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, University Press Limited, Dhaha, 1986

Rehman, Sobhan, From Two Economies to Two Nations: My Journey to Bangladesh, Daily Star Books, Dhaka, 2015

Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760*, University of California Press, Berkley, Los Angeles, London, 1993

Romila Thapar, *The Past as Present: Forgiving Contemporary Indentities Through history*, Aleph Book Company, New Delhi, 2012

Rounaq Jahan, *Pakistan Failure in National Integration,* The University Press Limited, Third Impression 2015

S. M. Ikram and Percival Spear, *The Cultural Heritage of Pakistan*, Oxford University Press, Karachi, 1955

S. Gokilvani, S. Suba, *Communal Riots and Women Victims*, Regal Publications, New Delhi, 2009

S. P. Varma, Virendra Narain, Edited. *Pakistan political System in Crisis: Emergence of Bangladesh*, South Asian Studies Centre, University of Rajasthan, 1972

Sheikh Hasina (ed.), Secret Documents of Inteligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman, Vol. I (1948-1950), Hakkani Publishers, Dhaka, 2018

Sheikh Hasina (ed.), Secret Documents of Inteligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman, Vol. II (1951-1952), Hakkani Publishers, Dhaka, 2019

Stanley A. Kochanek, *Interest Groups and Development: Business and Politics in Pakistan*, Oxford University Press, Delhi, 1983

Sudhir Sen, Rabindranath Tagore on Rural Reconstraction, Calcutta

Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal, 1884-1912,* Asiatic Press, Dacca, 1974

Suresh Chandra Ghosh, The History of Education in Modern India 1757-2012, Orient Blackswan Private Limited, Delhi, 2016

T. B. Bottomore, Karl Marx, *Rubel Maximillien, Selected Writings in Sociology & Social Philosophy*, Penguin Books, Middles, England, 1961

The University of Dacca: a review of changes and developments during the decade 1958-68, Dacca, 1968

W. Nelson Peach, Ph.D. et. al. *Basic Data of the Economy of Pakistan*, Oxford University Press, Karachi, 1959

২.খ বাংলা

সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, বাংলা একাডেমি, ২০০৩

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, "*বাঙালার কথা*", *দেশবন্ধু রচনা সমগ্র, কলকাতা*, ১৯২০

মো. আলমগীর, *বাংলার মুসলিমদের সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান*, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংযোজন নম্বর ৩৮২৩৭৪

মো: হাবিবুল্লাহ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯): পার্লামেন্টের ভাষ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৫

মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, *জীবনের ঘাটে ঘাটে*, আহসানিয়া বুকস্ ঢাকা, ২০০২

মোঃ হাবিবউল্লাহ্ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯): পার্লামেন্টের ভাষ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৫

রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ১৯৪৭-১৯৭১, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২

শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২

শেখ লুৎফর রহমান, *জীবনের গান গাই*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩

খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাগেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮১

গোলাম কিবরিয়া ভুঁইয়া, *বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০২

জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, (অনূবাদ ফজলুল করিম) দ্বিতীয় ভাগ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ২০০০

অ্যান্থনী মাসকারেনহাস, *দ্যা রেপ অব বাংলাদেশ*, (বাংলা অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, ঢাকা, পপুলার পাবলিসার্স, ২০১৪

অধ্যাপক শাহেদ আলী, "বাংলা ভাষার উন্নয়ন" আজাদ, ১৯ আগস্ট, ১৯৬৭

অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের সমাজচিন্তা, প্রফেসর শফিকুর রহমান স্মারক বক্তৃতা ২০১৮, বাংরাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ৬ জুলাই ২০১৯

আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম: সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি সমীক্ষা*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩

আবদুর রহমান, *যতটুকু মনে পড়ে*, রহমানসন্স পাব্লিকেশন, চট্টগ্রাম, ১৯৭২

আবদুল লতিফ, ভাষার গান দেশের গান, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫

আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯

আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস [১৯৪৯-১৯৭১]*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩

আবুল মনসুর আহমদ, *মাসিক মোহাম্মদী*, কার্তিক, ১৩৫০

আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৮

আলতাফ পারভেজ, *যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৯

আসফাক হোসেন, "*১৮৭৪-১৯৪৭ কালপর্বে বাংলা-আসামের সীমান্তে অদলবদল এবং সিলেটের গণভোটের ইতিহাস*", *প্রতিচিন্তা*, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫

আসকারইবনে সাইখ, *নব জীবনের গান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৬

আবূল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৫

আনিসুজ্জামান, "খান সারওয়ার মুরশিদ ও তাঁর মূল্যবোধ', মিসেস নূরজাহান মুরশিদ ও প্রসের খান সরওয়ার মুর্শিদ ট্রাস্ট ফান্ড বক্তৃতা ২০১৮, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১৮

আমিনুর রহমান সুলতান, *দাঙ্গায় শহিদ আমির হোসেন চৌধুরী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৩

আতিউর রহমান সম্পাদিত, *ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০০০

অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি, ঢাকা ২০১৫

নূহ-উল-আলম লেনিন, (সম্পা.), *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫

ননী গোপাল চৌধুরী, *বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত*, (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী-খ্রিষ্টীয়সপ্তদশ শতাব্দী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪

নজরুল ইসলাম, "*ভৌগোলিক বাস্তবতায় বাংলাদেশ*", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রয়োত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জুন, ২০১৫

রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ১৯৪৭-১৯৭১*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০০২

নাজনীন হক মিমি, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *আগরতলা মামলা অনুচ্চারিত ইতিহাস*, জার্নিম্যান বুকস্, ঢাকা, ২০১৫

নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, আষাঢ় ১৪১১

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া ম্যানিফেস্টো ২৩ ও ২৪ জুন ১৯৪৯

পূর্ববাংলা প্রাদেশিক আইন সভার প্রথম অধিবেশন বিতর্ক, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, (সম্পা.). *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন,ঢাকা, ১৯৯৮

প্রফেসর সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত). *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

প্রবাসী, ৪৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৫০

প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, *পাক-ভারতের রূপরেখা*, শ্যামা প্রকাশনী, চাকদহ, নদীয়া, ভাদ্র, ১৩৭৫

পাকিস্তান অবজারভার, ২৩ জুন, ১৯৬৭, গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮১

বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭০

বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খন্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫

বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, বুক ক্লাব, ঢাকা, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অক্টোবর ২০১১, *বঙ্গালীর উৎপত্তি, বঙ্গদর্শন*, ১ম সংখ্যা, ৮ম খন্ড বৈশাখ ১২৮৮, পৃ. ১৩-১৫

বশীর আলহেলাল, *বাংলা একাডেমির ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, প্রথম খন্ড, (১৯০৫-১৯৫৮), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫৮-১৯৭১), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র প্রকাশনা-১, ঢাকা

এ বি এম হোসেন, *পড়ন্ত বেলার গল্প*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৫

এ. জি. স্টক (ভাষান্তর মোবাশ্বেরা খানম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি, ১৯৪৭-১৯৫১, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১১

মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেনশাহী আমলে বাংলা ১৪৯৪-১৫৩৮: একটি সামাজিক রাজনৈতিক পর্যেষণা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১০

মাহবুব আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস: কতিপয় বিশিষ্ট পরিবার*, প্রথম খণ্ড, নয়ালোক প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭

মাহবুবুল আলম চৌধুরী, *কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি*, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০

মফিদুল হক, *একুশে ফেব্রুয়ারী ও আমাদের চলচ্চিত্র*, ইন্টারকাট, চতুর্থ সংখ্যা, চট্টগ্রাম ১৯৮৯

মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ: উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৮

মুনতাসির মামুন (সম্পা.), *আত্মস্মৃতিতে পূর্ববঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একভাডেমী, ২০১৮, পৃ.পৃ. ২৩৯, ২৪২

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গাঋদ্দি থেকে বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *স্মৃতিকথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯২

রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,কলিকাতা, ১৯৯৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৬

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পা.) *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, প্রাসঙ্গিক দলির পত্র*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮

রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

রংগলাল সেন, বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *পরামৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য-চরিতামৃত*, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ১৯৯৩

কঙ্কর সিংহ, *সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ২০০৭

শ্রী ভবশঙ্কর দত্ত, *"বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক আগ্রহের অভাব"*, *বঙ্গশ্রী*, ১ম বর্ষ, ২য় খন্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪০

শ্রী সুভাসচন্দ্র বসু রচনাবলী, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯, ২য় খণ্ড

কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা*, তৃতীয় খন্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩,

কামাল লোহানী, লড়াইয়ের গান, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮

শাহ্ আব্দুল করিম, *কালনীর ঢেউ*, সমতা প্রেস, সিলেট, ১৯৮১

কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ২৯৯

খান সারওয়ার মুরশিদ, *কালের কথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১

সন্‌জীদা খাতুন, "বাঙালির সাংস্কৃতিক মুক্তিসংগ্রাম আর সংস্কৃতি সাধনা" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্বিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৬

সরদার ফজলুল করিম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ: অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক-এর আলাপচারিতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩

সাইম রানা, বাংলাদেশের গণসংগীত: বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০৯

সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩

সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত). *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা (১৯৪৭-১৯৭১)*, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮

হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ২০১৮

হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, বাংলা একাডেমী, ২০১৭

হারুন-অর-রশিদ, *'আমাদের বাঁচার দাবী' ৬ দফা'র ৫০ বছর*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১৬

হাসান হাফিজুর রহমান, (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২

জয়া চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৪

জয়া চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৪

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০০২

ড. আনোয়ারুল করিম, *রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ*, মনন প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯

ড. আবদুল করিম, "বার-ভুঞা পরিচিতি", *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতামালা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৬

ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাউল কবি লালন ও তাঁর গান*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

ড. মুস্তফা নুরউল ইসলাম, "বাংলাদেশ, বাঙালি-ইতিবৃত্তের সন্ধানে" *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতামালা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৬

ড. হারুন-অর রশিদ, বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা ২০১৯, বাংলাদেশ এশিয়াটি সোসাইটি, ঢাকা, ২০১৯

ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম: সাংস্কৃতিক ধারা, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা

বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৮৫-১৯৪৭*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৪

বিপান চন্দ্র, *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কোলকাতা, ২০১১

মীনহাজ-ই-সিরাজ (অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া), *তবকাত-ই-নাসিরী*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭

মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

লিয়াকত আলী লাকী, (সম্পা.), *দ্রোহ ও মুক্তির গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭

জি অ্যালানা, *পাকিস্তান আন্দোলন: ঐতিহাসিক দলিলপত্র*, (অনুবাদ, কে এম ফিরোজ খান), খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, ২০০৮

জিয়াউদ্দিন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* (অনুবাদ, গোলাম সামদানী কোরায়শী), দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

তাজউদ্দীন আহমেদ, *তাজউদীন আহমদের ডায়েরী ১৯৫৪*, পঞ্চম খন্ড, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৭

হারুন-অর-রশিদ, *আমাদের বাঁচার দাবী' ৬ দফা'র ৫০ বছর*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১৬

২.গ সংবাদ/সাময়িক প্রত্র

দৈনিক আজাদ, ২৬ এপ্রিল, ১৯৪৭

দৈনিক আজাদ, ২৯ এপ্রিল, ১৯৪৭

দৈনিক আজাদ, ২৯ মে, ১৯৪৭

দৈনিক আজাদ, ২ জুন, ১৯৪৭

দৈনিক আজাদ, ৪ জুন, ১৯৪৭

দৈনিক আজাদ, ১১ জুন, ১৯৪৭

দৈনিক আজাদ, ১৪ জুন, ১৯৪৭

দৈনিক আজাদ, ১১ জুলাই, ১৯৪৭

দৈনিক আজাদ, ২৯ জুলাই, ১৯৪৭

দৈনিক আজাদ, ২৪ এপ্রিল, ১৯৫৬

দৈনিক আজাদ, ৯ এপ্রিল, ১৯৫৬

দৈনিক আজাদ, ১৩ মে, ১৯৫৮

দৈনিক আজাদ, ৫ মে, ১৯৫৮

দৈনিক আজাদ, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৯

দৈনিক আজাদ, ৮ মে, ১৯৬১

দৈনিক আজাদ, ৩০ জুন, ১৯৬২

দৈনিক আজাদ, ১৯ নভেম্বর, ১৯৬৩

দৈনিক আজাদ, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৩

দৈনিক আজাদ, ২৬ নভেম্বর, ১৯৬৩

দৈনিক আজাদ, ২৭ নভেম্বর, ১৯৬৩

দৈনিক আজাদ আগস্ট, ১৯৬৪

দৈনিক আজাদ, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

দৈনিক আজাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

দৈনিক আজাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

দৈনিক আজাদ, ২৪ মে, ১৯৬৮

দৈনিক আজাদ, ২৫ মে, ১৯৬৮

দৈনিক আজাদ, ১৫ জুন, ১৯৬৭

দৈনিক আজাদ, ২৮ জুন, ১৯৬৭

দৈনিক আজাদ, ২৮ আগস্ট, ১৯৬৭

দৈনিক আজাদ, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

দৈনিক আজাদ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

দৈনিক ইত্তেহাদ, ২০ জুলাই, ১৯৪৭

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৬৪

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ জানুয়ারী, ১৯৬৪

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ জানুয়ারী, ১৯৬৪

দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ মার্চ, ১৯৬৬

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ মার্চ, ১৯৬৬

দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ মার্চ, ১৯৬৬

দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ এপ্রিল, ১৯৬৬

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ জুন, ১৯৬৬

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ আগস্ট ১৯৬৭

দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

ঢাকা প্রকাশ, ২৭ জুলাই, ১৯৪৭

ঢাকা প্রকাশ, ১৭ আগস্ট, ১৯৪৭

ঢাকা প্রকাশ ১৭ আগষ্ট, ১৯৪৭

ঢাকা প্রকাশ, ২৪ আগস্ট, ১৯৪৭

ঢাকা প্রকাশ, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

ঢাকা প্রকাশ, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৭

ঢাকা প্রকাশ, ১৫ মার্চ, ১৯৪৮

চিত্রালী, ৯ মার্চ ১৯৬২

চিত্রালী, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

চিত্রালী, ৩ মে, ১৯৬৬

চিত্রালী, ২০ নভেম্বর, ১৯৭০

দৈনিক পূর্বদেশ, ৩০ নভেম্বর, ১৯৬৯

মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৫০

বঙ্গদূত পত্রিকা, ১৩ জুন, ১৮২৯

২.ঘ ইংরেজি পত্রিকা

The Dawn, 27 November, 1947

The Dawn, 31 October, 1958

The Morning News, 6 November, 1961

The Pakistan Observer, 10 January, 1957

Pakistan Observer, 30 June, 1967

The Daily Telegraph, London, 10 March, 1971